প্রথম প্রকাশ :
২৫শে বৈশাখ ; ১৩৬৬

প্রকাশক :
শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ :
শ্রীতপন কর

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
মোহন প্রেস
কলিতাতা-৯

মুদ্রক :
শ্রীঅজিতকুমার সাউ
নিউ রূপলেখা প্রেস
৬০, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

# ভূমিকা

বঙ্কিমচন্দ্র ও উত্তরকাল নামে প্রবন্ধ গ্রন্থটি পনেরটি প্রবন্ধের সমষ্টি। বঙ্কিম-চন্দ্রের কাছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক ঋণ এবং নব্য বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিকতার সুত্রপাত প্রবন্ধ দুটি রচনার কিছু ইতিহাস আছে।

স্বর্গীয় অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আদর্শ শিক্ষক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী পুরুষ ছিলেন। তৎকালীন সামাজিক ইতিহাসে ও ছাত্রদের মনে তাঁর স্মৃতি উজ্জ্বল ভাবে বিরাজমান। তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রীবিনয়েন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অধুনা শান্তিনিকেতন বাসী। পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে বিশ্বভারতীতে তিনি একটি বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করেছেন। প্রথম প্রবন্ধ দুটি সেই বক্তৃতা মালার উদ্দেশ্যে লিখিত ও পঠিত হ'য়েছিল। প্রবন্ধ দুটি বহু বিতর্কের সম্ভাবনায় পূর্ণ। বর্তমানে একদল লোকের প্রধান বুলি বঙ্কিম বাতিল, অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ঝুড়িতে মাত্র তাঁর স্থান, সাহিত্য স্রষ্টা রূপে তিনি বাতিল। কোন বিরাট পুরুষ সম্বন্ধে সংক্ষেপে দায় সারবার এ একটা পন্থা বটে। কার্য্যতঃ বঙ্কিমচন্দ্র আজও সজীব এবং অত্যন্ত সজীব। শুধু ঔপন্যাসিক রূপে নন চিন্তার মূলে দিগ্‌দর্শন দাতারূপে তাঁর স্থান সর্বোচ্চ। আধুনিক সাহিত্যে ভাষার যথেচ্ছচারিতার যুগে প্রত্যেক বাঙালী সাহিত্যিকের উচিত বছরে একবার করে তাঁর প্রবন্ধাবলী পাঠ করা। বঙ্কিমবাতিল মনোভাবের ফলেই বাংলা ভাষার সৌষ্ঠব ও দার্ঢ্য নষ্ট হ'তে বসেছে। আর বঙ্কিম মনীষার বিচার করতে গেলে অনায়াসে চেনা যায় আচার্য্য শঙ্করের পরে এমন মনীষী ব্যক্তি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন নি। আমার এ সব মন্তব্য সকলে স্বীকার করবেন এমন প্রত্যাশা করি না। দ্বিতীয় প্রবন্ধটিও কম বিতর্কের সম্ভাবনাপূর্ণ নয়। আজকাল সাহিত্যের বাজারে রোমান্টিকতার দর বড় মন্দা। কোন সাহিত্যিককে সংক্ষেপে বিদায় দিতে হলে রোমান্টিক বলাই যথেষ্ট। কিন্তু পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাস অন্য সাক্ষ্যদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের বারো আনাই রোমান্টিক। আমরা বর্ত্তমান কালের লেখক ও পাঠকগণ অচির আসন্ন নব রোমান্টিক যুগের উষা লগ্নের বাসিন্দা। বাংলা সাহিত্য মূলত রোমান্টিক, মাঝে মাঝে নদীর ধারা শীর্ণ হয়ে এসে বালুর চড়া বেরিয়ে পড়ে, নদীর প্রবাহ হয়তো

অন্য পথ অবলম্বন করে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আবার প্রকৃতি নির্দিষ্ট পথে ঘুরে আসে। নদী স্বীয় খাত কখনো স্থায়ীভাবে ত্যাগ করে না।

রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ প্রবন্ধটি আকারে ক্ষুদ্র হলেও বিষয়ের গৌরবে ক্ষুদ্র নয়।

অন্যান্য সমস্ত রচনা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক, আশা করা যায় প্রত্যেকটিতেই কিছু অনুধাবন যোগ্য বস্তু আছে।

রামায়ণ ও মহাভারত প্রবন্ধটিতে কিছু অনধিকার চর্চা করতে বাধ্য হয়েছি, অনধিকার চর্চার অধিকার অজ্ঞেরও আছে বিশেষজ্ঞগণ এ কথা না ভুললে সাহিত্যের অশেষ উপকারের সম্ভাবনা। অলমিতি।

প্রমথনাথ বিশী

# সূচীপত্র

# বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক ঋণ

বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক ঋণ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হয়নি, এবিষয়ে সম্যক্ আলোচনা হ'লে দুজনের সম্বন্ধে অনেক অবশ্যজ্ঞাতব্য কথা জানতে পাওয়া যাবে। ১৮৭২ সালে বঙ্গদর্শন পত্রে বিষবৃক্ষ উপন্যাস প্রকাশিত হতে থাকে, খুবসম্ভব এই উপন্যাস দিয়েই বঙ্কিমের রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয়। জীবনস্মৃতি গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ আছে। এগারো বছরের বালক পাঠক, অনেকগুলি শ্রোতা। সেই বাল্যকালের পাঠের স্মৃতি তাঁর মনে গভীর দাগ টেনে দিয়েছিল, সে দাগ শেষ পর্যন্ত অক্ষয় হয়ে ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বলতে তিনি যেন বিষবৃক্ষকেই বুঝতেন, তাঁর রচনা সমূহে বিষবৃক্ষের উল্লেখ বোধ করি সবচেয়ে বেশী। এখান থেকেই আমার আলোচনা আরম্ভ করা যেতে পারতো, আর তাই করবো, কিন্তু তার আগে কয়েকটি আলোচ্য বিষয় সেরে নেওয়া আবশ্যক।

রবীন্দ্রনাথের কলমে পদ্য ভাষা তৈরী হয়ে উঠবার আগেই গদ্যভাষা তৈরী হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন যে সন্ধ্যাসঙ্গীত কাব্যে তাঁর স্বকীয় পদ্যরীতি প্রথম দেখা দিল। কবির উক্তি মেনে নেওয়া যেতে পারে, তবে সেই সঙ্গে মনে রাখা আবশ্যক সে পদ্যভাষা নিতান্ত কাঁচা, শিশুর হাতের প্রথম অক্ষর গুলির মতো। তাঁর পদ্যভাষা প্রথম স্বকীয় বলিষ্ঠতা লাভ করেছে মানসী কাব্যে তখন তাঁর বয়সের রেখা ত্রিশের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। কিন্তু তার অনেক আগেই তাঁর গদ্যভাষায় পাক ধরেছে—যদিচ সর্বত্র সমান পাকা নয়। যাঁর আত্মপ্রকাশের প্রধান বাহন পদ্য তাঁর ক্ষেত্রে গদ্যের কলমে আগে পাক ধরা বিস্ময়কর। কেন এমন হ'ল আমাদের প্রথম পূর্ব আলোচ্য।

রবীন্দ্রনাথ কলম ধরবার আগেই বাংলা গদ্যভাষা পরিণত হয়ে উঠেছে, বিদ্যাসাগরের গদ্য এবং বঙ্কিমের প্রথম গ্রন্থগুলি। বিদ্যাসাগরের গদ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার মধ্যগারীতি, ইংরাজীতে যাকে বলে neutral style। রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণে গ্রাম্য পাণ্ডিত্য ও গ্রাম্য বর্বরতার

মাঝখান দিয়ে পথ কেটে নিয়ে এ গদ্যরীতির পথ। এই রীতির উপরেই পরবর্তী যাবতীয় গদ্যরীতির ভিত্তি, পরবর্তী শক্তিশালী লেখকদের হাতে এর পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু মূল ছাঁচটা ভেঙ্গে যায় নি। এদিকের বিচারে তিনি সমস্ত গদ্য-লেখকদের পিতা ও পিতামহ। তারপরে এলো বঙ্কিমের গদ্যরীতি, বিদ্যাসাগরকে স্বীকার করে নিয়ে তিনি ক্রমশঃ সরল ও অধিকতর সরলতার সন্ধান করেছেন, তাঁর মতে সব অলঙ্কারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সরলতা। এখানেই বঙ্কিমী রীতির বৈশিষ্ট্য। গদ্যের ফসলে যখন পাক ধরেছে তখন গদ্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। এই দুই রীতির সহায়তায় তাঁর গদ্যে প্রায় প্রথম গ্রন্থ থেকেই পাক ধরতে দেখা যায়। পদ্যের কলম তখনো কাঁচা। কেন এমন হ'ল আমাদের দ্বিতীয় পূর্ব-আলোচ্য।

রবীন্দ্রনাথ কলম ধরবার আগেই মধুস্থদনের মৃত্যু হয়েছে, তবে তিনি তাঁর স্বল্প পরিসর সাহিত্য জীবনে পদ্যে একটি নূতন রীতি বা সংস্কার সৃষ্টি করে গিয়েছেন। সমকালীন প্রায় সমস্ত কবি, ব্যতিক্রম দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাইকেলের ভাষা সংস্কারকে গ্রহণ করেছেন বা করতে চেষ্টা করেছেন। তিলোত্তমা সম্ভবকে নিতান্ত কাঁচা হাতের অপটু লেখা বলে বাদ দিলেও এক মেঘনাদবধ কাব্যেই অমিত্রাক্ষর ছন্দকে তিনি বাংলা ভাষার স্থায়ী কাব্য সংস্কার-রূপে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। তিনিও বঙ্কিমের মতো সরলতার সন্ধানী ছিলেন, প্রমাণ বীরাঙ্গনা কাব্য। মাইকেলের শক্তির প্রকাশ মেঘনাদবধ কাব্যে, আর শিল্পকলার প্রকাশ বীরাঙ্গনায়। এতবড় শক্তিমান কবিকে রবীন্দ্রনাথ পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন। তিনি অমিত্রাক্ষর লিখেছেন তবে তা মধুস্থদনীয় নয়। তাঁর অধিকাংশ অমিত্রাক্ষরে অন্ত্যানুপ্রাসের নূপুর পরানো। যাঁর প্রথম আমলের কাব্যে হেমচন্দ্রের প্রভাব আছে, মাইকেলের প্রভাবকে তিনি এড়িয়ে গেলেন কেন বা কেমন করে? কবি প্রতিভায় দুজনেই সমান-সমান, অবশ্য কৌশলে তারতম্য অনেক। তবে জীবন ধারণায় এবং জীবনরস সংগ্রহে দুজনে দুস্তর ব্যবধান, একজন জীবন রস সংগ্রহ করেছেন হোমার মিলটন থেকে, অন্যজন উপনিষৎ ও কালিদাস থেকে। এসব ক্ষেত্রে একজনের দ্বারা অপরের প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়! রবীন্দ্রনাথকে কাব্যভাষা আবিষ্কার করে নিতে হয়েছে, বিহারীলাল ও হেমচন্দ্রকে আলগোছে স্পর্শ করেছেন, মাইকেলকে পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু গদ্যভাষার ক্ষেত্রে এসব অসুবিধা তাঁর ছিল না, বিদ্যাসাগর

ও বঙ্কিমচন্দ্র হয়ে যে ভাষা স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হচ্ছিল, তাকেই তিনি গ্রহণ করেছেন, এবং কালক্রমে তাতে স্বকীয়তা দেখা দিয়েছে—যদিচ সম্পূর্ণভাবে স্বকীয় ও রাবীন্দ্রিক হয়ে উঠতে বেশ কিছু সময় নিয়েছে। এই কারণেই কবি রবীন্দ্রনাথের পদ্য পরিণত হয়ে উঠবার আগেই মনীষী ও কথাকার রবীন্দ্রনাথের গদ্যে পরিণতির সূচনা দেখা যায়। ১৮৬১ সালে তাঁর জন্ম অদৃষ্টের আশীর্বাদ। আর কুড়ি বছর এদিক ওদিকে জন্ম হলে তাঁর পদ্যভাষা ও গদ্যভাষা কি রূপ ধারণ করতো তা আর একটা আলোচনার বিষয়। কিন্তু সে প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে অবান্তর হবে। বর্তমান প্রসঙ্গ উপস্থিত হওয়ার আগে যে দুটি পূর্বআলোচ্যের উল্লেখ করেছি, বঙ্কিমের প্রভাব স্বীকার এবং মাইকেলের প্রভাব অস্বীকার, তার আলোচনা শেষ করে এবারে আসল কথায় আসা যেতে পারে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে তাঁর সাহিত্যিক ঋণের প্রকৃতি ও ব্যাপকতা।

ভাষারীতি, কাহিনীবিন্যাস, পাত্র পাত্রীর চরিত্র সংগঠন এবং স্থল বিশেষে ঘটনায় ও মনীষায় অর্থাৎ জীবনদৃষ্টিতে ঐক্য—প্রধানতঃ এই কয়েকটি বিষয়ে তিনি অনেকাংশে বঙ্কিমের কাছে ঋণী।

প্রথমে ভাষারীতির ঐক্যের ও অনৈক্যের কথা আলোচনা করা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার প্রধান লক্ষণ তা সূত্রাত্মক, রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাত্মক। সূত্রাত্মক ও ব্যাখ্যাত্মক বলতে কি বোঝায় ক্রমে প্রকাশ পাবে। ভাষারীতি গঠিত হয়ে ওঠবার মূলে লেখকের বাস্তব জীবনের প্রভাব বিদ্যমান। একে একটা সাহিত্যিক অলঙ্ঘ্য নিয়ম বলে ধরে নিলে অন্যায় হবে না। বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চ সরকারী কর্মচারী ছিলেন, অর্থাৎ তাঁর কর্মজীবনের প্রভু ইংরেজ সরকার। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বাধীন। দিনমানের বারো ঘণ্টার মধ্যে দশটা পাঁচটা অর্থাৎ প্রায় ৭।৮ ঘণ্টাকাল বঙ্কিম কর্মশৃঙ্খলে বদ্ধ। দিন রাত্রির চব্বিশ ঘণ্টা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সম্পত্তি। অবশ্য এক সময়ে প্রায় দশ বৎসর কাল পৈতৃক সম্পত্তির তদারকি করেছেন, কিন্তু সেখানেও তিনি প্রভু। রামপ্রসাদ প্রভুর হিসাবের খাতায় কবিতা লিখে বরখাস্ত হয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথও একই খাতায় জমিদারির সদর খাজনার হিসাব ও কবিতা লিখেছেন [ দ্রষ্টব্য সোনারতরী কাব্যের পাণ্ডুলিপির একখানি খাতা ] কিন্তু সেখানে কে কাকে বরখাস্ত করবে। বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে একান্ত নিরুপায় ছিলেন, সরকারী খাতাপত্রে প্রাসঙ্গিক বিষয় ছাড়া আর কিছু লিখবার অধিকার তাঁর ছিল না। কমলাকান্তের বিচিত্র

Pay Bill রচনার ফলে চাকুরি খতম প্রসঙ্গে কমলাকান্তের স্রষ্টা নিজের অসহায় অবস্থা বর্ণনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র কখন্ লেখাপড়া করতেন শীর্ষক প্রবন্ধে বিষয়টি আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে। তবেই দাঁড়ালো যে দিনের ৭।৮ ঘণ্টা কাল প্রভুর কাজে সমর্পণ করে এবং আহার নিদ্রা প্রভৃতির জন্যও আবশ্যক সময় বাদ দিয়ে যে সময়টুকু হাতে থাকলো সেই সময়টুকুই তাঁর সাহিত্যসাধনার মূলধন। কাজেই তাঁকে সংক্ষেপে লিখতে হয়েছে, ফলাও করে বলবার সময় তাঁর ছিল না। প্রধানতঃ এই কারণেই তাঁর গদ্য স্থত্রবৎ সংক্ষিপ্ত আকার ধারণ করেছে। এইজন্যেই তাঁর উপন্যাসগুলি আকারে ছোট, আর আকারে ছোট বলেই ঘনপিনদ্ধ। এ যুগের লেখকগণ উপন্যাসাকারে যে-সব থান ইট রচনা করেন— তেমন করবার সময় তাঁর ছিল না, ইচ্ছাও বোধকরি ছিল না। তাঁর প্রায় প্রত্যেক উপন্যাস নাটকের পঞ্চমাঙ্কের মতো, যাতে একসঙ্গে স্থচনা ও সমাপ্তি কথিত। তাঁর প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে একথা অধিকতর প্রযোজ্য। "বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রাত নিবেদন" নামে প্রবন্ধটি বারোটি স্থত্রের সমষ্টি। এর চেয়ে সংক্ষেপে এর চেয়ে অধিক বাংলা ভাষায় আর কখনো লিখিত হয় নি। তাঁর উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে অনেক প্রশ্নাত্মক বাক্য, যাতে একই সঙ্গে প্রশ্ন ও উত্তর সমাহৃত। তারও কারণ সংক্ষেপসাধন প্রয়াস। বঙ্কিমচন্দ্র সংক্ষেপ রসের রসিক বলেই স্থত্রকার। প্রাচীন কালে জন্মগ্রহণ করলে সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের মতো বক্তব্য স্থত্রাকারে লিখে যেতেন।

রবীন্দ্রনাথের হাতে প্রচুর সময়, স্থত্রাকারে সংক্ষেপ সাধনায় তাঁর প্রয়োজন ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে এক বিষয়ে একাধিক প্রবন্ধ লিখবার অবকাশ পান নি, রবীন্দ্রনাথ সেখানে বহুতর প্রবন্ধ লিখেছেন—আর একই বিষয়কে বহুতর অলঙ্কারে সজ্জিত করে বিভিন্ন মূর্তিতে প্রকাশ করেছেন, কি গদ্যে, কি পদ্যে। "সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা"—তত্ত্ব হিসাবে একথা রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই স্বীকার করেন; বঙ্কিমের মতো তিনিও সরলতার সন্ধানী ছিলেন, তবে পদ্যে শেষ চার পাঁচখানি কাব্য ছাড়া কখনো পেরেছেন কিনা সন্দেহ। গদ্যে কখনো পান নাই বল্‌লে অন্যায় হয় না। রবীন্দ্রনাথের গদ্যে প্রথমদিকে যেখানে বঙ্কিমী ভাষারীতির প্রভাব প্রবল সেখানে সরলতার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল, কিন্তু ক্রমশঃ যতই অধিকতর স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, অলঙ্কারের আতিশয্যে সরলতা চাপা পড়ে গিয়েছে। গোরার সঙ্গে ঘরে বাইরে, শেষের

কবিতা প্রভৃতির তুলনা করলেই প্রভেদ বুঝতে পারা যাবে। গদ্যভাষা সম্বন্ধে এ সত্য অধিকতর প্রযোজ্য। ১৮৮৪-৮৫ সালে প্রকাশিত আলোচনা গ্রন্থখানি এমন একটি উদাহরণ। এখানে ভাষারীতিটাই আলোচ্য, ভাবের গভীরতা নয়।

রবীন্দ্রনাথের অল্প বয়সের ভাষারীতির কিছু নমুনা দিচ্ছি। এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দেওয়া আবশ্যক যে বঙ্কিমচন্দ্রের বাক্যগুলি গড়ে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় রীতির বাক্যের চেয়ে দৈর্ঘ্যে ছোট - যদিচ প্রয়োজনবোধে অনেকস্থলে দীর্ঘতর হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অলংকারভূষিত বাক্যগুলি লতায়িত, লতার নমনীয়তা ও কোমলতা তাদের বৈশিষ্ট্য; বঙ্কিমচন্দ্রের বাক্যগুলি তরবারির দৈর্ঘ্যের চেয়ে বেশি নয়—সেই সঙ্গে আছে তরবারির তীক্ষ্ণতা ও উজ্জ্বলতা. প্রয়োজনকালে এই তরবারি ছোরার আকারের মতো হ্রস্ব। এগুলিকে এপিগ্রাম বলা চলে, "সুন্দর মুখের জয় জয় সর্বত্র" এরকম এপিগ্রাম বহুলতা রবীন্দ্রনাথে বিরল। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ভাষারীতির সঠিক বিবরণ দিতে গেলে উভয়ের বাক্যের গড় দৈর্ঘ্য নিয়ে আলোচনা করা আবশ্যক, তাতে বয়সের সঙ্গে বাক্যের দৈর্ঘ্যের মাপজোক প্রয়োজন, আর প্রয়োজন শব্দ ব্যবহারের, বিশেষণ ব্যবহারের, ও অলঙ্কার ব্যবহারের প্রকৃতি নির্দ্ধারণ। যে সব সমালোচকদের হাতে সময় প্রচুর, মনে নিষ্ঠা সমধিক এ গবেষণা কেবল তাদের দ্বারাই সম্ভব। আবার বাক্যের সঙ্গেই যুক্ত প্যারাগ্রাফ বা অনুচ্ছেদ গঠনের বৈশিষ্ট্য। ভাষারীতির প্রাণ বাক্য নয়—অনুচ্ছেদ। অনুচ্ছেদগুলি প্রায় সমান মাপের হওয়া আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের রচনায় দেখতে পাওয়া যাবে কোন কোন অনুচ্ছেদে একটি বা দুটি মাত্র বাক্য—তারপরে সুদীর্ঘ অনুচ্ছেদ। বঙ্কিমচন্দ্রে এরকম হ্রস্ব দীর্ঘ অনুচ্ছেদ অত্যন্ত বিরল। এ সব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্র বর্তমান প্রসঙ্গ নয়, ও স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়। এরকম আলোচনা করতে গেলে যে সময়, নিষ্ঠা ও অভ্যাসের আবশ্যক বর্তমান লেখকে তা নেই। তবে ইঙ্গিত দেওয়া যেতে পারে, সেই ইঙ্গিত দিয়েই আসল প্রসঙ্গে ফিরে যেতে হচ্ছে। প্রসঙ্গটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের ভাষা-রীতির উপরে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব, সিদ্ধান্ত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের প্রারম্ভিক গ্রন্থ সমূহের বাক্যের আকারের হ্রস্বতা। এবারে কিছু উদাহরণ। এ সমস্তই তাঁর ২০ থেকে ২৩ বছর বয়সের মধ্যে লিখিত।

(১) অনেকের গরীব মানুষী করিবার সামর্থ্য নাই। এত তাহাদের টাকা নাই যে গরীব মানুষী করিয়া উঠিতে পারে।

(২) বড় মানুষী কথা হইতে আরেক কথা মনে পড়িয়াছে। যে ব্যক্তি স্বভাবত বড় মানুষ সেই ব্যক্তি যে বিনয়ী হইয়া থাকে একথা পুরানো হইয়া গিয়াছে।

(৩) এক বা একজন মাত্র লোক কিছুই নহে। সে ব্যক্তিই নহে।

(৪) ভালো জহুরি না হইলে খাঁটি বিনয় চিনিতে পারে না। একদল অহঙ্কারী আছে তাহারা অহঙ্কার করা আবশ্যক বিবেচনা করে না।

(৫) লিখিলে লেখা শেষ হয় না। পুঁথি যে ক্রমেই বাড়িতে চলিল। আর সকল কথা লিখিলেই বা পড়িবে কে? কাজেই এইখানেই লেখা সাঙ্গ করিলাম।

শেষের বাক্যটি কমলাকান্তের শেষ পর্যায়ের উক্তি কি মনে করিয়ে দেয় না?

এ সমস্ত রচনা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীর চতুর্দ্দশ খণ্ডে বিবিধ প্রসঙ্গ অধ্যায়ে সংগৃহীত। আসলে এগুলি ভারতীতে প্রকাশিত প্রবন্ধের সংগ্রহ।

এই পর্যায়ের অধিকাংশ রচনাই একটি মাত্র অনুচ্ছেদে সম্পূর্ণ, কোন কোন স্থানে একাধিক। আবার কোন কোন রচনা ৪/৫টি ছত্রের অধিক নহে। এ যেন মনের মধ্যে নোট করে রাখা। এই রচনা কণিকাগুলি পরবর্ত্তী কালের কণিকা কাব্যকে মনে করিয়ে দেয়। বস্তুতঃ এসব গদ্য কণিকা, কিম্বা কণিকা কাব্যের সংক্ষিপ্ত কবিতাগুলিকে গদ্যে বিস্তার সাধন করলে এইরূপ আকার ধারণ করতো। এইসব রচনার বিষয়ে গভীরতা আছে তবে অভিজ্ঞতার অভাবে গভীর হয়ে উঠতে পারেনি। এই সব বিষয় নিয়ে পরবর্তীকালে তিনি গভীর ও বিস্তারিত রচনা করেছেন, আর তার বাক্যগুলিও এত হ্রস্ব নয়। শান্তিনিকেতন উপদেশ মালার সঙ্গে মিলে ও অমিলে পড়লে দেখা যাবে মিলটা বিষয়ে, অমিল গদ্যরীতির ও ভাবের অমিলে। অমিল অর্থে বৈপরীত্য নয়, অমিল অর্থে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধিতে গভীর হয়ে ওঠা।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষারীতির প্রভাব সম্বন্ধে নিতান্ত অত্যাবশ্যকটুকু এখানে কথিত হল, পরবর্ত্তী চারখানি গ্রন্থের বা রচনার আলোচনার সময়ে অত্যাবশ্যক ও অনতি আবশ্যক বলবার ইচ্ছা রইলো। এই চারখানি গ্রন্থ বা রচনা, ভিখারিনী, করুণা, বৌঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষি। রচনাকাল হিসাবে প্রথম দু'খানি অগ্রবর্ত্তী, তৎসত্ত্বেও কেন বৌঠাকুরাণীর হাট দিয়ে আরম্ভ করবো তা একেবারে প্রারম্ভেই বলেছি। বিষবৃক্ষ দিয়ে বঙ্কিমের রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের

প্রথম পরিচয় আর প্রকৃত প্রস্তাবে বৌঠাকুরাণীর হাটকেই তাঁর প্রথম উপন্যাস বলা উচিত। এরকম স্থলে মিল না থাকাই অসম্ভব।

বৌঠাকুরাণীর হাটে বিষবৃক্ষ ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম তিনখানি উপন্যাসের মিশ্রণ। কিন্তু সে প্রসঙ্গে প্রবেশ করবার আগে বৌঠাকুরাণীর হাটের ভাষা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এ বইখানির বাক্যের ছাঁচের আদর্শ বঙ্কিমী ভাষারীতি। এ বই প্রকাশের সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স বাইশ বছর, বঙ্কিমের চেয়ে তিনি ২৩ বছরের ছোট ; তখন আনন্দমঠ প্রকাশিত হয়ে দেবী চৌধুরাণীর ধারাবাহিকতা চলছে। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। বাইশ বছরের যুবক যে প্রবীণের দ্বারা প্রভাবিত হবেন বিস্ময়ের কিছু নয়। বৌঠাকুরাণীর হাটের ভাষায় হ্রস্ববাক্য, প্রশ্নাত্মক বাক্য অবিরল, আবার স্থান ও কালের বর্ণনাভঙ্গীও বঙ্কিমচন্দ্রীয়।

"রাত্রি অনেক হইয়াছে। বাতাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গাছের পাতাটিও নড়িতেছে না। যশোহরের যুবরাজ, প্রতাপাদিত্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়াদিত্য তাঁহার শয়নগৃহের বাতায়নে বসিয়া আছেন। তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার স্ত্রী সুরমা।"

"ছয় মাসের মধ্যেই বিষম বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। খাজনা কমিয়া গেল। প্রজারা আশীর্বাদ করিতে লাগিল। কর্মচারীরা আমার বিরুদ্ধে রাজার নিকটে অভিযোগ করিতে লাগিল।"

এসব গেল হ্রস্ব বাক্যের নমুনা। প্রশ্নাত্মক বাক্যও যথেষ্ট।

প্রতাপ। প্রজারা জানিতে পারিলে তো?

এই প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর—অর্থাৎ প্রজারা জানতে পারবে না।

প্রতাপ। আমার সন্তান যে এমন হইবে তাহা কে জানিত?

অর্থাৎ কেহই জানিত না।

সুরমা। ছিঃ বিভা এখন কি তাহা ভাবিবার সময়?

অর্থাৎ এখন ভাবিবার সময় নয়। সোজা বললেই হ'ত এখন ভাববার সময় নয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে যুবরাজ উদয়াদিত্যের একাকী অশ্বারোহনে গভীর রাত্রে পথ চলবার দীর্ঘ অনুচ্ছেদটি আনন্দমঠে থাকতে পারতো। অথবা জগৎ সিংহের কোন যুদ্ধ যাত্রার বর্ণনা হতে পারতো, কিম্বা ব্রজেশ্বরের একাকী গভীর রাত্রে অশ্বারোহনে প্রফুল্লকে দেখবার উদ্দেশ্যে গমনের বর্ণনাও হতে পারতো। ভাষারীতির মিল দেখাবার উদ্দেশ্যে এই অংশগুলিই যথেষ্ট।

আগে যে বিষবৃক্ষের সঙ্গে দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি তিনখানি উপন্যাসের মিলনের উল্লেখ করেছি তার তাৎপর্য কি? বিষবৃক্ষ সামাজিক উপন্যাস। দুর্গেশনন্দিনী আদি তিনখানিকে কোন্ পর্যায়ে ফেলবো? সামাজিক না ঐতিহাসিক? বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক বলেন নি, যদুনাথ সরকার দুর্গেশনন্দিনীকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে স্বীকার করেছেন। আমরা এদুটির মাঝামাঝি একটা নাম গ্রহণ করতে পারি, ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস। ইতিহাসের আশ্রয় না পেলে তারা দাঁড়াতে পারে না, দুর্গেশনন্দিনী ও মৃণালিনীতো একেবারেই পারে না, এমন কি কপালকুণ্ডলার মতো স্বপ্নাশ্রয়ী গল্পটিও অনেকাংশে নিরর্থক হয়ে যায়। প্রথম দু খানির পশ্চাতে আকবর ও আগ্রার ছায়া, তৃতীয় খানির পশ্চাতে বখতিয়ার খিলজি ও দিল্লীর ছায়া। অথচ ছায়াতে কায়াতে কেমন অনায়াস মিল। এমন অসম মিলন বঙ্কিমচন্দ্রের যাদুকরী ক্ষমতা। এ ক্ষমতা পরবর্তী কোনো বাঙালী ঔপন্যাসিকে দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ বৌঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষিতে দুইবার চেষ্টা করে ও পথটা ছেড়ে দিয়েছেন। তবু বৌঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষির মধ্যে প্রথমখানিতে অনেকটা উৎরেছে, তার কারণ দিল্লীশ্বর পশ্চাতে থাকলেও অবাঞ্ছিত ছায়া ফেলতে পারেনি উপন্যাসে। দিল্লীশ্বরের প্রভাব সশরীরে এনে ফেলবার ফলে রাজর্ষি উপন্যাস দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে সচেতন হয়েছিলেন বলেই সূচনায় লিখতে বাধ্য হয়েছেন "বস্তুত উপন্যাসটি সমাপ্ত হয়েছে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে।" "এত রক্ত কেন?" এই হলো রাজর্ষির জিজ্ঞাস্য। সে জিজ্ঞাসার মীমাংসা হয়ে গিয়েছে জয়সিংহের রক্তদানে। পরবর্তী অংশে রঘুপতির প্রতিশোধেচ্ছা, নক্ষত্ররায় ও তার নির্বাসন, শাসুজা ও তার কন্যা মূল জিজ্ঞাসার অন্তর্গত হয় না, ও অন্য একখানি উপন্যাসের বিষয় হতে পারতো। দু'খানিতে মিল ঘটেনি। বঙ্কিমচন্দ্র হলে কি করতেন জানিনা, খুব সম্ভব জাদুদণ্ডের স্পর্শে ছায়াতে কায়াতে মিল ঘটিয়ে একীভূত করে দিতেন। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন উপন্যাস দুখানিতেই মানবিক সত্য আছে তবে কাঁচা কলমের দোষে তা শিল্পের সত্য হয়ে ওঠেনি। এই মানবিক সত্যের আকর্ষণেই পরবর্তীকালে উপন্যাস দু'খানিকে ভেঙে নাট্যাকারে পরিণতি দিয়েছেন পরিণত কলমে। খুব সম্ভব এই মানবিক সত্যের আভাস দেখতে পেয়েছিলেন বলেই বঙ্কিমচন্দ্র অযাচিতভাবে বৌঠাকুরাণীর হাটের প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথকে পত্রযোগে উৎসাহ দিয়েছিলেন। মোটের

উপরে উপন্যাসদ্বয়ের মধ্যে প্রথমখানি অধিকতর তৃপ্তিদায়ক, রাজর্ষির মতো তাতে আত্মগণ্ডন নেই। রাজর্ষি পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত হলে এই সমর্থন দাবী করতে পারতো।

এ পর্য্যন্ত গেল অমিলের কথা, অর্থাৎ বিষবৃক্ষের সঙ্গে দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতির সঙ্গে মেলাবার চেষ্টায় যে বিপর্য্যয় ঘটেছে।

এবারে মিলের কথা অর্থাৎ বিষবৃক্ষের সঙ্গে। মিল নরনারীর চরিত্রে ও কিছু কিছু ঘটনায়। বৌঠাকুরাণীর হাটের রুক্মিণী হীরার আদর্শে পরিকল্পিত। উদয়াদিত্যের ব্যর্থ প্রেমের আক্রোশে সে ব্যাঘ্রিনী, তার ব্যর্থ প্রেম প্রবল জিঘাংসায় পরিণত, লক্ষ্য সুরমা। ঘটনাচক্র সুবিধা করে দিয়েছে, হীরার মতোই সে বিষ জুগিয়ে দিয়েছে সুরমাকে মারবার জন্যে। ভেবেছিল সুরমার মৃত্যুর পরে আবার সে আপন স্থানটি পাবে উদয়াদিত্যের হৃদয়ে। সে আশায় ছাই পড়লে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করলো। ছাঁচটা হীরা চরিত্রের, তবে হীরায় যা সূক্ষ্ম রেখায় অঙ্কিত, কাঁচা হাতে পড়ে তা melodramatic হয়ে উঠেছে। রুক্মিণী আগাগোড়া বিকারগ্রস্ত আর সেই কারণেই পাঠকের বিশ্বাসের উপরে পীড়ন ঘটায়।

সুরমাকে ঠিক কুন্দনন্দিনী বলা যায় না, কুন্দনন্দিনীর দোসর সম্ভব নয়, তবে কুন্দর মতো অনেকটা সরল ও নিষ্ক্রিয় বটে, সব জেনেশুনেই সে বিষপান করেছিল যাতে উদয়াদিত্য মুক্তি পায় প্রতাপাদিত্যের ক্রোধের বলয় থেকে।

বসন্ত রায়কে আমাদের মনে রাখতে হবে। কেননা এই চরিত্রটিই পরবর্তী কালের ঠাকুর্দা, দাদাঠাকুর প্রভৃতির উৎস। অবশ্য বসন্ত রায়ের উৎস আবার জীবনস্মৃতি গ্রন্থে চিত্রিত শ্রীকণ্ঠ সিংহ। এ বিষয়ে আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি।

রবীন্দ্রনাথ অবিচার করেছেন রামচন্দ্র রায়ের প্রতি, সে অস্থিরমতি ও ভীরু ছিল না, বীরপুরুষ ছিল বলেই প্রসিদ্ধ।

প্রতাপাদিত্যের চরিত্র ও সে বিষয়ে সূচনায় কবির মন্তব্য ইতিহাস সম্মত। সমাজকে চিনতে পারা যায় তার Hero নির্বাচন দেখে। স্বদেশী আমলে বাঙালী Hero'র সন্ধানে বের হয়ে প্রতাপাদিত্য, নন্দকুমার, সিরাজদৌল্লা প্রভৃতিকে আবিষ্কার করলো। আবিষ্কার বটে! তবে এ বিষয়ে আলোচনা

এখানে অনাবশ্যক, কারণ এক্ষেত্রে বিষবৃক্ষ বা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে রবীন্দ্রনাথ ঋণী নন।

উপন্যাস দুখানির আলোচনায় দেখা গেল যে ভাষারীতিতে, চরিত্র পরিকল্পনায়, রুক্মিণীর বিষদান ঘটনায়, এবং কাহিনী বিন্যাস প্রয়াসে রবীন্দ্রনাথ অধমর্ণ, বঙ্কিমচন্দ্র উত্তমর্ণ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে রাজর্ষি উপন্যাসকে সমাপ্ত বলে ধরলে দেখা যায় যে ভাষারীতি এখনো বঙ্কিম প্রভাবিত, তবে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা ক্রমে প্রকটতর হয়ে উঠছে। ভাষারীতিতে সংলাপগুলি এখনো সাধুভাষা ব্যবহৃত—এ রীতি নৌকাডুবি পর্য্যন্ত চলেছে, গোরাতে এসে সংলাপে কথ্যভাষা দেখা গেল, যদিচ বর্ণনা অংশে তখনো সাধুভাষা। রাজর্ষিতে অনেকগুলি প্রাকৃতিক বর্ণনা আছে, অরণ্য, নদী, পর্বত প্রভৃতি নিছক প্রাকৃতিক নয়, তাদের মধ্যে পাত্রদের মনস্তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাকৃতিক বর্ণনায় যেমন সমাজ প্রতিবিম্বিত, রাজর্ষিতে তেমন হয়ে ওঠে নি। প্রভেদটা বুঝতে পারা যাবে বিষবৃক্ষের প্রথমে নগেন্দ্রনাথের নৌযাত্রা পথে নদীর বর্ণনার সঙ্গে তুলনা করলে। সে নদীতে, নাম নাই, খুব সম্ভব গঙ্গা, সমস্ত বাংলাদেশের সমাজ প্রতিফলিত। গোবিন্দ মাণিক্যের মতো আদর্শ চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রে আছে বলে মনে পড়ে না। তবে রাজর্ষির বিল্বন ঠাকুরে, সে সন্ন্যাসী, বঙ্কিমচন্দ্রের সন্ন্যাসীদের আদর্শ আছে মনে করলে অন্যায় হবে না। তবে, আগেই বলেছি, আবার মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে বৌ-ঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষি দু'খানা ইতিহাসের মশলা দিয়ে গঠিত, এ ধারার এখানেই শেষ, পরবর্তী উপন্যাস সমূহ সম্পূর্ণ সামাজিক। তবে তিনটি ছোটগল্পে ইতিহাসের মিলন আছে। মুকুট, দালিয়া ও দুরাশা।

দুরাশার ঐতিহাসিক পট সিপাহি বিদ্রোহ—ঐটুকু ছাড়া বঙ্কিম প্রভাব বর্জিত। মুকুট ও দালিয়া সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। মুকুট ত্রিপুরা রাজবংশের এক রাজপুত্রের কাহিনী, আর দালিয়ায় রাজর্ষিতে কথিত পলায়নপর শাসুজার মেয়েদের কাহিনী। ত্রিপুরা রাজবৃত্ত রবীন্দ্রনাথ সহজে অতিক্রম করতে পারেন নি, পরিণত বয়সে রাজর্ষি, মুকুট ও দালিয়া তিনখানিকেই নাট্যরূপ দান করেছেন। ত্রিপুরারাজ কর্তৃক ভগ্নহৃদয় কাব্যের প্রশংসা তিনি ভোলেন নি, এগুলি তারই প্রতিদান বলে গ্রহণ করা উচিত।

মুকুট ও দালিয়া গল্পগুচ্ছে স্থান পাওয়ায় গল্প বলে চলে গিয়েছে, কিন্তু এ দুটিকে

ঠিক ছোটগল্প বলা উচিত নয়, বংশ বিচারে এরা উপন্যাস, তবে উপন্যাসের বিস্তার এদের নাই। এ দুটিকে রাজর্ষির অনুক্রম বলে গ্রহণ করা উচিত। ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত ভিখারিণীকেই প্রথম ছোটগল্প বলা উচিত। তবে বঙ্কিমচন্দ্র এ ধারাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করেন নি, চন্দ্রশেখর, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম ও রাজসিংহ ইতিহাসের ধারাশ্রয়ী—কিন্তু ইতিহাস এসব গ্রন্থে আধার মাত্র, আধেয় বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য ও জীবনতত্ত্ব।

এবারে প্রাক্ বৌঠাকুরাণী দুটি রচনার আলোচনা করা যেতে পারে। এ দুটি ভিখারিণী ও করুণা। দুটিই প্রায় সমকালে রচিত, ভিখারিণী আগে, পরে করুণা, কবির বয়স তখন ষোল সতেরোর মধ্যে। এ দুটিতে প্রথম লক্ষ্য করবার বিষয় ভাষায়; ভাষা অবশ্যই বঙ্কিমচন্দ্রীয় কিন্তু বাংলা গদ্য যখন প্রথম গঠিত হয়ে উঠেছে, ভাষার সেই একমেটে আমলে ১৬/১৭ বয়স কিশোরের কলমে এ ভাষা শুধু প্রশংসা নয়, বিস্ময়ের উদ্রেক করে। তবে গল্প হিসাবে দুটিই অকিঞ্চিৎকর।

ভিখারিণীকে প্রথম ছোটগল্প বলেছি, তবে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প বলতে যেমন বুঝি এটি সে পর্য্যায়ের নয়, রাধারাণী ও যুগলাঙ্গুরীয় জাতের রচনা এটি। এটি হলে হতে পারতো উপন্যাস, যেমন নাকি রাধারাণী ও যুগলাঙ্গুরীয়। ছোট ইন্দিরা বড় হয়ে দেখিয়েছে যে সে আসলে উপন্যাস।

ভিখারিণী রচনার সামান্য কিছুকাল আগে চন্দ্রশেখর ও রাধারাণী প্রকাশিত হয়। গল্পাংশে ভিখারিণী তাদের দ্বারা প্রভাবিত। বালিকা কমলদেবী ও কিশোর অমর সিংহের প্রণয় শৈবলিনী ও প্রতাপকে মনে পড়িয়ে দেয়, তবে প্রতাপ জানতো তাদের বিবাহ হওয়ার নয়, এখানে দুজনেই জানে যথাসময়ে বিবাহ হবে। ঘটনাচক্রে বিবাহ হ'লনা, "বাল্য প্রণয়ে অভিসম্পাত আছে।" আবার ভিখারিণীর পরবর্তী অংশ মনে পড়িয়ে দেয় রাধারাণীকে। রাধারাণীর মাতা ধনী ছিলেন, এখন দরিদ্র; রাধারাণী রুগ্নমাতার পথ্য সংগ্রহের আশায় রথের মেলায় গিয়েছে বনফুলের মালা বিক্রয়ার্থে।

কমলের মাতাও দরিদ্র হয়ে পড়েছে, কমল বেরিয়েছে রুগ্না মাতার পথ্য সংগ্রহার্থে ভিক্ষায়, অমর সিংহের সঙ্গে বিবাহ হয়নি, হঠাৎ তাকে যুদ্ধ যাত্রা করতে হয়েছে। ভিখারিণী কমল দস্যুহস্তে বন্দী, তাকে উদ্ধারের আশায় ধনী মোহনলালের সঙ্গে মাতা তাকে বিবাহ দিতে বাধ্য হয়েছে। এই দুটি অংশে

কমল ও অমরসিংহের বাল্যপ্রণয়ে, এবং দারিদ্র্যে নিপতিত কমলের ভিক্ষাচয়ণে যথাক্রমে চন্দ্রশেখর ও রাধারাণীর প্রভাব। ভাষা ও প্রকৃতি বর্ণনা সম্পূর্ণ বঙ্কিমচন্দ্রীয়। ষোল বছরের বালকের রচনায় অন্যরূপ আশা করা অনুচিত। পার্বত্য জীবনের বর্ণনায় ১২/১৩ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের হিমালয়ে কিছুকাল যাপনের প্রভাব থাকলেও থাকতে পারে। এর প্রায় সমকালে রচিত করুণা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস রচনার প্রথম প্রয়াস।

করুণা উপন্যাসখানা পড়তে বসে বিস্ময় লাগে গ্রন্থকার করুণা রচনার ৫/৬ বছরের মধ্যে কি করে বৌঠাকুরাণীর হাট ও বছর দুই পরে রাজর্ষি লিখলেন। বৌঠাকুরাণীর হাট পাকা লেখা নয় সত্য তবে করুণাকে কাঁচা বললে যথেষ্ট বলা হয় না, পূর্ববর্তী অনেক লেখকের প্রভাবের একটা অদ্ভুত সমন্বয়। ধনীর কন্যা করুণা গ্রন্থের নায়িকা, পিতার মৃত্যুর পরে নরেন্দ্র নামে এক বালকের সঙ্গে করুণার বিবাহ সম্পন্ন হ'ল। তার পরেই আরম্ভ হ'ল করুণার করুণ কাহিনী। নরেন্দ্র কলকাতায় পড়তে গেল, কলকাতার বাতাস গায়ে লেগে মদ্যপানাদি স্বরু করলো, ধনী মদ্যপের যোগ্য সঙ্গী জুটতে প্রায় দেরী হয় না। গদাধর ও স্বরূপ নামে দুই সঙ্গী জুটলো, স্বরূপ আবার কবি। বাঙালী স্ত্রীগণের স্বাধীনতা সাধনে তৎপর হ'ল তারা—প্রথম লক্ষ্য মোহিনী নামে এক বিধবা প্রতিবেশী।

অতঃপর মহেন্দ্র ও রজনী নামে এক দম্পতির সাক্ষাৎ পাই। রজনী কুরূপা, মনের দুঃখে মহেন্দ্র মদ্যপান শিখলো নরেন্দ্রের দলে। পরে আর এক দম্পতির দেখা পাই বৃদ্ধ পণ্ডিত মশাই ও দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী ভার্য্যা।

তার পরে আরম্ভ হ'ল এই তিন দম্পতির আজগুবি দুঃস্বপ্নের কাহিনী। নরেন্দ্রের দারিদ্র্য, মহেন্দ্রের গৃহত্যাগ, ইতিমধ্যে মোহিনী হরণের চেষ্টা, নরেন্দ্রের ঋণভয়ে গৃহত্যাগ ও বেশ্যালয়ে আশ্রয় গ্রহণ, গদাধর কর্তৃক পণ্ডিতের স্ত্রী কাত্যায়নীকে নিয়ে পলায়ন। মহেন্দ্রের আত্মগ্লানি ও সংশোধন, করুণার চরিত্র সম্বন্ধে নরেন্দ্রের সন্দেহ, সেই সুযোগে করুণাকে নিয়ে পলায়ন। সবশুদ্ধ মিলে দুঃখের পঞ্চতিক্ত কষায় পাঁচন তৈরী। ঘটনাস্থল করুণার গ্রাম থেকে কলকাতা, কাশী, এলাহাবাদ, লাহোর প্রভৃতি শহর। অবশেষে সংশোধিত চরিত্র মহেন্দ্রের গৃহে প্রত্যাগমন ও তার চেষ্টায় হৃত দরিদ্র নরেন্দ্রের সঙ্গে করুণার মৃত্যু শয্যায় উভয়ের সাক্ষাৎ।

উপন্যাসখানিতে বিষবৃক্ষ ও সধবার একাদশীর প্রভাব অনুভূত হয়। বিষবৃক্ষের দেবেন্দ্র কুরূপা পত্নীর রূপ ও আচরণের প্রতিক্রিয়ায় মদ্যপায়ী হয়ে উঠেছে, সেই সঙ্গে স্ত্রী স্বাধীনতার (অপরের) অন্যতম উৎসাহী। নরেন্দ্রের মদ্যপানের ফলে করুণার দুর্দশা, রজনীর রূপহীনতায় মদ্যপান শিখে মহেন্দ্রের অধঃপতন ও গৃহত্যাগ, উভয়েরই পরস্ত্রী স্বাধীনতা দানে পরম উৎসাহ। এ সমস্তই বিষবৃক্ষ ও সধবার একাদশীর প্রভাব সঞ্জাত তবে এ দুটি বই পাকা হাতের রচনা, করুণা যতদূর কাঁচা হওয়া সম্ভব তাই। এই আজগুবি জনতার মধ্যে দু'জনকে মানুষ বলে মনে হয়। হাস্যাস্পদ হওয়া সত্ত্বেও পণ্ডিতমশাই ও মোহিনী। বেশ বুঝতে পারা যায় এতগুলি নরনারী নিয়ে জটিল গল্প বুনবার কৌশল এখনো রবীন্দ্রনাথের আয়ত্ত হয়নি। সরলা ও সংসার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ করুণায় কুন্দনন্দিনীকে আবছায়ায় দেখা যায় আর মোহিনীতে দেখা যায় বিনোদিনীর পূর্বগামিনী ছায়া। তবে ভাষাটা যে অপটু নয় তার কারণ ইতিমধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কল্যাণে বাংলাভাষা অনেকটা পরিণত হয়ে উঠেছে।

অতঃপর বৌঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষি, তারপরে দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথ আর উপন্যাস রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নি। চোখের বালিকে অনেকে প্রথম মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস বলেন, কিন্তু বঙ্কিমের রজনী ও পরিণত ইন্দিরায় তার সূত্রপাত বললে অন্যায় হয় না। তবে রজনী ও পরিণত ইন্দিরায় মনস্তত্ত্বের খেলার সঙ্গে আছে ঘটনা বৈচিত্র্য তাই সে খেলাটা সহজে চোখে পড়ে না, ঘটনাবিরল চোখের বালিতে চোখে না পড়ে যায় না। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের একটি প্রধান দোষ, তাদের অধিকাংশেই শেষাংশ তেমন সঙ্গত ও তৃপ্তিদায়ক হয় না; মনে হয় ক্লান্ত লেখনী মনে মনে নূতন কিছু রচনার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছে, পুরাতনের সুষ্ঠু সমাধানে আর তেমন উৎসাহী নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস Steel Frame-এ শক্ত করে আঁটা, অলিখিত ঢোকাবার ও লিখিত বাদ দেবার অবকাশ নাই। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস স্রোতস্বিনী, চলতে চলতে বালুস্তূপের দলে হঠাৎ লুপ্ত সরস্বতীতে পরিণত হ'য়ে যায়। আবার কিছু দূরে এসে সেই ধারাটাই দেখা দেয় তখন দুই বোন হয় মালঞ্চ, নষ্টনীড় হয় চোখের বালি, আরও পরে নৌকাডুবি।

নরনারীর চরিত্র সম্বন্ধেও এ কথা অনেকটা প্রযোজ্য যেমন কালান্তরে মোহিনী হয় বিনোদিনী।

চোখের বালি ও নৌকাডুবির ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র প্রভাব সংলাপে সাধুভাষা ব্যবহার।

রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব চোখে পড়ে না, কেবল সমাপ্তি গল্পের মৃন্ময়ীকে নখদর্পণে কপালকুণ্ডলার প্রতিবিম্ব বলে মনে হয়—বিবাহের পরে সংসারে এসে তারও নামকরণ হয়েছিল মৃণ্ময়ী। কোথায় কাপালিক পালিতা, সমুদ্রলালিতা বনবাসিনী কপালকুণ্ডলা আর কোথায় গৃহস্থ ঘরের মেয়ে মৃণ্ময়ী। আমার ধারণা কপালকুণ্ডলা যদি দৈব বিড়ম্বিত না হ'তো তবে মৃণ্ময়ী-কপালকুণ্ডলার সমাপ্তি গৃহস্থ ঘরের মেয়ে মৃণ্ময়ীর মতোই হতে পারতো।

রবীন্দ্রনাথ একস্থানে মন্তব্য করেছেন কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু হল বটে সূর্য্যমুখী ও নগেন্দ্রের বিচ্ছেদ তাই বলে সম্পূর্ণ দূর হ'ল না, মাঝখানে কণ্টকময় ব্যবধান রচনা করে শয়ান রইলো কুন্দনন্দিনীর স্মৃতি। তার মধ্যবর্তীনী গল্পটি তেমনি একটি ব্যবধানের উদাহরণ। শৈলবালা মরলো, মরেও ব্যবধান রচনা করে করে গেল নিবারণ ও হরসুন্দরার মধ্যে। "একদিন গভীর রাত্রে সমস্ত শহর যখন নিদ্রিত, নিবারণ ধীরে ধীরে হরসুন্দরীর নিভৃত শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল। নীরবে সেই পুরাতন নিয়মমতো সেই পুরাতন শয্যার দক্ষিণ অংশ গ্রহণ করিয়া শয়ন করিল। কিন্তু এবার সেই চির অধিকারের মধ্যে চোরের মতো প্রবেশ করিল। হরসুন্দরীও একটি কথা বলিল না, নিবারণও একটি কথা বলিল না। উহারা পূর্বে যেরূপ শয়ন করিত, এখনো সেইরূপ পাশাপাশি শুইল, কিন্তু ঠিক মাঝখানে একটি মৃত বালিকা শুইয়া রহিল, তাহাকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারিল না।" নগেন্দ্রনাথ ও সূর্য্যমুখীর ক্ষেত্রেও কি এইরূপ শয্যাকণ্টক ঘটে নাই। এবারে অন্যকথায় আসা যাক।

ভাষা প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উল্লেখ না করলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি অন্যায় করা হবে। সাধু ভাষার গদ্যে যখন তিনি বঙ্কিম প্রভাবিত এবং প্রভাব ক্রম ক্ষীয়মান ভাবে চোখের বালি নৌকাডুবি পর্যন্ত চলে এসেছে—ঠিক তখনই সমান্তরালভাবে তিনি লিখেছেন কথ্যভাষার গদ্য। য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারী ও ছিন্নপত্রাবলী। এসব গ্রন্থের গদ্যরীতি তাঁর সম্পূর্ণ স্বকীয় ও বঙ্কিম প্রভাব বিরহিত। তার কারণ এ পথে বঙ্কিম চলেন নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বকীয় রীতিতে নিঃসংশয়ভাবে পৌঁছে দেন গোরা ও জীবনস্মৃতিতে। তারপর থেকে সাধুভাষা আর বড় ব্যবহার করেন নি, মাঝখানে ব্যতিক্রম

চতুরঙ্গ ও গল্প সপ্তকের প্রথম কয়েকটি গল্পে। (হালদার গোষ্ঠী, হৈমন্তী, বোষ্টমী)। বোধ হয় তিনি মনে করেছিলেন সাধুভাষার সবগুলি স্বর সাধা হয়ে গিয়েছে; এখন নূতন স্বর সাধবার প্রয়োজন। এই নূতন স্বর বিচিত্রতানে শেষপর্যন্ত চলেছে। পরবর্তী প্রজন্মের লেখকগণ এই ভাবে স্বর সেধেছেন, ভালো করেছেন কি মন্দ করেছেন সে বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে। এখানে মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে গোরার গদ্যরীতি আত্মসমাপ্ত নয়, শরৎচন্দ্রের সর্বজন রম্য ভাষারীতির প্রতিষ্ঠা গোরার গদ্যের রীতির উপরে, শরৎচন্দ্র কোথাও স্বীকার করেছেন যে গোরা অন্ততঃ পঞ্চাশ বার পড়েছেন, সে পড়া ব্যর্থ হয়নি। আমার বিশ্বাস প্রমথ চৌধুরীর কথ্য রীতিরও ভিত্তি গোরার ভাষা। গোরার যথাসাধ্য নিরলঙ্কার, পেশীবহুল ভাষার দার্ঢ্য উপেক্ষা করা কঠিন। প্রমথ চৌধুরীর প্রথম কয়েকটি সাধু ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ ছাড়া সমস্তই কথ্যভাষা। ক্রিয়াপদের হ্রস্বতা বাদ দিলে তাঁর কথ্যভাষায় গোরার প্রভাব অনুভূত হয়। যে গদ্যরীতি অপর লেখককে প্ররোচিত করে তারই জন্ম সার্থক। সেদিক থেকে বিচার করলে বঙ্কিমের গদ্যরীতি সার্থক, গোরার গদ্যরীতি সার্থক, রবীন্দ্রনাথের কথ্যরীতি সার্থক, কিন্তু সবচেয়ে সার্থক বাংলা গদ্যের পিতামহ বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি, তিনি অলক্ষ্যে থেকে সকলের গদ্যকে প্রভাবিত করে চলেছেন—আজও। এখানে সমাপ্ত হ'ল বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য। এবারে নতন প্রসঙ্গ।

আমি একসময়ে লিখেছিলাম বঙ্কিমচন্দ্রের সন্ন্যাস রোগ আছে। ওটা কেবল কথার চাতুরী। বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক উপন্যাসে সন্ন্যাসী দেখা যায় অভিপ্রায় এই, তবে এটা রোগ নয়, স্বাস্থ্যের একটা লক্ষণ। দুর্গেশনন্দিনীতে অভিরাম স্বামী, মৃণালিনীতে মাধবাচার্য্য, রজনীতে হিন্দীভাষা সন্ন্যাসী বা অবধূত (নাম নাই) চন্দ্রশেখরে রামানন্দ স্বামী, যুগলাঙ্গুরীয়ে আনন্দস্বামী, দেবী-চৌধুরাণীতে ভবানী পাঠক, সীতারামে ফকির চাঁদ শাহ আর আনন্দমঠ তো আনন্দময়, তন্মধ্যে বিশেষ সত্যানন্দ ও মহাপুরুষ। সংখ্যা নিতান্ত কম নয়, তবে তারা সাধারণ মাপের গেরুয়াধারী, ভিক্ষান্নজীবি, সংসার বিমুখ, আধ্যাত্মিক উন্নতিপ্রয়াসী সন্ন্যাসী নন; সকলেই অসাধারণ, প্রত্যেকেরই একটা মিশন আছে সংক্ষেপে সে মিশন দেশ ও মানবের কল্যাণ চেষ্টা। তবে বিস্ময়ের এই

যে তাদের কারো পূর্বাপর জানা যায় না। লেখক জানান নি, একেবারে পূর্ণব্রতীরূপে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করেছেন। তাঁরা কাহিনীর ভূষণ নন, কাহিনীর অঙ্গ, তাঁদের বাদ দিলে কাহিনীর অঙ্গ হানি হয়। এই সব সন্ন্যাসীদের জন্য লেখককে অনেক অভিযোগ শুনতে হয়েছে, তিনি রোমান্টিক, বাস্তববিমুখ, মধ্যযুগীয়, জ্যোতিষ, স্বপ্ন ও অলৌকিক পন্থায় বিশ্বাসী আর এই সব উপায় অবলম্বন করে কাহিনীর উপসংহারে (তাঁদের মতে সংহারে) সহজ সিদ্ধিলাভ করেছেন। এই সব অভিযোগ প্রমাণ করে যে সমালোচকের যথার্থ কাজ যে লেখকের উদ্দেশ্যকে আবিষ্কার, লেখকের উপরে নিজেদের ভালোমন্দ লাগাকে আরোপ করা নয়। সমালোচক হচ্ছে সাহিত্যের কলম্বাস। এখন দেখা যাক রবীন্দ্রনাথে অনুরূপ কিছু আছে কিনা।

রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকে এক শ্রেণীর মুক্তপুরুষ, পূর্বাপরহীন, উদাসীন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের সাধারণ নাম ঠাকুর্দা বা দাদাঠাকুর। শারদোৎসব, রাজা ও অচলায়তনে তিনি ঠাকুর্দা। ডাকঘরে ফকির, প্রায়শ্চিত্তে ও মুক্তধারায় ধনঞ্জয় বৈরাগী আর ফাল্গুনীতে অন্ধবাউল। বঙ্কিমচন্দ্রের সন্ন্যাসির ন্যায় এঁরাও কাহিনীর মধ্যে অবান্তর বা প্রক্ষিপ্ত নন, কাহিনীর প্রয়োজনেই তাঁরা উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছেন। এই আত্মভোলা উদাসীন, ব্যক্তিদের আত্মপ্রকাশ গানে নাচে ও আনন্দে, কিন্তু প্রয়োজনস্থলে কর্মী ও যোদ্ধরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, প্রমাণ অচলায়তন ও রাজার ঠাকুর্দা। আবার বঙ্কিমচন্দ্রের সন্ন্যাসিরাও প্রয়োজনবোধে কর্মী, প্রমাণ দেবী চৌধুরাণীর ভবানী পাঠক, আনন্দমঠের সন্ন্যাসী এবং চন্দ্রশেখরের রমানন্দ স্বামী। প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া এইসব নাটকে বিশেষ দেশকালের দ্বারা চিহ্নিত নয়—তাই তাঁদের ব্যক্তিগত নাম ও পরিচয় অনাবশ্যক। কিভাবে কোন সাধনার বলে সদানন্দময় অবস্থায় তাঁরা উপনীত হলেন কবি জানানো প্রয়োজনবোধ করেন নি, বঙ্কিমের সন্ন্যাসীদের মতো একেবারে পূর্ণব্রতীরূপে সম্মুখে এনে উপস্থিত করেছেন। প্রায়শ্চিত্ত নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগীর পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে কিছু জানা যায় বটে, তবে মুক্তধারায় তিনি সম্পূর্ণ বিমুক্ত। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে এরকম ব্যক্তি একটি মাত্র আছে বিল্বণ ঠাকুর আর তিনি যে বঙ্কিম প্রণোদিত তা আগেই বলেছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক ঋণ আলোচনা প্রসঙ্গে বিষয়টি সহজেই এসে পড়ে, তবে রূপভেদের কারণ শিল্প দাবীর ভেদ। রবীন্দ্রনাথ যদি

দেশকালের দ্বারা চিহ্নিত নাটক লিখতেন তবে এই সব পাত্রকেও বিশেষ দেশকালের ভূষণ human habitation and name পরাতে হ'তো সংক্ষেপে ঠাকুর্দা বলে সেরে দেওয়া চলতো না। এরাও একটা বিশেষ মিশন নিয়ে অবতীর্ণ। তবে বঙ্কিমের সন্ন্যাসীদের ও রবীন্দ্রনাথের ঠাকুর্দা শ্রেণীর মিশন ঠিক এক নয়। প্রথমোক্ত দলের মিশন স্বাধীনতা, শেষোক্ত দলের মুক্তি। দেশের ক্ষেত্রে যা স্বাধীনতা, ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাই মুক্তি; বলাবাহুল্য দুয়েরই লক্ষ্য মানুষ, কখনো সমাজবদ্ধ, কখনো একক। বঙ্কিমচন্দ্রের সন্ন্যাসীরাই রবীন্দ্রনাথের ঠাকুর্দা শ্রেণীয়। ঐ সন্ন্যাসীদের না পেলে এই ঠাকুর্দাদের পেতাম কিনা সন্দেহ। অতএব এক্ষেত্রে খুব সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্র উত্তমর্ণ। এবারে অপর প্রসঙ্গ।

বঙ্কিমচন্দ্র ওরবীন্দ্রনাথের রচনাসমূহে কয়েকটি স্থলে ঘটনায় ওভাবনায়আশ্চর্য্য রূপ মিল দেখা যায়। বলা বাহুল্য বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, পরবর্তীকালে লিখবার সময়ে ঐ মিলগুলি সচেতনভাবে অথবা অবচেতনভাবে তাঁর কলমের মুখে বের হয়েছে জানিনা, তবে মিল সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কারণ নেই। প্রথমে মৃণালিনী গ্রন্থখানি নেওয়া যাক। পশুপতি ধর্মাধিকার বা কমাণ্ডার ইন চিফ। তাঁর ভ্রান্তি ও লোভের ফলে বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক নবদ্বীপ বিজিত হয়েছে, পশুপতি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করলে রাজ প্রতিনিধি রূপে বঙ্গের শাসনভার পাবেন না বখতিয়ার খিলজির আদেশ, মহম্মদ আলির সৌজন্যে তিনি বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে যখন স্বগৃহে পৌঁছলেন তখন সেই সুবৃহৎ অট্টালিকা অগ্নিকুণ্ডে পরিণত, বিজয়ী সেনা অগ্নি সংযোগ করেছে, এই দৃশ্য দেখে উন্মাদের মতো সেই অনলের মধ্যে প্রবেশ করলেন, সেখানে মনোরমাকে বন্ধ করে রেখে গিয়েছিলেন আর আছে সেখানে গৃহদেবী স্বর্ণময়ী অষ্টভুজা মূর্তি। পশুপতি প্রথমে মনোরমার সন্ধান করলেন, কোথাও পেলেন না তাকে, সিদ্ধান্ত করলেন পুড়ে মারা গিয়েছে, তারপরে তাকালেন গৃহদেবতার দিকে, দেখলেন অগ্নিমধ্যে অদগ্ধা স্বর্ণপ্রতিমা। যে মনোরমাকে বিবাহ করবার আশায় রাজদ্রোহ, দেশদ্রোহ, ধর্মদ্রোহ, অন্যান্য নরনারী হত্যার কারণ হয়েছেন পশুপতির সেই মনোরমা ভস্মীভূত। তখন গৃহদেবতার উদ্দেশ্যে পশুপতি উন্মত্তের মতো বলতে শুরু করলেন—"মা! জগদম্বে! আর তোমাকে জগদম্বা বলিব না! আর তোমার পূজা করিব না। তোমাকে প্রণামও করিব না। অশৈশব কায়মনোবাক্যে তোমার সেবা করিলাম, ঐ পদধ্যান্ ইহজন্মে সার

করিয়াছিলাম, এখন মা, একদিনের পাপে সর্বস্ব হারাইলাম। তবে কি জন্য তোমার পূজা করিয়াছিলাম? কেনই বা তুমি আমার পাপমতি অপনীত না করিলে? মন্দির দহন অগ্নি অধিকতর গর্জিয়া উঠিল। পশুপতি তথাপি প্রতিমা সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—ঐ দেখো ধাতুমূর্তি! তুমি ধাতুমূর্তি মাত্র, দেবী নহ, ঐ দেখ অগ্নি গর্জিতেছে! যে পথে আমার প্রাণাধিকা গিয়াছে, সেই পথে অগ্নি তোমাকেও প্রেরণ করিবে। কিন্তু আমি অগ্নিকে ঐ কীর্তি রাখিতে দিব না, আমি তোমাকে স্থাপনা করিয়াছিলাম—আমিই তোমাকে বিসর্জন করিব। চলো! ইষ্টদেবী! তোমাকে গঙ্গার জলে বিসর্জন করিব।"

পশুপতির কর্ম ও উক্তির সঙ্গে বিসর্জন নাটকের রঘুপতির কর্ম ও উক্তির তুলনা করা যাক। পশুপতির তুলনায় রঘুপতির পাপ অনেক লঘু, তৎসত্ত্বেও ঐ লঘুকে অতীব গুরুতর মনে হয়ে তার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়েছে। জয়সিংহের আত্মরক্তদানের পরে নিত্য পূজিতা মহিমময়ী কালীমূর্তিকে লক্ষ্য করে রঘুপতি বলেছে—

"দেখো দেখো, কী ক'রে দাঁড়ায়ে আছে, জড়
পাষাণের স্তূপ, মূঢ় নির্বোধের মতো।
মূক পশু অন্ধ ও বধির! তোরি কাছে
সমস্ত ব্যথিত বিশ্ব কাঁদিয়া মরিছে!
পাষাণ চরণে তোর, মহৎ হৃদয়
আপনারে ভাঙিছে আছাড়ি!

থাক তুই চিরকাল
এই মতো—এই মন্দিরের সিংহাসনে,
সরল ভক্তির প্রতি গুপ্ত উপহাস!
দিব তোর পূজা প্রতিদিন, পদতলে
করিব প্রণাম, দয়াময়ী মা বলিয়া
ডাকিব তোমারে। তোর পরিচয় কারো
কাছে নাহি প্রকাশিব। শুধু ফিরায়ে দে
মোর জয়সিংহে। কার কাছে কাঁদিতেছি
তবে দূর দূর দূর দূর করে দাও
হৃদয় দলনী পাষাণীরে, লঘু হোক
জগতের বক্ষ।"

[ দূরে গোমতীর জলে প্রতিমা বিসর্জন ]

এখন পশুপতি ও রঘুপতির কার্য্য ও উক্তির মিল কাকতালীয়, সচেতন কিম্বা অবচেতনের ইঙ্গিত জাত পাঠকের বিচার্য্য। আমার নিজের ধারণা ঘটনার ঐক্য অবচেতন লোক থেকে ভাবনার ও স্থানে স্থানে ভাষার ঐক্যকে টেনে বের করে এনেছে। অনুরূপ কারণের অনুরূপ কার্য্য। এবারে আর একটি মিলের বিচার করা যাক, এবারে ঘটনা নয়, ভাবনা।

রবীন্দ্রনাথের পত্রপুটস্থ পৃথিবী কবিতা সুপরিচিত। এই পৃথিবী একাধারে মধুর ও ভীষণ, ভীষণ মধুরতাতেই তার বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর উপন্যাসে একস্থানে এই ভাবটি বিরাজমান। এই অংশ উদ্ধার করে পরে আমার বক্তব্য বলবো ইচ্ছা রইলো।

"তুমি জড় প্রকৃতি! তোমায় কোটি কোটি প্রণাম! তোমার দয়া নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই,—জীবের প্রাণনাশে সঙ্কোচ নাই, তুমি অশেষ ক্লেশের জননী—অথচ তোমা হইতে সব পাইতেছি—তুমি সর্বসুখের আকর, সর্বমঙ্গলময়ী, সর্বার্থসাধিকা, সর্বকামনাপূর্ণকারিণী, সর্বাঙ্গসুন্দরী! তোমারে নমস্কার। হে মহাভয়ঙ্করী নানারূপরঙ্গিণি! কালি তুমি ললাটে চাঁদের টিপ পরিয়া, মস্তকে নক্ষত্রকিরীট ধরিয়া, ভুবন-মোহন হাসি হাসিয়া, ভুবন মোহিয়াছ। গঙ্গার ক্ষুদ্রোর্ম্মিতে পুষ্পমালা গাঁথিয়া পুষ্পে পুষ্পে চন্দ্র ঝুলাইয়াছ; সৈকত বালুকায় কত কোটি কোটি হীরক জ্বালিয়াছ; গঙ্গার হৃদয়ে নীলিমা ঢালিয়া দিয়া, তাতে কত সুখে যুবক যুবতীকে ভাসাইয়াছিলে! যেন কত আদর জান—কত আদর করিয়াছিলে। আজ এ কি? তুমি অবিশ্বাসযোগ্যা, সর্বনাশিনী। কেন জীব লইয়া ক্রীড়া কর, তাহা জানি না– তোমার বুদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই, চেতনা নাই—কিন্তু তুমি সর্বময়ী, সর্বকর্ত্রী, সর্বনাশিনী এবং সর্বশক্তিময়ী। তুমি ঐশী মায়া, তুমি ঈশ্বরের কীর্ত্তি, তুমিই অজেয়। তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম।"

মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন পৃথিবী, বঙ্কিমচন্দ্রে তাই প্রকৃতি, আরও মনে রাখবার রবীন্দ্রনাথ লিখছেন কবিতা, বঙ্কিমচন্দ্র গদ্য; রবীন্দ্রনাথের রচনাটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা অংশ বিশেষ বৃহৎ এক উপন্যাসের। এই পার্থক্য মেনে নিলে দেখা যাবে যে পৃথিবী, যা বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষুদ্রাংশ, দুয়ে অমিল নাই; পৃথিবীপ্রকৃতির দ্বৈতরূপে দুজনেই মোহিত অভিভূত বিচলিতকল্পনা,

তাই বিস্ময়ের শেষ চিহ্নরূপে দু'জনে বারম্বার প্রণতি করেছেন তাকে। দু'জনেই কবি, একজন গদ্যে, অন্যজন গদ্য কবিতায়। একজন গদ্যকে টেনে তুলেছেন পদ্যের অন্তরীক্ষে আর একজন পদ্যের অন্তরীক্ষকে টেনে নামিয়েছেন পৃথিবীর ধূলায়; গদ্য পদ্য এইভাবে হাত মিলিয়েছে। আবার জিজ্ঞাস্য এ মিল কি কাকতালীয়! না আর কিছু। আর কিছু যদি হয় বুঝতে হবে বহিরঙ্গনের অন্তরালে দুজনেরই মনঃ-প্রবাহিণী এক শিখর থেকে এক সঙ্গমগামিনী। তবে যে আমরা প্রভেদ দেখি সে আমাদের চোখের ভুল। এ মিল অবচেতনেও নয়, সচেতনও নয়, —এ মিল একচেতন। আর একটি অংশ।

অচলায়তন নাটকের শেষাংশ। শোণপাংশুর দল অচলায়তনের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেঙে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। মিলন হয়েছে দর্ভক পল্লীতে আচার্য্য আর গুরুতে। গুরু নূতন আচার্য্য নিযুক্ত করলেন পঞ্চককে। তখন আচার্য্য জিজ্ঞাসা করলেন—"আর এই চির অপরাধীর কি বিধান করলে প্রভু।"

"দাদাঠাকুর! তোমাকে আর কাজ করতে হবে না আচার্য্য। তুমি আমার সঙ্গে এসো।

আচার্য্য। বাঁচালে প্রভু, আমাকে রক্ষা করলে। আমার সমস্ত চিত্ত শুকিয়ে পাথর হয়ে গেছে, আমাকে আমারই এই পাথরের বেড়া থেকে বের করে আনো। আমি কোন সম্পদ চাইনে আমাকে একটু রস দাও।

দাদাঠাকুর। ভাবনা নেই আচার্য্য, ভাবনা নেই, আনন্দের বর্ষা নেমে এসেছে—তার ঝর ঝর শব্দে মন নৃত্য করছে আমার।"

এবারে আনন্দমঠের শেষাংশ। আনন্দমঠের সন্তান ও অচলায়তনের শোণপাংশু মূলতঃ ভিন্ন নয়, দুদলই ভাঙবার মিশন নিয়ে এসেছে, একদিকে ভেঙে পড়েছে অচলায়তনের প্রাচীর, আর একদিকে ভেঙে পড়লো মুসলমান শাসনের অরাজকতার ভিত্তি। তখন হিমালয়াগত মহাপুরুষ (তিনি বাঙালী এমন বলেন নি লেখক; আনন্দমঠ শুধু বঙ্গদেশের নয়, সর্বভারতীয়; এমন কি তাকে সর্বমানবিক বললে অন্যায় হবে না; অরাজকতায় শাসন নাশন বিদ্রোহের ধ্বজাতুলে দেশে দেশে কালে কালে তারা দেখা দিয়েছে।) সত্যানন্দকে বল্‌লেন—"এক্ষণে আইস, জ্ঞানলাভ করিয়া স্বয়ং সকল কথা বুঝিতে পারিবে।"

"সত্যানন্দ। হে মহাত্মন্! আমি জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা রাখি না, জ্ঞানে আমার কাজ নাই, আমি যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছি, ইহাই পালন করিব। আশীর্বাদ

করুন আমার মাতৃভক্তি অচলা হউক।···এখানেই মাতৃপ্রতিমা সম্মুখে দেহত্যাগ করিব। মহাপুরুষ। অজ্ঞানে? চলো, জ্ঞান লাভ করিবে চলো। হিমালয় শিখরে মাতৃমন্দির আছে, সেইখান হইতে মাতৃমন্দির দেখাইব।

"এই বলিয়া মহাপুরুষ সত্যানন্দের হাত ধরিলেন ···কে কাহাকে ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে, ধর্ম আসিয়া কর্মকে ধরিয়াছে।"

অচলায়তনের আচার্য্য জ্ঞান লাভ করেছেন, তবে ভক্তির অভাবে তা নীরস। আর আনন্দমঠের সত্যানন্দ ভক্তিলাভ করেছেন জ্ঞানের অভাবে তা অপূর্ণ। একজনের ভক্তির (রবীন্দ্রনাথের ভাষায় রসের) প্রয়োজন, অপর জনের জ্ঞানের। ভক্তি দুই প্রকার, কর্মাত্মিকা ও জ্ঞানাত্মিকা। জ্ঞানাত্মিকা ভক্তিই শ্রেষ্ঠতর। আনন্দমঠের উপক্রমনিকায় জ্ঞানাত্মিকা ভক্তির কথাই বলা হয়েছে। এতক্ষণে আমাদের উপন্যাসের তুলনামূলক আলোচনা সমাপ্ত হ'ল, এবারে অন্যান্য রচনাব প্রসঙ্গ উত্থাপন করবো।

বঙ্কিমচন্দ্রের লোকরহস্যের নিবন্ধগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ কৌতুক ও লিপিকার কয়েকটি ব্যঙ্গ রচনার তুলনা করবার ইচ্ছা পাঠকের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। লোকরহস্যের নিবন্ধগুলি বঙ্গদর্শনের মাসিক খোরাক জোগাবার উদ্দেশ্যে লিখিত হয়, প্রথম সংস্করণের প্রকাশ ১৮৭৪ সালে। ব্যঙ্গ কৌতুকের প্রথম প্রকাশ ১৯০৭/০৮ সালে। একটির অনেক পরে অপরটি রচনা ও প্রকাশ, কাজেই পূর্ববর্তীর দ্বারা পরবর্তীর প্রভাবিত হওয়ার অবশ্যই সম্ভাবনা আছে। তার উপরে দু'ই একজাতীয় রচনা, একক্ষেত্রে ব্যঙ্গ। ব্যঙ্গ রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি উদ্ধারযোগ্য। "সামাজিক যে সকল দোষ, তাহাতে রহস্য লেখকের অধিকার সম্পূর্ণ। ব্যক্তি বিশেষের যে দোষ, তাহাতে রহস্য লেখকের কোন অধিকার নাই—কদাচিৎ অবস্থা বিশেষে অধিকার আছে; যথা ভ্রান্ত রাজপুরুষের ভ্রান্তি জনিত কার্য্যের প্রতি অথবা মূর্খ গ্রন্থকর্তার গ্রন্থের প্রতি, রহস্য প্রযুজ্য। এ গ্রন্থের সে-সকল উদ্দেশ্য নহে। এ গ্রন্থে শ্রেণী বিশেষ বা সাধারণ মন্তব্য ব্যতীত ব্যক্তি বিশেষের প্রতি কোন উক্তি নাই।"

লোকরহস্যের অধিকাংশ রচনাই এই সংজ্ঞা পূর্ণ করে, ব্যঙ্গ কৌতুকে কদাচিৎ। দু'য়ে মিলের চেয়ে অমিলটাই বেশি। তবে একথা স্বীকার না করে উপায় নাই যে লোকরহস্য প্রকাশিত না হলে ব্যঙ্গ কৌতুক লিখিত হতো কিনা সন্দেহ। তবে একথাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে ব্যঙ্গ কৌতুকের সমস্ত রচনা

বঙ্কিমচন্দ্রের সংজ্ঞানুসারী নয়। ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল ও সুবর্ণ গোলকের মধ্যে ব্যঙ্গের যে সর্বব্যাপিতা আছে ব্যঙ্গ কৌতুকের ২/৩টি মাত্র রচনায় তা দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ ডেঞ্জে পিপড়ের মন্তব্য, লেখার নমুনা, সারবান সাহিত্য, পয়সার লাঞ্ছনার নাম করা যায়। এই সব রচনায় কশাঘাতের সর্বব্যাপিতা লক্ষণীয়। আর সেই সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় লিপিকাগ্রন্থের তোতাকাহিনীর। যাতে ব্যয়বহুল শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি ব্যঙ্গ; এ ব্যঙ্গ সর্বব্যাপী—অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বিশেষ বা প্রতিষ্ঠান বিশেষ সম্বন্ধে মাত্র প্রযোজ্য নয়। ব্যঙ্গ কৌতুকের নূতন অবতার, অরসিদের স্বর্গপ্রাপ্তি, স্বর্গীয় প্রহসন প্রভৃতিতে চাবুকের চতুর আঘাত, কিন্তু সে আঘাত কারো পিঠে পড়ে না, না অশ্বের না মানুষের, বাতাসে আঘাত করে সপ সপ শব্দ করে মাত্র। তুলনায় ইংরাজ স্তোত্র, বাবু, গর্দভ বঙ্কিমচন্দ্র কথিত সংজ্ঞার পূর্ণ উদাহরণের স্থল, চাবুকের প্রত্যেকটি আঘাত শ্রেণী বিশেষের পিঠে দাগ রেখে যায়। রামায়ণের সমালোচনা ও কোন স্পেশিয়ালের পত্র এক শ্রেণীর পণ্ডিতম্মন্যের প্রতি নিদারুণ কশাঘাত। আর Bransonism মূলে ইলবার্ট বিলের সমালোচনার্থ লিখিত হলেও মৌলিক উদ্দেশ্যকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েছে। সে বিষয় নেই, সে বিজয়ী ও বিজিতের শ্রেণীভেদ নেই, তৎসত্ত্বেও "এখন তাঁরা অন্য নামে আছেন মর্ত্যলোকে।" ব্যঙ্গ রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রগামী, রবীন্দ্রনাথ অনুগামী, তবে অগ্রগতে ও অনুগতে প্রভেদ বিস্তর। রবীন্দ্রনাথের হাত জমিদারের হাত হলেও কশাঘাতে অভ্যস্ত নয়, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের হাত কশাঘাতে নিপুণ। আসল কথা ম্যাথু আর্ণল্ড যাকে 'application of ideas to life' বলেছেন, ব্যঙ্গ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উপরে বঙ্কিমচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই ঋণী, তবে ঋণের টাকায় ব্যবসা বিস্তার করেন নি। ব্যঙ্গ রচনায় যে নৈর্ব্যক্তিক নির্মমতা আবশ্যক রবীন্দ্রনাথ তাতে অভ্যস্ত নন। এবারে আর এক প্রকার রচনা নিয়ে তুলনা করা যাক।

বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রায় একক বঙ্গদর্শন পরিচালনা করতে হ'তো; উপন্যাস থেকে শুরু করে সমালোচনা, প্রবন্ধ ইত্যাদি তাঁর নিত্য নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি রচনায় নূতন ঢঙ ও বিষয়ের সৃষ্টি করে তাকে সাহায্য করতো। পাঠকে এক হাতের লেখা, সে সব যতই সমৃদ্ধ হোক না কেন পছন্দ করে না। তবু রচনায় নূতন ঢঙ হ'লে এক রকম করে মেনে নেয়। এই নূতনত্বের

দাবীর খাতিরে পত্র সাহিত্যের অবতারণা করলেন বঙ্কিমচন্দ্র। হঠাৎ একটা প্রবন্ধ বের হ'লো 'প্রাচীনা এবং নবীনা।' এই পত্রের প্রাচীনা ও নবীনা নারীগণের তুলনায় আলোচনা করে লেখক প্রাচীনাগণের দিকে রায় দিলেন। অমনি প্রতিবাদে তিনখানি "কৃত্রিম" পত্র প্রকাশিত হ'ল, লেখিকা শ্রীচণ্ডিকা সুন্দরী দেবী, শ্রীলক্ষ্মী মণি ও শ্রীরসময়ী দাসী। তিনজনেই তিনদিক থেকে আক্রমণ ক'রে মূল লেখককে বিব্রত ক'রে তুলেছেন, তুলনায় নবীনাদের দোষের দায়িত্ব পুরুষদের উপরে চাপিয়েছেন। বাদ প্রতিবাদে বঙ্গদর্শনের আসর বেশ জমে উঠেছে। বলা বাহুল্য মূল প্রবন্ধ ও 'কৃত্রিম' পত্র তিনখানি সমস্তই বঙ্কিমচন্দ্র রচিত। এই বাদ-প্রতিবাদ মূলক পত্রসাহিত্যের আদর্শে রবীন্দ্রনাথের চিঠি পত্রের সৃষ্টি ; বর্তমানে এই রচনাগুলি সমাজ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এখানে পত্র লেখক দাদামহাশয় ও নাতি। দাদামহাশয় স্বভাবতই তাঁদের সেকালের তুলনায় নাতির একালের দোষগুণের সমালোচনা করেছেন, দোষের পাল্লাটাই ভারী। নাতিও ছাড়েনি, সেকালের দোষ দেখিয়ে একালের সমর্থন করেছে। এখানে আলোচ্য বিষয় সামাজিক অবস্থা, বঙ্কিমচন্দ্রে আলোচ্য বিষয় সমাজে স্ত্রীপুরুষের স্থান ও অবস্থা। কার রচনার গুরুত্ব ও মূল্য বেশী সে বিষয়ে আলোচনা এখানে উদ্দেশ্য না, উদ্দেশ্য এই যে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক ঋণের আর একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন। এবারে আলোচ্য আর এক রকম ঋণের নিদর্শন।

বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জীবনে গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। পদ্য রচনাগুলির আলোচনা করবার ইচ্ছা বা প্রয়োজন আমাদের নাই। পদ্যাংশে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে রবীন্দ্রনাথ আদৌ ঋণী নন। কিন্তু এই গদ্য পদ্য গ্রন্থে তিনটি গদ্য রচনা আছে। এই তিনটি রচনায় আমাদের আবশ্যক। এগুলি কেন পদ্য গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হ'ল আগে সে বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য শোনা যাক। এই গ্রন্থের বিজ্ঞাপন নামে ভূমিকায় তিনি লিখেছেন— "কবিতা পুস্তকের ভিতর তিনটি গদ্য প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। কেন হইল, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি ভালো করিয়া বুঝাইতে পারিব না। তবে, এক্ষণে এ রীতি প্রচলিত আছে যে কবিতা পদ্যেই লিখিত হইবে, তাহা সঙ্গত কি না, আমার সন্দেহ আছে। ভরসা করি, অনেকেই জানেন যে, কেবল পদ্যই কাব্য নহে। আমার বিশ্বাস আছে যে, অনেক স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য

কাব্যের উপযোগী। বিষয় বিশেষে পদ্য কাব্যের উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু অনেক স্থানে গদ্যের ব্যবহারই ভালো। যে স্থানে ভাষা ভাবের গৌরবে আপনি ছন্দে বিন্যস্ত হইতে চাহে, কেবল সেই স্থানেই পদ্য ব্যবহার্য্য।···· কাব্যের গদ্যের উপযোগিতার উদাহরণ স্বরূপ তিনটি গদ্য কবিতা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিলাম। অনেকে বলিবেন এই গদ্যে কোন কবিত্ব নাই। সে কথায় আমার আপত্তি নাই। আমার উত্তর যে এই গদ্য যেরূপ কবিত্বশূন্য, আমার পদ্যও তদ্রূপ। অতএব তুলনায় কোন ব্যাঘাত হইবে না।"

নানাকারণে বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্য অত্যন্ত গভীরভাবে গ্রহণ করা উচিত। প্রথম কারণ স্থান বিশেষে এবং বিষয় বিশেষে গদ্য পদ্যের একত্ব। দ্বিতীয় কারণ ভাবের টানে পদ্যের অপরিহার্য্যতা। তৃতীয় ও প্রধান কারণ এই তিনটি গদ্য রচনা সম্বন্ধে 'গদ্য কবিতা' শব্দের প্রয়োগ। পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের নিমিত্ত গদ্য কবিতা শব্দটি নিম্নরেখ করে দিয়েছি। অবশেষে বিনয় সহকারে তিনি বলেছেন যে "এই গদ্য যেরূপ কবিত্বশূন্য, আমার পদ্যও তদ্রূপ।" বলা বাহুল্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের গদ্য আদৌ কবিত্বশূন্য নয়, আর এইগদ্য তিনটিও তা-ই।

অনেকের ধারণা ছিল ( আমার নিজেরও ছিল ) যে গদ্যকবিতা শব্দটি, তার প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য এবং তার উদ্ভবের বিশেষ কারণ রবীন্দ্রনাথ প্রথম ব্যবহার ও নির্ণয় করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যে সেই ধারণার নিরসন হওয়া উচিত। গদ্য কবিতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য আরও সূক্ষ্মভাবে, আরও বিস্তারিতভাবে ভাষান্তরে রবীন্দ্রনাথ অনেকবার ব্যক্ত করেছেন, বিশেষ ভাবে লিপিকা ও গদ্যকবিতা গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাসঙ্গিক রচনা তিনটির নাম মেঘ, বৃষ্টি ও খদ্যোৎ। এগুলির সঙ্গে তুলনীয় লিপিকার প্রথম দিকের কয়েকটি রচনা, যথা, পায়ে চলার পথ, মেঘলা দিনে, বাণী, মেঘদূত, বাঁশি, সন্ধ্যা ও প্রভাত। মনে রাখতে হবে লিপিকা গ্রন্থে অনেক ধাঁচের রচনা আছে, লিরিক, গল্পাশ্রিত রচনা, রূপক, মায় স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গাত্মক রচনা। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা তিনটি লিরিক জাতীয়। অনেকে বলতে পারেন বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জীবনে প্রকাশিত ঐ গৌণ পুস্তকখানির রচনা তিনটি আর বিজ্ঞাপনে লিখিত মন্তব্য যে রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন তার প্রমাণ কি? লিখিত প্রমাণ অবশ্যই নাই, অন্ততঃ আমার চোখে পড়েনি। তবে মনে রাখতে

হবে তখনকার দিনে বাংলা বইয়ের সংখ্যা সীমাবদ্ধ ছিল, আর তাছাড়া আরও মনে রাখতে হবে বইখানা তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের যাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। এমনক্ষেত্রে ধরে নেওয়া উচিত যে বইখানা রবীন্দ্রনাথের নজরে পড়েছিল। তখনো সাহিত্যিকগণ কর্তৃক অপরের বই না পড়বার প্রথা প্রচলিত হয় নি। অনেক জাতীয় ঋণের সঙ্গে এ ঋণটাও যদি রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করে থাকেন তাতে তাঁর মহিমা এতটুকু ক্ষুন্ন হয় না। বড় দরের সাহিত্যিকরা শুচিবায়ুগ্রস্ত নন, অপর সাহিত্যিকের প্রভাব এড়িয়ে চলবার চেষ্টায় শক্তির অপব্যয় তাঁরা করেন না। এমনকি শক্তিতে ন্যূন সাহিত্যিকের প্রভাবকেও তাঁরা অস্বীকার করেন না। উদাহরণ, বায়রণ প্রভাবিত গ্যেটে। গ্যেটে তবু গ্যেটে। যমুনা নদীতে এসে পড়েছে গঙ্গা—তবু নদীটার নাম যমুনা না হয়ে গঙ্গা হয়ে গিয়েছে। বঙ্কিম বিচারে কুণ্ঠিত ভাবে কথা বলবার প্রয়োজন নেই, সেখানে তিনি বড় একেবারে অতুলনীয়। তবে সর্বাঙ্গীণ বিচারে রবীন্দ্রনাথের স্থান উপরে।

আগে বলেছি, আবার মনে করিয়ে দিলে অন্যায় হবে না, যে এখানে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রচনার দোষ গুণ, পূর্ণতা বা ন্যূনতা সম্বন্ধে আলোচনা করছি না, আমাদের আলোচ্য বিষয় বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক ঋণ। ঋণী ব্যক্তি ন্যূন বলেই ঋণী, তবে কালাত্যয়ে সে যে কখনো ধনী হয়ে উঠবে না, ঋণদাতার চেয়ে অধিকতর ধনী হবে না এমন কোন নিয়ম নাই। এতক্ষণ আমরা ঋণের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছি; ভাষারীতিতে, কাহিনী বিন্যাসে, পাত্রপাত্রীর চরিত্রগঠন কৌশলে, কাহিনীর অন্তর্গত ঘটনাংশে, ভাবনায়, এবং অবশেষে গদ্যকবিতা নামাঙ্কিত রচনায় ও তার প্রকৃতি নির্ণয়ে। আশা করি কোন পাঠক মনে করবেন না যে রবীন্দ্রনাথের হীনতাপাদন আমাদের উদ্দেশ্য। প্রথম বয়সে অনেক লেখক পূর্ববর্তীর কাছে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হন, রবীন্দ্রনাথ করেছেন, তবে তাঁর কৃতিত্ব উত্তমর্ণ নির্বাচনে। আজকার দিনে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের কাছে কে ঋণী নয়? অনেকের হাতে ঋণের টাকা মুনাফায় পরিণত হ'য়েছে, আবার অনেকে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়েছে, আর তারাই সবচেয়ে বাহাদুর উত্তমর্ণকে গালাগালি দিয়ে এবং তার চেয়েও অনেক বেশী ধনী আছে ঘোষণা করছে, এমন ক্ষেত্রে ঋণ শোধের কথা আর ওঠে কি করে? এই শেষোক্ত ভাবটাকেই বোধ করি সংস্কৃত ভাষায় কৃতঘ্নতা বলা হয়।

সাহিত্যিক রচনা দুই পর্য্যায়ের, সৃষ্টি ও বিচার, বিদেশী আলঙ্কারিকদের পরিভাষায় creative criticism ; সমগ্র সাহিত্যকে যেমন করেই ভাগ করা যাক না কেন এই দুই পর্য্যায়ের একটা না একটাতে পড়বেই। তবে এই দুই পর্য্যায় যে সব সময়ে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলে এমন নয়, বিচার সাহিত্য রচনার গুণে কখনো কখনো সৃষ্টি কার্য্যে পরিণত হয়, যথা বঙ্কিমচন্দ্রের "কোন স্পেশিয়ালের পত্র" কিম্বা "রামায়ণের সমালোচনা, কোন বিলাতী সমালোচক প্রণীত।" আবার রবীন্দ্রনাথের কাব্যের উপেক্ষিতা মেঘদূত এবং সমগ্র পঞ্চভূত আসলে বিচারমূলক সাহিত্য হলেও সৃষ্টি কার্য্যে পরিণত হয়েছে। আবার উল্টো উদাহরণও বিরল নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তর অপূর্ব সৃষ্টি কুশলতা সত্ত্বেও অনেক স্থলে বিচারকার্য্যের গুণ সম্পন্ন, রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ উপন্যাস-খানিও তাই। এতকথা বলবার উদ্দেশ্য হ'ল সাহিত্যে সৃষ্টি ও বিচার প্রায়শ মিলে মিশে যায়, Imagination ও Intellect-এর মধ্যে ভেদ দুর্ভেদ্য নয়। তাই যদিচ এতক্ষণ আমরা সাহিত্যে সৃষ্টি কার্য্যের তুলনা করেছি, কিন্তু বিচার কার্য্যকে সব সময়ে এড়িয়ে চলতে পারি নি। এবারে বিচার পর্য্যায়ে হস্তক্ষেপ করতে উদ্যত হচ্ছি, একই নিয়মে মাঝে মাঝে সৃষ্টি কার্য্যের প্রভাব এসে পড়বে। এখানে অনেক স্থলেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম প্রভাবিত।

এই প্রসঙ্গে দুটি বিষয় মনে রাখা আবশ্যক। বঙ্কিমের মৃত্যুকালে রবীন্দ্রনাথের বয়স তেত্রিশ বছর ; আর দুর্গেশনন্দিনী থেকে বঙ্কিমের সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত ধরলে তার দৈর্ঘ্য উনত্রিশ বছরের বেশী নয়, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য জীবনের দৈর্ঘ্য ষাট বছরের উপর, বঙ্কিমের দু'গুণেরও বেশী। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের রচনার পরিমান বঙ্কিমের চেয়ে অনেক বেশী, সেই সঙ্গে ধরতে হবে বৈচিত্র্য। অবশ্য বঙ্কিমেও বৈচিত্র্য কম নয়, তবে যে নজরে পড়ে না তার কারণ পরিমাণগত স্বল্পতা।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বে মূলগত প্রভেদ নাই, যেটুকু প্রভেদ কেবল ভাষাগত। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা তুলনার অল্প সহজেই ধরা ছোঁয়া যায়, ধরা ছোঁয়া যে যায় তার প্রধান কারণ শুধু পরিমাণগত স্বল্পতা নয়, সেসব প্রায় সূত্রাকারে লিখিত। "বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদনে" বারোটি সূত্র আছে—এগুলিকে তাঁর নন্দনতত্ত্বের মূলকথা বলে মনে করলে অন্যায় হবেনা—আর এদের অতিরিক্ত আর কী বলবার থাকতে

পারে জানিনা। অন্যপক্ষে রবীন্দ্রনাথের ভূরি পরিমাণ রচনা, আর ভূরি পরিমাণ বলেই তাদের মধ্যে আত্মখণ্ডন, বৈপরিত্য পুনরুক্তি প্রভৃতি দোষ ’সে পড়েছে। ব্যক্তি বিশেষের রচনা বিশেষের প্রতিবাদে, ঘটনা বিশেষের প্রতিক্রিয়ায় তিনি যা লিখতে বাধ্য হয়েছেন অন্যত্র তার প্রতিবাদ করেছেন। গদ্য ছন্দের সমর্থনে যে-সব যুক্তি দিয়েছেন স্বলিখিত গদ্য কবিতায় অনায়াসে লঙ্ঘন করেছেন তাদের। শেষ অবধি এমন কথাও বলেছেন যে নিয়মিত ছন্দ বৃহৎ কাব্যের ভার বহনে অক্ষম। তাহলে রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড ওডীসি কিসের উপরে দণ্ডায়মান। আর তাঁর নিজের অসংখ্য ছন্দোবাহী কবিতারই বা নির্ভর কোথায়। “অনেক লেখায় অনেক পাতা কর”—এটি একটি প্রধান প্রমাণ। অন্যদিকে বঙ্কিম নন্দনতত্ত্ব সরল, ঋজু ও দ্বার্থহীন। প্রমাণ পূর্বোক্ত বারোটি সূত্র। এই ভাষাগত প্রভেদ সত্ত্বেও মূলগত মিল অত্যন্ত স্পষ্ট।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সাহিত্য শব্দের মূলে স+হিত শব্দ; রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্য শব্দের মূলে সহিত শব্দ। বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য সাহিত্যের উদ্দেশ্য সামাজিক হিতকরতা; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি সৌন্দর্য্যকে উপেক্ষা করেন নি। “যদি মনে এসব বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল-সাধন করতে পারেন অথবা সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করিতে পারেন তবে অবশ্য লিখিবেন।” (৩য় সূত্র) তবেই দেখা গেল সামাজিক মঙ্গলসাধন বা সৌন্দর্য্যসৃষ্টি সাহিত্যের আদর্শ হওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন “সুন্দরের পদপীঠ তলে যেখানে কল্যাণ দীপ জ্বলে।” একজনের মঙ্গল ও সৌন্দর্য্য, অন্যজনের সৌন্দর্য্য ও কল্যাণ প্রভেদ কতটুকু! শুধু শব্দগত নয় কি! তবে হয়তো বঙ্কিমের ঝোঁকটা হিতের প্রতি, রবীন্দ্রনাথের সুন্দরের প্রতি। হয়তো বা নয়। এত মিল যেখানে একজন অপরের দ্বারা প্রভাবিত কল্পনা করা অন্যায় নয়।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচনাকে চার ভাগে বিভক্ত করা যায়, প্রথম ও প্রধান নন্দনতত্ত্ব, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে মিলিয়ে যার ব্যাখ্যা করেছি। বাকি রইলো অন্য তিন প্রকার, আধুনিক সাহিত্য, প্রাচীন সাহিত্য, আর লোক সাহিত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের লোক সাহিত্য আমার চোখে পড়েনি, তবে প্রাচীন সাহিত্য আধুনিক সাহিত্য দেখেছি। বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেরই সাহিত্য সমালোচনার দুর্বলতম অংশ আধুনিক সাহিত্য কাজেই তার আলোচনায় লাভ নেই। বাকি থাকলো

প্রাচীন সাহিত্য। আগে বলেছি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বিষয়ক শ্রেষ্ঠ রচনা প্রাচীন সাহিত্য ও পঞ্চভূত, যেখানে নাকি বিচার কার্য্য সৃষ্টিকার্য্য হয়ে উঠেছে, বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ অংশ নন্দন তত্ত্ব, সেই সঙ্গে ধরা উচিত ঈশ্বরগুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব এবং সঞ্জীবচন্দ্র ও দীনবন্ধু সম্বন্ধে ঐ জাতীয় রচনা। তবে তিনের মধ্যে ঈশ্বরগুপ্ত সম্বন্ধীয় রচনাটিই শ্রেষ্ঠ। বর্তমান প্রসঙ্গে এ তিনের আলোচনাও বাদ দিলাম, কারণ রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ কিছু লেখেন নি, অনুরূপ কিছু লিখবার ক্ষমতা তাঁর ছিল মনে হয় না। কাজেই হাতে রইলো প্রাচীন সাহিত্য। দু'জনের রচনা থেকে প্রাচীন সাহিত্যের একটি প্রবন্ধ নিয়ে তুলনায় আলোচনা করা যাক।

বঙ্কিমচন্দ্রের শকুন্তলা, মিরান্দা এবং দেসদিমোনা ১৮৭৩ সালের বঙ্গদর্শনের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের শকুন্তলা প্রবন্ধের রচনা ১৯০২ সালে। মাঝখানে ব্যবধান সাতাশ বছরের। ইতিমধ্যে আর কেউ যদি শকুন্তলা নাটককে শেক্সপীয়রের টেম্পেষ্ট নাটকের সঙ্গে তুলনা করে প্রবন্ধ লিখে থাকেন তবে আমার জানা নেই। বঙ্কিমের প্রবন্ধে এই তুলনা আছে বটে, তাই আমার বিশ্বাস বঙ্কিমের প্রবন্ধের দূরাগত প্রতিবাদস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের শকুন্তলা প্রবন্ধ রচনা। মাঝখানে ব্যবধান সাতাশ বছরেব।

রবীন্দ্রনাথের নিগূঢ় চরিত্রের একটি ত্রুটি পরমত অসহিষ্ণুতা। এই ত্রুটির ফলে তার অনেক প্রবন্ধ শুধু দুর্বলভিত্তিক নয়, পাঠকের মনেও একটা প্রতিবাদ জাগায়। এই পরমত অহিষ্ণুতার কারণ পরমত সম্বন্ধে অশ্রদ্ধাজাত আংশিক অজ্ঞতা। গান্ধীজি বললেন 'নন কোঅপারেশন', কবি ধরে নিলেন সে নন-কোঅপারেশন পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞানে সঙ্গে। গান্ধীজি বললেন চরকা কাটো; কেন, কতক্ষণ জিজ্ঞাসা করবার অবকাশ হ'ল না কবির ; তিনি বললেন দেশশুদ্ধ লোক সারা দিন চরকা কাটলে মানুষের বিচিত্র শক্তির অপহ্নব ঘটে। বঙ্কিমের প্রবন্ধ প্রসঙ্গে ঠিক তেমনি ত্রুটিজাত বিপত্তি ঘটেছে। "শেক্সপীয়রের টেম্পেষ্ট নাটকের সঙ্গে কালিদাসের শকুন্তলার তুলনা সহজেই মনে হইতে পারে। ইহাদের বাহ্য সাদৃশ্য এবং আন্তরিক অনৈক্য আলোচনা করিয়া দেখিবার মতো।" যে প্রবন্ধ সাতাশ বছর আগে লিখিত রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যে মনে হয় তা যেন সদ্যজাত। আর যদিচ তিনি বলেছেন এদের ঐক্য ও অনৈক্য আলোচনা করে দেখবার মতো, আলোচনা করতে গেলে ধৈর্য্য ধারণ করে আগাগোড়া পড়তে

হয়। কিন্তু যেখানে সেই ধৈর্য্যের অভাব! আর আগাগোড়া যদি প্রবন্ধটি শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়তেন তবে খুব সম্ভব শকুন্তলা প্রবন্ধটি লিখবার প্রয়োজন হতো হতো না, কেননা দুজনের প্রবন্ধে মূলতঃ কোন প্রভেদ নেই। গ্যেটে যাকে বসন্তের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ যাকে পূর্ব শকুন্তলা ও উত্তর শকুন্তলা বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র তাকেই একই অর্থে মিরান্দা ও দেসদিমোনা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ গ্যেটের উক্তির ব্যাখ্যা ও ভাববিস্তার, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ এক সঙ্গে তিনটি নারী চরিত্রের এবং তিনখানি নাটকের আলোচনা। গ্যেটে কবিতা লিখেছেন ইঙ্গিতমাত্র দিয়েই তাঁর দায়িত্ব শেষ; রবীন্দ্রনাথ সেই কবিতাকে সমালোচনায় পরিণত করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনে মিলিয়ে রীতিমত আলোচনা করতে হয়েছে। গ্যেটের উক্তিতে রবীন্দ্রনাথের সুন্দর এবং বঙ্কিমের হিতকর মিলিত হয়েছে। পূর্ব শকুন্তলা সুন্দর, উত্তর শকুন্তলা হিতকর, মিরান্দা ও দেসদিমোনাও যথাক্রমে তাই। শকুন্তলা প্রবন্ধের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ যে পরমত অসহিষ্ণুতা দেখি শেষ পর্য্যন্ত তা আর থাকে নি, গ্যেটে, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ একই সিদ্ধান্তে মিলিত হয়েছেন। মিরান্দা, সুন্দরী, দেসদিমোনা কল্যাণী।

সাহিত্য সম্বন্ধে 'হিতকর' ও 'কল্যাণকর' শব্দ দুটি ব্যবহৃত। এখন সামাজিক বিধি নিষেধ সম্বন্ধে এই দুটি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। বিষয়টা সমুদ্রযাত্রা। সমুদ্রযাত্রা হিন্দু সমাজের পক্ষে গ্রাহ্য কিনা বিচারের বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই এ বিষয়ে মত প্রকাশ করেছেন, দুজনেই রায় দিয়েছেন সমুদ্র যাত্রার অনুকূলে। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য শাস্ত্র ও লোকাচার বিরুদ্ধ হলেও সমুদ্র যাত্রা যদি সমাজের পক্ষে হিতকর হয় তবে সমুদ্রযাত্রা বিধেয়। বঙ্কিমচন্দ্রও ঐ একই কথা বলেছেন তবে ভাষান্তরে এবং কিঞ্চিৎ ভাবান্তরে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—"আমি এইরূপ বুঝি ধর্মশাস্ত্রে যাহাই আছে তাহাই হিন্দুধর্ম নহে। হিন্দুধর্ম অতিশয় উদার। স্মার্ত্ত ঋষি দিগের হাতে, বিশেষতঃ আধুনিক স্মার্ত্ত রঘুনন্দনাদির হাতে, ইহা অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। স্মার্ত্ত ঋষিগণ হিন্দু-ধর্মের স্রষ্টা নহেন, হিন্দুধর্ম সনাতন, তাঁহাদিগের পূর্ব হইতেই আছে। অতএব সনাতন ধর্মে এবং এই ধর্মশাস্ত্রে বিরোধ অসম্ভব নহে। যেখানে এরূপ বিরোধ দেখিব, সেখানে সনাতন ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত। ধর্মে ও হিন্দুধর্মে কোন বিরোধ আমি স্বীকার করিতে পারি না। ধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের যদি কোন বিরোধ থাকে, তবে হিন্দুধর্মের গৌরব কি? উহাকে সনাতন ধর্ম বলিব

কেন ? এরূপ বিরোধ নাই। সমুদ্র যাত্রা লোক হিতকর বলিয়া ধর্মানুমোদিত। সুতরাং ধর্মশাস্ত্রে যাহাই থাকুক, সমুদ্র যাত্রা হিন্দু ধর্মানুমোদিত।”

এখানে দুজনেরই সিদ্ধান্ত এক, লোকহিতকর বিধায় সমুদ্রযাত্রা বিধেয়। তবে যুক্তি আলাদা। এই যুক্তি রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন কিনা এবং পরবর্তীকালে করতেন কিনা জানি না, তবে আমার বিশ্বাস রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের মতের পোষকতা করতেন। কিন্তু এখানে অর্থাৎ সমুদ্র যাত্রার বিষয়ে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কে কার দ্বারা প্রভাবিত। বঙ্কিমের বক্তব্য পত্রাকারে লিখিত বটে তবে ১৮৯২ সালের ২৭শে জুলাই হিতবাদী পত্রে প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটির রচনাকাল ১৮৯২ (১২৯৯), কোন্ মাস লিখিত নাই, ভারতী বা সাধনায় প্রকাশিত হয়ে থাকবে, নিশ্চয় করে জানিনা। এরকম ক্ষেত্রে একের দ্বারা অন্যের প্রভাবিত হওয়া সংশয়ের স্থল। তবে তৎকালীন বহু প্রচারিত পত্রিকার প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়া অসম্ভব নয়। আমার ধারণা পড়েছিল, অবশ্য সেটাকে প্রভাবের স্থল বলতে পারিনা, সমুদ্র-যাত্রার অনুকূলে সিদ্ধান্তের হাওয়া তখন ইংরাজি শিক্ষিত সমাজের মনে বহমান ছিল, তবে বঙ্কিমের যুক্তিগুলি নূতন এইজন্যেই সবিস্তারে উদ্ধার করতে হ’ল। সামাজিক হিতকরতার আর দুটি উদাহরণ দেবো বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদেশের কৃষক ও রবীন্দ্রনাথের রায়তের কথা নামে প্রবন্ধ দুটি হ’তে। দুজনেই প্রজার হিতকামী তবু কত প্রভেদ।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্যে, কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক, কি সাহিত্যিক অনেকস্থলেই পরমত অসহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এমন কি বললে অন্যায় হয় না যে এ সমস্তর অনেকগুলিই পরমত অসহিষ্ণুতার প্রতিক্রিয়া সঞ্জাত। কবির পক্ষে পরমত অসহিষ্ণুতা খুব ক্ষতিকর নয়, অনেক ক্ষেত্রেই লাভজনক। স্যাটায়ারের মূলে অনেক সময়ই পরমত অসহিষ্ণুতা, প্রমাণের স্থল বায়রণের English poets and Scotch Reviwers ও Donjuan এবং Pope এর Dunciad প্রভৃতি সমালোচকের পক্ষে এ পথ সর্বথা পরিত্যাজ্য। এমন একটি উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের রায়তের কথা। কোন ব্যক্তির রচনা বা উক্তিতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে প্রবন্ধটি লিখিত। ইউরোপের বলশেভিজম্, ফাসিজম্, ক্যাপিটালিজম্ এদেশের কংগ্রেস, চরখা, খদ্দর সকলের উপরে এলোপাথাড়ি লাঠি চালিয়ে গিয়েছেন। কোন প্রয়োজন ছিল না। তার মূল বক্তব্য সামান্য। জমিদারি

প্রথা অশ্রদ্ধেয়, কিন্তু জমিদারি কাকে ছেড়ে দেওয়া যায়? লাট খাজনার নীলাম করে দিলে হয় মহাজনের হাতে বা অন্য এক জমিদারের হাতে পড়বে, তাতে প্রজার দুঃখ বাড়বে বই কমবে না। রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত ষোল আনা সত্য। কিন্তু সে জন্য এমনভাবে রাজ্যশুদ্ধ লোকের উপরে লাঠি চালাবার প্রয়োজন ছিল না। বাংলার রায়তের সম্বন্ধে যতগুলি প্রবন্ধ আমার চোখে পড়েছে তন্মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদেশের কৃষক। কোথাও অসহিষ্ণুতা নাই, দিগ-ভ্রান্তি নাই, বহু অভিজ্ঞতা জাত তথ্যের উপরে সন্তর্পনে, পদক্ষেপ করতে করতে তিনি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তার মূল্য অপরিসীম। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে জমিদারের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না করে করা উচিত ছিল রায়তের সঙ্গে। তাহলে রায়ত জমির স্বত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে তার উন্নতি করতে পারতো, আর জমিদার কুল প্রজারক্ত পুষ্ট জলৌকার মতো স্থুলোদর হয়ে অকারণ ভূভার বৃদ্ধি করতো না। প্রবন্ধ দুটির মূল্য আজ ঐতিহাসিক মাত্র, কারণ জমিদারি প্রথা এখন লুপ্ত। তবে যে এ দুটির বিস্তারিত উল্লেখ করলাম বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের পার্থক্য প্রদর্শনের নিমিত্ত।

কংগ্রেস তথা রাজনীতি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মতে আশ্চর্য রকম মিল, তবে যেহেতু বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত রাজনৈতিক প্রবন্ধ ও উক্তি রবীন্দ্রনাথের পূর্বজ, কাজেই তাঁকে অধমর্ণ কল্পনা করা অন্যায় হবে না। সদ্যজাত কংগ্রেস মুষ্টিমেয় উচ্চ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটি বাৎসরিক অনুষ্ঠান মাত্র ছিল, তার ভাষা ছিল ইংরাজি, সভ্যগণের পোষাক ও আচরণ ইংরাজি ধরণের, তাদের চোখ ছিল ইংলণ্ডে ও শিমলা শৈলে কি প্রতিক্রিয়া ঘটে সেই দিকে, জনপ্রতিনিধিত্বের দাবী করবার অধিকার তাদের ছিল না, ইচ্ছা হয়তো ছিল। কিন্তু এইসব ঘোরতর মৌলিক ত্রুটি সত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন। কংগ্রেস ভক্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক বঙ্কিমচন্দ্রের কংগ্রেসে যোগদানের অনিচ্ছার কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন "আমি কি জন্য উহাতে এখন যোগ দিতে পারি না, তাহা বলিলে তুমি হয়তো ব্যথিত হইবে, এজন্য উহা না বলাই ভালো, তবে আমি এ পর্যন্ত বলিতে পারি যে আমি কংগ্রেসের বিপক্ষে, বা উহার অনিষ্টকারী নহি।" মন্ত্রী অভিষেক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে "কংগ্রেসের বিরোধী পক্ষে যোগ দিতে পারিব না।" বঙ্কিমচন্দ্র "আমাদের কংগ্রেস" বলে উল্লেখ করতেন, রবীন্দ্রনাথের সেই ভাব ছিল বলে মনে হয়, ভাষা

ছিল কিনা জানি না। কংগ্রেসের ত্রুটি জানা সত্ত্বেও তাঁরা কেন কংগ্রেস সমর্থক ছিলেন ? আর কিছুই নয়, তাঁরা বুঝেছিলেন এই বিচিত্র বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন দেশকে এক সূত্রে গেঁথে তুলবার চেষ্টায় নিযুক্ত কংগ্রেস, হয়তো বা অজ্ঞাতসারেই নিযুক্ত। এই মূল উদ্দেশ্যটি বাদ দিলে তখনকার কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ছিল, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন "আবেদন আর নিবেদনের থালা বয়ে বয়ে নত শির।" এই উক্তিটি রবীন্দ্রনাথের নামে চলছে বটে মৌলিকতার দাবী তাঁর নয়। রজনী গ্রন্থে অমরনাথের কথায় "আবেদন নিবেদন সমবেদন" শব্দগুলি পাশাপাশি আছে—আর রবীন্দ্রনাথ কথিত অর্থেই আছে। তবে এই কয়টি শব্দের উপরে বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক মৌলিকতার ভিত্তি নয় নানাসময়ে তাদের বিবরণ দেওয়া যাবে। কংগ্রেস প্রসঙ্গ অনুসরণ করে বঙ্কিমের মতের বিস্তার সাধন করা যাক, তার মধ্যেই পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথের অধমর্ণতার চিহ্ন।

পূর্বোক্ত ব্যক্তিটিকে কংগ্রেসের দুর্বলতার কারণ জ্ঞাপন উপলক্ষ্যে বঙ্কিম বলেছেন—"কংগ্রেসের প্রতি আমার সহানুভূতি নাই, একথা আমি কখনোই বলিতে পারি না, উহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ তদ্বিষয়ে কাহারো কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু যে প্রণালীতে উহার কার্য্য পরিচালিত হইতেছে তাহাতে আজ পর্য্যন্ত উহা সাধারণের যোগদানের উপযুক্ত হয় নাই। উহার সমস্ত আন্দোলন যেন ক্ষণস্থায়ী ও অন্তঃসারশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উহা এখনও সমস্ত দেশের লোকের সাধারণ সম্পত্তি হয় নাই। দেশের সাধারণ লোকদিগকে দূরে এবং অন্ধকারে রাখিয়া কতিপয় শিক্ষিত লোকের অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য সাধিত হইলে কখনই উহার গৌরব বর্ধিত হইবে না এবং দেশের লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত লোক কখনই উহার আবশ্যকতা ও মহত্ত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হইবে না। দেশের সাধারণ জনসমষ্টিকে মন্ত্রণাগৃহ হইতে দূরে রাখিয়া বৎসরান্তে একবার ক্ষণস্থায়ী আন্দোলনে প্রমত্ত হইলে তাহাতে দেশ জাগিবে না, যতদিন দেশের লক্ষ লক্ষ লোকদিগের জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত করিবার ব্যবস্থা না হইবে, যতদিন তাহারা তাহাদের প্রকৃত অভাব ও স্বদেশের প্রতি তাহাদের প্রকৃত অভাব ও স্বদেশের প্রতি তাহাদের কঠোর কর্তব্য বুঝিতে সক্ষম না হইবে, যতদিন ধর্মনীতি ও সমাজনীতি রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল ভিত্তি না হইবে ততদিন কেবলমাত্র নীরস রাজনৈতিক আন্দোলনে দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।·· আমার বিবেচনায় রাজনীতির সঙ্গে

সঙ্গে ধর্মনীতি ও সমাজনীতির আন্দোলন দেশ মধ্যে পরিব্যাপ্ত হওয়া উচিত। সর্বাগ্রে সকলের অধিক পরিমাণে সরলতা ও আত্মত্যাগ শিক্ষা করিতে যত্নবান হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।"

কংগ্রেসের পরিপূর্ণ আদর্শ সম্বন্ধে গান্ধীর আগে এর চেয়ে বেশি আর কে বলেছেন? রবীন্দ্রনাথ সমাজনীতি পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছেন, ধর্মও যে রাজনীতির অঙ্গীভূত হতে পারে, হওয়া উচিত বঙ্কিমচন্দ্র দিব্য চক্ষুতে এবং গান্ধী চর্মচক্ষুতে দর্শন করেছেন। আর পূর্বোক্ত অংশ থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কংগ্রেসের আলাপ আলোচনার ভাষা ইংরাজি হলে কাজ হবে না, প্রদেশে প্রাদেশিক ভাষাকে গ্রহণ করা উচিত। রবীন্দ্রনাথ নাটোর প্রাদেশিক কনফারেন্সে ইংরাজি অভিভাষণের বাংলা মৌখিক অনুবাদ করেছিলেন ১৮৯৭ সালে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তির সময় ১৮৮৮, বা কিছু পূর্বে কারণ অনুশীলন গ্রন্থ লিখবার উল্লেখ আছে এখানে। তারও আগে ১৮৭২ সালে বঙ্গদর্শন পত্র সূচনায় এই বিষয়টির উপরে বিশেষ জোর দিয়েছিলেন।

কংগ্রেস সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত এই অর্থে নূতন যে ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা আর তার পরে নয় বছর মাত্র তিনি জীবিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর এ অভিমত পুরাতন। বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশ কালে এর সূত্রপাত ধরলেও মৃণালিনী উপন্যাসে পূর্বাভাস আছে। কমলাকান্তের দপ্তরকেই তাঁর দেশাত্মবোধের উৎস বলে ধরা যাক। আমার মন, আমার দুর্গোৎসব, একটি গীত, বিড়াল, পলিটিকস্, বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব, বঙ্গদেশের কৃষক, এমন কি কমলাকান্তের জোবানবন্দীতেও দেশাত্মবোধের উষ্ণ অশ্রুধারা প্রবাহিত। আনন্দমঠ ও বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের আর উল্লেখ করলাম না, কেননা ও-সব সর্বজন বিদিত। সত্য কথা বলতে কি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় সর্বত্র দেশপ্রেমের অশ্রুকণা বিস্তারিত, দীর্ঘশ্বাস প্রবাহিত। কেবল ধর্মতত্ত্ব বা অনুশীলনের শেষতম গোটা দুই পংক্তি উদ্ধার করে এই প্রসঙ্গের সমাপন করবো।

"ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। এইজন্যে সর্বভূতে প্রীতি ভক্তির অন্তর্গত এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। সর্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম নাই। আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, পশুপ্রীতি, দয়া এই প্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্বদেশ প্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা উচিত।" তবেই দেখা গেল বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি

বিলাতি পেট্রাটিয়জম্ নয়, এ ভাব সর্বভূতে প্রীতির অংশ বিশেষ তবে অবস্থা বিবেচনার স্বদেশপ্রীতিই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। তাঁর স্বদেশপ্রীতি যেমন পেট্রটিয়জম নয়, তাঁর ধর্মও তেমনি বিলাতি রিলিয়জন নয়। বহুবার ব্যাখ্যাত এ অংশের পুনর্ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। কিন্তু প্রশ্ন এই যে এ সমস্তর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ কি, কোথায় তার অধমর্ণত্ব?

রবীন্দ্রনাথেরও স্বদেশপ্রীতি পেট্রটিয়জম নয়, রবীন্দ্রনাথেরও ধর্ম রিলিয়জন নয়। তবে তিনি স্বদেশপ্রীতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম হয়তো বলবেন না, তিনি আর এক ধাপ এগিয়ে বিশ্বপ্রীতিতে পৌছেছেন। কিন্তু বঙ্কিম কথিত সর্বভূতে প্রীতির নামান্তর কি বিশ্বপ্রীতি নয়।

আমরা কথা প্রায় শেষ করে এনেছি, কিন্তু এখনো যে বিষয়টি বাকি সেটাই সবচেয়ে গুরুতর। বঙ্কিমচন্দ্র যখন উচ্চারণ করেছিলেন "বাংলা সাহিত্য বাংলার ভরসা"—তখন তাঁর মতো ২/১ জনের অন্তরে মাত্র তার অপ্রশস্ত ভিত্তি ছিল। এই ভিত্তি যাতে প্রশস্ততর দৃঢ়তর হয় সেই উদ্দেশ্যে তাকে দুই হাতে অস্ত্র চালনা করতে হয়েছে, সে অস্ত্র কখনো লেখনী, কখনো শড়কি কখনো পরামর্শ কখনো ব্যঙ্গ। আনন্দের বিষয় তিনি নিজের জীবনকালেই এই ভিত্তিকে প্রশস্ত ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ দেখে গিয়েছেন, যার উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন ভাবীকালের রবীন্দ্রনাথ। এখানেও তিনি অধমর্ণ কারণ প্রতিষ্ঠান ভূমি স্থাপিত করে যাওয়ায় রবীন্দ্রনাথকে সেই প্রচেষ্টা করতে হয় নি, তার উপরে গাঁথুনি সুরু করতে পেরেছেন।

আমরা উপনিষদের কাছে, সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের কাছে রবীন্দ্রনাথের ঋণ স্বীকার সম্বন্ধে আলোচনা করেছি, কিন্তু ঘরের কাছে কিঞ্চিত্ পূর্বগামী বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে তিনি কত ভাবে কত প্রকারে ঋণী তার আলোচনা করতে মন দিইনি। আমার বক্তব্যের মধ্যে যদি কিছু সত্য থাকে তবে বুঝতে পারা যাবে যে একজন সাহিত্য মহারথীর পক্ষে আর একজন সাহিত্য মহারথীর কাছে এর বেশী ঋণী হওয়ার দৃষ্টান্ত একান্ত বিরল। কিন্তু এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বোধ করি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ দু'জনের কাছেই অপরাধ করলাম। কিছুকাল আগে একজন সর্বজ্ঞ পণ্ডিতের মুখে শুনেছিলাম যে বঙ্কিমের উপন্যাসগুলো কিছু হয়নি, প্রথম আনাড়ি হাতের নকসা মাত্র। অনেক লেখক এখনও সেই কথার প্রতিধ্বনি করে চলেছেন ( বঙ্কিমের আকাঙ্ক্ষা আশাতীত সাফল্য লাভ করেছে,

বাংলা ভাষায় এখন কে লেখক নয়! ) তবে তাঁর প্রবন্ধাবলী সম্বন্ধে তাদের নীরবতার কারণ গুগুলো বোঝা কঠিন। একদল আছেন যারা সরাসরি বঙ্কিমকে মেডিয়াভ্যাল বলে সংক্ষেপে বিদায় দেন। এখন উত্তমর্ণের যদি এই দশা হয় তবে অধমর্ণের দশা সহজেই অনুমেয়। উত্তমর্ণ মেডিয়াভ্যাল হলে অধমর্ণ প্রিমিটিভ না হয়ে যায় না। এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেও এর উপরে অযথা গুরুত্ব আরোপিত করতে চাই না, তবে এই বলাই যথেষ্ট যে অপঠিত পাণ্ডিত্যের অশেষ সুবিধা।

# নব্য বাংলা সাহিত্যে রোমাণ্টিকতার সূত্রপাত

ইংরাজী সাহিত্যের মতোই বাংলা সাহিত্যও মুখ্যতঃ রোমাণ্টিক। এই মন্তব্যে হয়তো তেমন আপত্তি হবে না, আপত্তির সূত্রপাত হবে রোমাণ্টিক শব্দ ও তার পিঠোপিঠি ক্লাসিকাল শব্দ দুটি নিয়ে। এত দীর্ঘকাল ধরে এত ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তি এত বিভিন্ন অর্থে শব্দ দুটি ব্যবহার করেছে যে অর্থারণ্যের ভিড়ে এদের মূল অর্থ আজ হারিয়ে গিয়েছে। তাই অতি ব্যবহারে কাটারির ধার যেমন প'ড়ে যায় তেমনি ঘটেছে শব্দ দুটি সম্বন্ধে। একে তো একজনের বা একদলের অর্থের সঙ্গে অপর জনের বা অপর দলের অর্থ মেলে না, তার উপরে যদি বা মেলে শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় সেই অর্থের আঘাতে কাঠ দূরে থাক কুটোটুকু পর্য্যন্ত কাটে না। লাভের মধ্যে কথা কাটাকাটি। এহেন ক্ষেত্রে সাহিত্যের রোমাণ্টিক প্রকৃতি বলতে আমি যা বুঝবো অপরে তা না বুঝলে তাঁর উপরে রাগ করা চলে দোষ দেওয়া যায় না। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যকে মোটের উপরে সকলেই ক্লাসিকাল বলে স্বীকার করবেন। কিন্তু তৎকালীন সাহিত্য রসিক ও আলঙ্কারিকগণ সেকালের সাহিত্যকে ক্লাসিকাল বলতে সুরু করেন-নি। পরবর্তীকালে একশ্রেণীর রচনাকে লোকে রোমাণ্টিক বলে মনে করে রোমাণ্টিক অভিধাটি তার উপরে চাপিয়ে দিয়েছে সমকালে নয়, অনেক পরবর্তী-কালে। ক্রমে পাশ্চাত্য সাহিত্যে এই দুই ধারায় বিভক্ত হ'য়ে গিয়েছে—অনেকের ধারণা এই দুই ধারার মধ্যে আমূল প্রভেদ, আর এদের মিলবার সম্ভাবনার পথ পর্য্যন্ত বন্ধ। এরা যেন শড়কিহস্ত শরিক পরস্পরকে আঘাত করতে উদ্যত। কালক্রমে আলঙ্কারিকগণ এই সাহিত্যের সঙ্গে নানা লক্ষণের ভূষণ পরিয়েছেন। সে সব ভূষণ সাচ্চা কিম্বা ঝুটো, সে সব লক্ষণ নিত্য কিম্বা নিতান্ত সাময়িক ঠাহর করে দেখেননি। তার উপরে আবার শব্দদুটির অর্থব্যাপ্তি ঘটেছে। প্রথমে সাহিত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে যা প্রযোজ্য ছিল, ক্রমে তা চিত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, সঙ্গীত প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পকলা সম্বন্ধে প্রযোজ্য হতে সুরু করলো। আর অবশেষে শিল্পকে অতিক্রম করে নিসর্গ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হ'ল। চন্দ্রোদয় রোমাণ্টিক, হিমালয়ের অটল গাম্ভীর্য্য ক্লাসিকাল শুনলে আর বিস্মিত হই

না। আর এখানেই শেষ নয়, মানুষের চেহারা, অবয়ব, পোষাক পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার সমস্তই রোমান্টিক ও ক্লাসিকাল লক্ষণ ভূষিত হল। বায়রণ তাঁর দিব্য কান্তি, সযত্নে অযত্ন বিন্যস্ত কেশদাম, গলাখোলা শার্ট আর আলগোছে জড়ানো গলাবন্ধ নিয়ে ঘনীভূত রোমান্টিক, উল্টোটার উদাহরণ রূপে নেওয়া যেতে পারে ডক্‌টর জনসনকে, তাঁর হিমালয়বৎ বিপুলতা ও গাম্ভীর্য্য, No Sir বলে সংক্ষেপে প্রতিবাদীকে নিরস্ত্রীকরণ ঘনীভূত ক্লাসিকাল ছাড়া আর কি! কিন্তু এসব ভূষণ কি ষোল আনা সাঁচ্চা, এসব লক্ষণ কি অনিবার্য্যভাবে নিত্য! বায়রণ যতই প্রগতিশীল হোন তাঁর মনের পতাকাটা পোপের যুগের দিকে সমীরিত। রচনায় তিনি রোমান্টিক, অলঙ্কারে পোপের সহগামী, যিনি নাকি ইংরাজী ক্লাসিকাল সাহিত্যের আদর্শ। কিন্তু নিরেট পাথরেও ফাটল থাকতে বাধা নেই, পোপের রচনায় সেই ফাটল Elasia to Abelard যার মধ্য দিয়ে রোমান্টিকতার মৃদু বসন্তের হাওয়া প্রবিষ্ট। আবার ঘনীভূত ক্লাসিকালের প্রতিমূর্তি জনসনের হি ব্রাইডস ভ্রমণ কাহিনীতে মাঝে মাঝে চোখে রোমান্টিকতার পূর্বগামিনী ছায়া। এরকম মিশলের ব্যতিক্রম সর্বকালে। তুলনীয় সেক্সপীয়র ও বেন জনসন। আর প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যেও ব্যতিক্রমের বাইরে নয়। ইলিয়াডের তুলনায় ওডীসি রোমান্টিক, সোফোক্লিসের তুলনায় ইউরিপাইডিস—আর সাফোর গীতিকবিতার বিলাসহর্ম্যের যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভগ্নাংশগুলো পাওয়া যায় কার সঙ্গে তাদের তুলনা দেব! রোমান্টিকতার চাঁছি বললেই যথার্থ হয়—যদিচ উপমাটা নিতান্ত অরোমান্টিক। বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয় অত্যন্ত খণ্ডিত তার উপরে আবার অনেক ক্ষেত্রে অনুবাদের ঘষা কাঁচের ভিতর দিয়ে দর্শনে ঝাপসা। নতুবা আরও বিশদ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারতো। এতক্ষণ যা বললাম তার তাৎপর্য্য এই যে রোমান্টিক ও ক্লাসিকাল সাহিত্যের প্রকৃতিতে ভেদ থাকলেও সে প্রভেদ দুস্তর নয়। গঙ্গা যমুনার মতো বিরাট নদীতেও হেঁটে পার হওয়ার জায়গা থাকে। তবে সেটা ভরা বরষায় নয়, প্রখর গ্রীষ্মকালে। ঋতুর এই প্রভেদটা মনে রাখতে হবে।

গোড়াতে স্থরু করেছিলাম রোমান্টিক ও ক্লাসিকাল শব্দদুটির অর্থারণ্যে পথ আবিষ্কারের প্রয়াসে। সে দিকে অগ্রসর হতে গিয়ে দেখছি গৌণ ও নিত্য লক্ষণে জট পাকিয়ে গিয়েছে; দেখছি যে সে নদীতেও পারাপারের পথ আছে যাকে দুস্তর মনে করেছিলাম। এই জট ছাড়াবার চেষ্টায় দেখতে পেলাম এ দুই শ্রেণীর সাহিত্য গোত্র ভিন্ন হলেও গাঁই ভিন্ন নয়।

রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন সন্ধ্যাবেলায় বাতি জ্বালাবার আগে সকাল বেলায় সলতে পাকানো আবশ্যক। তারপর থেকে প্রায় সমস্ত বাঙালী লেখক সলতে পাকাতে সুরু করেছেন, কিন্তু অনেকেই খোঁজ করতে ভুলে যান ভাঁড়ারে বাতি জ্বালাবার তেল মজুত আছে কিনা। এই প্রবন্ধের মুখপাত করেছি নব্য বাংলাসাহিত্যে রোমান্টিকতার সূত্রপাত কিন্তু এ পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে একটি কথাও বলিনি। এক্ষেত্রে শ্রোতাদের সন্দেহ জন্মানো অস্বাভাবিক নয় ভাঁড়ারে তেলের অভাব ঢাকবার উদ্দেশ্যেই বিদেশী সাহিত্যের অরণ্য থেকে ইন্ধন সঞ্চয় চেষ্টা লেখকের।

বীরবলের একটি উক্তি আছে, আমরা পড়ি ইংরাজী, লিখি বাংলা। উক্তিটি একটি সূত্র। আপাত দর্শনে ক্ষুদ্র--কিন্তু জট ছাড়াতে গেলে দেখতে পাওয়া যায় দৈর্ঘ্যে কম নয়। আমরা সঞ্চয় করি বিদেশী ভাষা থেকে প্রকাশ করি মাতৃভাষায়। দেড়শ বছরের ইংরাজি ভাষা চর্চায় বাঙ্গালী দ্বিমাতৃক। ইংরাজি ভাষা জোগাচ্ছে ইন্ধন, মাতৃভাষা অগ্নি। অলঙ্কারটা বদলে নিয়ে বলা যায় বিদেশী ভাষা থেকে পেয়েছি তৈল, মাতৃভাষা থেকে স্তন্য। কাজেই আমি যদি বিদেশী সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করে থাকি– অন্যায় করিনি, বাতি জ্বালাবার তেল তো চাই। এতক্ষণ ধরে সলতে পাকিয়েছি, মাতৃভাষার অগ্নিতে বাতি জ্বালাবার আশায়। বিদেশী ভাষার সাহায্য আরও নিতে হবে, কেননা, তৈলাভাবে বাতি নিভে যায়। কিন্তু তার আগে প্রবন্ধটির নামের সার্থকতা সাধন আবশ্যক "নব্য বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিকতার সূত্রপাত"। আর প্রবন্ধটির প্রথম বাক্য ইংরাজি সাহিত্যের মতোই বাংলা সাহিত্যও মুখ্যতঃ রোমান্টিক। এখন নব্য বাংলা সাহিত্যের সূত্রপাত যে মধুসূদন থেকে সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। এখানে সাহিত্য অর্থে কাব্য। সাহিত্যের ব্যাপক অর্থে গদ্যকে ধরলে বিদ্যাসাগর থেকে সূত্রপাত বলা উচিত। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের, যে গদ্যের ঠাট আমরা এখনো ব্যবহার করছি তার স্রষ্টা—আর মধুসূদন স্রষ্টা নব্য বাংলা পদ্যের। এখানে মুখ্যত পদ্যই আমাদের আলোচ্য। তিনজন প্রধান বাঙালী লেখকের তিনখানি গ্রন্থ আমাদের অবলম্বন। মধুসূদনের তিলোত্তমাসম্ভব, বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা, রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা। কপালকুণ্ডলা অবশ্য গদ্যে লিখিত তবে তার অন্তর্নিহিত ধর্ম পদ্য, গদ্যের ছদ্মবেশে পদ্য, পুরুষের ছদ্মবেশে রাজপুত্রী চিত্রাঙ্গদা। কপালকুণ্ডলা ও

চিত্রাঙ্গদাকে লেখকদ্বয়ের শ্রেষ্ঠ রচনার অন্তর্গত বলা চলে—এরকম দাবী তিলোত্তমাসম্ভব সম্বন্ধে অসম্ভব। আমরা যদি শ্রেষ্ঠত্বের সন্ধানী হতাম তবে তিলোত্তমাসম্ভবের বদলে অবশ্যই মেঘনাদবধ কাব্যকে গ্রহণ করতাম। বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য গ্রন্থের গুণ নয়, গ্রন্থের প্রকৃতি। এখানে প্রকৃতি বলতে রোমান্টিক প্রকৃতি। যে অর্থে তিলোত্তমা, কপালকুণ্ডলা ও চিত্রাঙ্গদা রোমান্টিক, সে অর্থে মেঘনাদবধ কাব্য রোমান্টিক নয়। তবে যে অনেকে ক্লাসিকাল বলেন তা-ও নয়। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য যদি নিছক ক্লাসিকাল না হয়, তবে অন্যে পরে কা কথা। তবে একথা সত্য ক্লাসিকাল কাব্যের কোন কোন লক্ষণ কোন কোন স্থানে আছে। মেঘনাদ ও প্রমীলার চিতাশয্যার পাশে রাবণের খেদোক্তি এবং জয়সিংহের মৃতদেহের উপরে রঘুপতির বিলাপে যথাক্রমে ক্লাসিকাল ও রোমান্টিক প্রকৃতির লক্ষণ প্রকট। কথা এই যে তিলোত্তমার গুণে সুন্দ উপসুন্দের মতো আমরা আকৃষ্ট হইনি, আমাদের আকর্ষণের হেতু কাব্যখানির রোমান্টিক প্রকৃতি। গ্রন্থ তিনখানি নব্য রোমান্টিকতার তিনটি ধাপ। কিন্তু মুস্কিলে পড়েছি আর দু'খানি কাব্য নিয়ে, স্বপ্নপ্রয়াণ ও সারদামঙ্গল। মুস্কিলটা কোথায় আর কেন এদের সরাসরি আলোচনার মধ্যে বিস্তারিতভাবে গ্রহণ করতে পারলাম না, যথাসময়ে বিবৃত করবো। এখানে মোটা তুলিতে আলোচ্য বিষয়ের আভাস দিয়ে আবার বিদেশী সাহিত্যের অরণ্যে প্রবেশ করতে হচ্ছে।

বিদেশী সাহিত্যের নজিরে বোঝাতে চেষ্টা করেছি ক্লাসিকাল ও রোমান্টিক প্রকৃতির মধ্যে অলঙ্ঘ্য বাধা নেই, তারা পরস্পর বিরোধী নয়, গোড়া থেকেই, প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের আমল থেকেই তাদের মধ্যে মিশল হয়েছে। তবে আবার একথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে দু'য়ের প্রকৃতি ও ধর্ম ঠিক এক নয়, রক্তের মিশল সত্ত্বেও দু'য়ের স্বকীয়তা একীভূত হয়ে যায় নি।

এখন দেখানো আবশ্যক রোমান্টিকতার নিত্যলক্ষণ কিছু আছে কিনা, যদি থাকে ক্লাসিকতার সঙ্গে প্রভেদটা কোথায়? আরও দেখাতে হবে সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে এই নিত্য লক্ষণের যোগাযোগ আছে কি না? যদি থাকে তবে সেই পরিবর্তনের পরিণাম কি! এখন আর প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের নজির টানা চলবে না, কারণ ঠিক কোন্ কার্য্য কারণের পরিণাম হোমারের কাব্য জানা যায় না, সেটা ইতিহাসের গোধূলি লগ্নের ব্যাপার, প্রমাণের চেয়ে অনুমানের উপরে ভরসা বেশি। পরবর্তী গ্রীক সাহিত্যের সঙ্গে অনুবাদের

আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে কিছু জ্ঞান থাকলেও সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে আমার জ্ঞান উল্টো পিরামিডের মতো নড়বড়ে অর্থাৎ সঙ্কীর্ণ ভিত্তিক। কাজেই হাতের কাছের সাহিত্যের ইতিহাসে ফিরে আসা ছাড়া উপায় নেই।

ইংরাজি সাহিত্যের সঙ্গে ঐক্য দেখিয়ে প্রবন্ধের সূত্রপাত করেছি। কাজেই আগে ইংরাজি সাহিত্যের কথা বলা যাক। ইংরাজি সাহিত্যের দুটি পর্বকে রোমান্টিক বলা হ'য়ে থাকে, একটি সেক্সপীয়রের আমলে, একটি ওয়ার্ডস্বার্থের আমলে, আর এঁরা দু'জন পর্বদ্বয়ের শ্রেষ্ঠ কবি তা বোধকরি কেউ অস্বীকার করবেন না। দুটোই রোমান্টিক যুগ, দু'য়ে মিল আছে, আবার অমিলও আছে। সেক্সপীয়রের রোমান্টিক যুগের রচনা প্রধানত ঘটনাবহুল আর যেহেতু ঘটনাগুলো বাইরে ঘটে—তাই বহির্মুখী। ওয়ার্ডস্বার্থের যুগের অধিকাংশ রচনা ঘটনা-বিরল আর অন্তর্মুখী। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, ব্যতিক্রম স্কটের ও বায়রণের কাব্য। এখানে কাব্যই আলোচ্য বিষয় তাই স্কটের উপন্যাস বাদ পড়লো।

আবার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও দুটি রোমান্টিক যুগ, একটি চৈতন্যদেব পরবর্তী মহাজনী পদাবলীর যুগ, আর একটির স্থরু মধুসূদনে যদিচ শ্রেষ্ঠ কবি কিছু পরবর্ত্তীকালের রবীন্দ্রনাথ। স্কটের উপন্যাসের মতো বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-গুলি বাদ দিলে এ যুগের মিল ওয়ার্ডস্বার্থের যুগের সঙ্গে। অধিকাংশ রচনা অন্তর্মুখী, আর অন্তর্মুখী বলেই ঘটনা বিরল। তাছাড়া আরও একটি মিল আছে দুটি যুগেরই আত্মপ্রকাশের প্রশস্ত রাজপথ লিরিক। সেক্সপীয়রের যুগের আত্মপ্রকাশের প্রশস্ত রাজপথ, আবার ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে, নাটক। নাটকে ও লিরিকে মৌলিক প্রভেদের ফলে মিল থাকা সত্ত্বেও দুই যুগের রচনার স্বাদে তফাৎ আছে, তবে মূল তারগুলিতে রোমান্টিকতার সুর।

এলিজাবেথের পরবর্তী ষ্টুয়ার্ট রাজবংশের সময় থেকে ইংলণ্ডে সামাজিক বিপ্লবের সূত্রপাত; প্রথমে তার ছন্দটা মন্দাক্রান্তা চালের ছিল, পরে ধ্বনিত হল শার্দূল বিক্রীড়িত ছন্দ। প্রথমে পিউরিটানরা নাট্যশালাগুলো বন্ধ করে দিল, তারপরে কিছুদিন চলল রাজকীয় দলে ও পিউরিটান দলে গৃহযুদ্ধ; রাজার মাথা খ'সে পড়লো, বছর কয়েক ক্রমওয়েলীয় শাসন চলল। এই যুগের শ্রেষ্ঠ কাব্যিক প্রকাশ প্যারাডাইস লষ্ট্। পিউরিটানদের সাহিত্যিক মুখপাত্র মিল্টন। নিরন্তর কলম চালানোর ফলে অন্ধ হ'লেন; অন্ধ না হলে Samson Agonistes লিখিত হ'তো কিনা সন্দেহ। তারপরে ফরাসীদেশে দীর্ঘকাল নির্বাসিত

ছিন্নমস্তক রাজার পুত্র রাজারূপে ফিরে এলেন ; সেই সঙ্গে ফরাসি সাহিত্যের ও সাহিত্যতত্ত্বের প্রভাব সংক্রামিত হ'ল, ইংরাজি সাহিত্যে। মুখ্যতঃ যে সাহিত্য রোমান্টিক তার উপরে পড়লো ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব যে সাহিত্য কি কাব্যে কি গদ্যে মুখ্যতঃ রিয়ালিষ্টিক। বলাবাহুল্য ইংরাজি কাব্যের উপরে তার প্রতিক্রিয়া শুভ হল না ; তবে কিছু লাভও হল। সর্বজন বোধ্য, সর্বজন ব্যবহার্য ইংরাজি গদ্যের সূত্রপাত হ'ল কবি ড্রাইডেনের হাতে। তাঁর লিখিত কাব্যও গদ্যাত্মক, এই কারণেই মাথ্যু আরনল্ড ড্রাইডেন ও পোপের কাব্যকে Classics of Prose বলেছেন। ড্রাইডেন ইংরাজি সাহিত্যের বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের হাতেই বাংলাভাষায় প্রথম দেখা দিল সর্বজনবোধ্য ; সর্বজন গ্রাহ্য গদ্যরীতি। ড্রাইডেন ও এডিসন প্রভৃতির মতো বিদ্যাসাগর যে গদ্যরীতির স্রষ্টা তাকে বলা হয়েছে Neutral style, এ রীতি এক একবল্গা নয়, মধ্যগারীতি। কিন্তু ইতিমধ্যে সেক্সপীয়রকে ছেড়ে অনেক দূর চলে এসেছি, আবার সেই দিকে ফিরতে হ'ল। সাহিত্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হলে সেক্সপীয়রে প্রত্যাবর্তন অনিবার্য্য—all Roads lead to Shakespeare !

সেক্সপীয়রের আমলের রোমান্টিক যুগ অনেকগুলি সামাজিক পরিবর্তনের ফল। রোমক ধর্মশাসনের বন্ধনচ্ছেদ, ড্রেকের ভূপ্রদক্ষিণ, র‍্যালের উদ্যমে নববিষ্কৃত আমেরিকার সঙ্গে আলো আঁধারি পরিচয়, ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে রাণী এলিজাবেথ কর্তৃক East India Company কে প্রাচ্য ভারতে অবাধ বাণিজ্য করবার সনদ প্রদান; কিছুকাল আগে টলেমীয় ভূকেন্দ্রিক লাভাজগৎ সৌরকেন্দ্রিক হ'য়ে পৃথিবীকে কোনঠাসা ক'রে দিয়েছে। সেকালের লোকে পরম বিস্ময়ে দেখল মনের দিগন্ত হঠাৎ প্রসারিত হ'য়ে গিয়েছে, আর সেই বিস্ময়ের আগুনে কিছুদিন ধরে ফুৎকার প্রদান করতে শুরু করেছিল রেনেসাঁসের প্রভাব। সেওএক নূতনজগতের বার্তা। এমন সময়ে ১৫৮৮ সালে রোমক ধর্মীয় শাসনের প্রধানতম ও প্রবলতম প্রতিনিধির বিপুল নৌবাহিনী পরাজিত হ'ল ক্ষুদ্র ইংরাজ নৌবাহিনীর হাতে। এই সময় থেকেই প্রকৃত অর্থে এলিজাবেথীয় যুগের সূচনা, যার শ্রেষ্ঠ ফল সেক্সপীয়র ! অথচ মনে রাখা আবশ্যক তৎকালীন ইংলণ্ডের জনসংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষের বেশি নয়—বৃহত্তর কলকাতার জনসংখ্যা, আর লণ্ডনের জনসংখ্যা খুব বেশি হবে তো আড়াই লক্ষ, তিন লক্ষ, আজকার দক্ষিণ কলকাতার জনসংখ্যা। ক্ষুদ্র দেশের ক্ষুদ্রতর সহর অথচ মনের সীমানা বাড়িয়ে দিয়েছে নানা ঘটনায়,

কল্পনা হাত বাড়াচ্ছে আকাশের সীমানায়, হ্যামলেট আদৌ অত্যুক্তি করেনি।

এলিজাবেথীয়দের চোখে চরাচর নূতন সৌন্দর্য্যে, নূতন বিস্ময়ে, নূতন আনন্দে উজ্জ্বলতর হয়ে দেখা দিল। ছন্দ, শব্দ, মাত্রা, অলঙ্কার প্রভৃতির চিরাগত রীতিকে তারা Spanish Armada-র মতো ভ্রূক্ষেপে উড়িয়ে দিল ; Common sense এর স্থান , ফরাসীরা যাকে বলে good sense অধিকার করলো imagination, ধর্মমতের স্থান অধিকার করলো আত্মপ্রত্যয়—বিধাতার স্থান অধিকার করলো অহং। ভলতেয়ার সেক্সপীয়ারকে বলেছেন প্রতিভাবান বর্বর। কিন্তু এমন উদ্দাম চাল তো দীর্ঘকাল চলতে পারে না। তাই একদিন ১৬১৩ সালে শিশু এলিজাবেথের প্রশস্তিপূর্ণ নাটক অভিনয়ের সময়ে আগুন লেগে Globe Theatre, শেক্সপীয়ারের Wooden 'O'—পুড়ে ভস্মীভূত হ'য়ে গেল। এই সালটিকেই প্রকৃত পক্ষে এলিজাবেথীয় যুগের সমাপ্তি বলে গ্রহণ করা উচিত, যদিচ তারপরেও কয়েক বছর আকাশে আলো ছিল, সেটা সূর্য্যাস্তের পরে গোধূলির দীপ্তি। কয়েকটি মাত্র বৎসর ১০৮৮ থেকে ১৬১৩। যুগ ক্ষুদ্র, দেশ ক্ষুদ্র, অথচ স্বর্ণময় কাব্যফসল। একেই বলে Leaving great verses into a little clan. ওয়ার্ডস্বার্থীয় রোমান্টিক যুগও দীর্ঘ নয় ; Lyrical Ballads প্রকাশ ১৭৯৮ সালে বায়রণের মৃত্যু ১৮২৪ সালে - মাত্র ছাব্বিশটি বছর। রোমান্টিক যুগ সামাজিক মনের তরঙ্গশীর্ষ ; ওর স্থায়িত্ব ও বিস্তার অদীর্ঘ। এই ক্ষুদ্র যুগগুলি যেন পর্বতের শিখর, অর্থাৎ উচ্চতম অংশ। কিন্তু শুধু শিখর নিয়ে তো পর্বত নয়, তার অধিক্যতা আছে, উপত্যকা আছে, সানুদেশ আছে, আছে অরণ্যময় তরাই অঞ্চল—সব নিয়েই পর্বত। সাহিত্য সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য, তবে যে আমরা কেবল শিখরের উল্লেখ করলাম, তার কারণ পর্বতের উচ্চতা দিয়েই পর্বতের পরিচয় দান হচ্ছে রীতি।

ক্লাসিকাল যুগ বলে থাকেন। তারপরে আবার নূতনরূপে ফিরে এলো রোমান্টিক যুগ। দুয়ে তফাৎটা কোথায়? ক্লাসিকাল যুগ সমাজের স্থিতাবস্থাকে স্বীকার করে নেয়—স্থিতাবস্থার ব্যভিচার ক্লাসিকাল লেখকগণের চোখে একপ্রকার সামাজিক অপরাধ। সামাজিক স্থিতাবস্থার স্বীকৃতি কাব্যে এক বিশেষ রসের সঞ্চার করে। তাদের কাব্যজগৎ common sense এর দিগন্তে বেষ্টিত, The light that was not in land or sea কিম্বা "শেফালি বনের মনের কামনা" তাদের কাছে শুধু দুর্বোধ্য নয়—কবিধর্মের ব্যভিচার। প্রকৃতি তাদের কাছে চিত্রপটমাত্র। ভার্সাই রাজোদ্যানের গাছপালা গুলো স্বকীয় রূপে বাড়তে পারেনি, তাদের ছেঁটেছুটে বিশেষ বিশেষ পশুপক্ষীর আকৃতি দেওয়া হ'য়েছে। তাদের ধারণা সেটাই common sense বা Good sense সঙ্গত। তাদের বিশ্ব বিস্ময়রস নিষ্কাশিত, তাদের সৌন্দর্য্য উদ্যানের পোষমানা হরিণ, তাদের কাছে প্রেম বিশেষ একটি সামাজিক সম্বন্ধ, তাদের কাছে "জনম জনম হাম রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল, লাখ লাখ যুগ হিয় হিয়ে রাখলুঁ তবু হিয়া জুড়ন না গেল"—এ শুধু দুর্বোধ্য নয় নিতান্ত প্রলাপোক্তি। প্রকৃতি, প্রেম, বিস্ময়, সৌন্দর্য্য, আনন্দ বলতে রোমান্টিক কবিতায় অভ্যস্ত সহৃদয়গণ যা বুঝে থাকে সে "রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস।"

এমন সময়ে আবার পালা বদলের ডমরু ধ্বনিত হ'ল, করাসী বিপ্লবের রাগ-রাগিণী বেজে উঠল ঝাঁপতালে। জাত হিসাবে ইংরাজ নিতান্ত বিষয়ী, ব্যক্তি হিসাবে ব্যতিক্রম থাকতে বাধা নেই। যুবক ওয়ার্ডস্বার্থ ও কোলরিজ বন্ধুদ্বয় সেই ঝাঁপতালের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। ওয়ার্ডস্বার্থ বললেন—এ হেন সময়ে জীবিত থাকা যেন স্বর্গবাস। but to be young is very heaven! নেপোলিয়নের মিশর অভিযানের বছরে প্রকাশিত হ'ল Lyrical Ballads! ১৭৯৮ সালে Lyrical Ballads প্রকাশিত হ'য়ে আনুষ্ঠানিকভাবে Romantic পর্বের ঘোষণা করলেও তার কিছুকাল আগে থেকে অঘোষিত Romantic কাব্য রচনার ধারা প্রবাহিত হ'তে আরম্ভ করেছিল—যদিচ ক্ষীণ ছিল তার ধারা। এই সময়টায় আর একটা কণ্ঠের সূত্রপাত হয়েছিল। যার সঙ্গে রোমান্টিক সাহিত্যের প্রত্যক্ষ কোন যোগ থাকা সম্ভব নয়। পরবর্তীকালে যার নাম দেওয়া হয়েছিল Industrial Revolution—ডিকেন্সের উপন্যাসে যার উৎকট চেহারা প্রকট। রোমান্টিক কাব্যে Industrial Revolution এর

মধ্যে দুস্তর ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও অপ্রত্যাশিত মিল ছিল। আবিষ্কারক ও স্বার্থান্বেষী যখন জল, বায়ু, বিদ্যুৎ প্রভৃতির মধ্যে লৌকিক ঐশ্বর্য্যের সন্ধান করছিল, রোমান্টিক কবিগণের দিব্যদৃষ্টিতে তখনই এদের মধ্যে অলৌকিক বিস্ময় প্রকটিত হয়ে রোমান্টিক সাধনায় গতিবেগ সঞ্চার করছিল। সাধনভেদে ঐশ্বর্য্যের ভেদ। The sounding eataract haunted me like a passion, কিম্বা Roll on thou deep dark blue ocean roll. কিম্বা The moving water at their priest like task. কিম্বা Make me thy lyre even as the forest is. কিম্বা Steam Engine তৈরির প্রয়াস, কিম্বা খাল থেকে পাম্প করে জল তুলবার চেষ্টা, দুটোই প্রকৃতির সাধনা। তবে একটিতে প্রকৃতিকে জয় করবার সঙ্কল্প - আর একটিতে প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন স্থাপনের ইচ্ছা।* সাধনভেদে ফলভেদ।

ওয়ার্ডস্বার্থ ও কোলরিজ ফরাসি বিপ্লবের আশার সূর্যোদয়ের কবি, আর বেশ কয়েক বছরের ছোট বায়রণ, শেলী ও কীটস্ আশাভঙ্গের সূর্য্যাস্তের কবি, যখন ইউরোপের রাজচক্র ফরাসি বিপ্লবের প্রতিভূ নেপোলিয়নকে পরাজিত ও নির্বাসিত করতে উদ্যত। ওয়ার্ডস্বার্থ তখন ম্যাথু আর্নল্ডের ভাষায় monasterতে প্রবেশ করেছেন, আর কোলরিজ Ancient Mariner-এর জাহাজ খানার মতো হালভাঙা অবস্থায় আফিমের কুয়াশায় দিগ্‌ভ্রান্ত। কিন্তু তাঁদের কবি কর্তব্য সমাধান হয়ে গিয়েছিল, একজন প্রত্যহের মধ্যে সৌন্দর্য্যকে, আর একজন সুন্দরের মধ্যে বিস্ময়কে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। কিন্তু আরও কিছু কবি কর্তব্য বাকি ছিল বায়রণ একেবারে নিখাদে তুরী ভেরী বাজিয়ে দিলেন সামন্ত চক্রের বিরুদ্ধে। লিবার্টি তার মূল স্বর। Pope, Dryden, Dr. Johnson ঐ শব্দটাকে নিদারুণ রাজদ্রোহ মনে করতেন। শেলী প্রেমকে অসামাজিকতার চূড়ান্ত অবধি টেনে নিয়ে গেলেন, শুধু কাব্যে নয়। বায়রণ ও শেলী দুজনেই মরীয়া।

---

* মনে রাখা দরকার ওয়ার্ডস্বার্থের জন্মের তিন বছর আগে Spinning Jenny-র আবিষ্কার, আবার বায়রণের মৃত্যুর তিন বছর পরে Stookton Dartington রেলপথে প্রথম রেলগাড়ী চলল। তারও কয়েক বছর আগে সেন্ট হেলেনায় দ্বীপান্তরিত থাকবার সময় নেপোলিয়ান ধোঁয়াকলের জাহাজ দেখেছিলেন বলে কোথাও পড়েছি।

কনিষ্ঠতম কীটস্ সবচেয়ে মাথা ঠাণ্ডা, ফরাসি বিপ্লবের প্রতি তাঁর আনুকূল্যের অভাব ছিল না, কিন্তু কাঁচা বয়সেই বুঝেছিলেন—"A thing of Beauty is a joy for ever", কবির কাজ সত্যের মধ্যে সৌন্দর্য্য, সৌন্দর্য্যের মধ্যে সত্যকে আবিষ্কার। এই পাঁচজনে মিলে কাব্যে বিস্ময়, প্রকৃতি, প্রেম, আনন্দ সৌন্দর্য্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। কীটস্ অল্পবয়সে অনাদরে মারা গেলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর প্রতিভা কাজ করে চলল, টেনিসন ও প্রি-র‍্যাফেলাইট গোষ্ঠীর কবিদের মধ্যে দিয়ে। বায়রণ, শেলী, কীটস্ তিনজনেই স্বল্পায়ু, তিনজনেরই বিদেশে মৃত্যু, তিনজনেই স্বদেশে অনাদৃত। কিন্তু বায়রণের উদ্ভব না হ'লে ইংলণ্ডের রোমাণ্টিক রিভাইভাল আন্দোলন নিতান্ত স্থানীয় একটা ব্যাপার মনে হয়ে থাকতো, ইউরোপময় তার ফল ফলতো না। ১৮২৪-এ বায়রণের মৃত্যু সংবাদ এসে পৌঁছলে বালক টেনিসন সমুদ্রতীরে পাথরের উপরে খোদাই করে লিখলেন Byron is dead! এখানেই ইংলণ্ডের দ্বিতীয় রোমাণ্টিক পর্বের সমাপ্তি আগেই বলা হ'য়েছে।

অনেকে ভাবতে পারেন আমি ধান ভানতে শিবের গীত আরম্ভ করেছি। কোথায় বাংলা সাহিত্যে নব্য রোমাণ্টিকতার সূত্রপাত—আর কোথায় বিদেশী সাহিত্যে রোমাণ্টিকতার বিশ্লেষণ। এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক কোথায়? আগে প্রবাদটার অর্থ বুঝবার চেষ্টা করা যাক্। প্রবাদটার প্রচলিত অর্থ অস্থানে অপ্রয়োজনীয় কথার অবতারণা। আমার বিশ্বাস অর্থটা ঠিক তা নয়। প্রবাদটার মধ্যে বাঙালী সমাজের এক সময়কার ইতিহাস সূত্রাকারে বিবৃত। এক সময়ে শিবের গীত এদেশে এত সুপ্রচলিত ছিল যে সমস্ত উপলক্ষ্যে ঐ গান গীত হ'তো, এমনকি ধান ভানবার সময়েও। আমার বিশ্বাস সত্য হোক্ বা না হোক্ শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করা ছাড়া এক্ষেত্রে আমার উপায় নেই। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মধ্যে রোমাণ্টিক যদি কেউ থাকেন তবে তিনি শিব। রবীন্দ্রনাথের ধারণায় শিবের রূপান্তর নটরাজ, যাঁর নৃত্যের তালে তালে চরাচর তরঙ্গিত, সব আনন্দের মূলে তাঁর ছন্দোময় পদক্ষেপ। বিষ্ণু রিয়ালিষ্ট, চরাচর পালন-কর্তাকে রিয়ালিষ্ট না হ'লে চলে না। আর পিতামহ ব্রহ্মাকে ক্লাসিসিষ্ট বলতে ইচ্ছা করে। ক্লাসিকস্ মানেই সেই বই লোকে যা কেনে অথচ পড়ে না, নাম শুনলেই আহা আহা করে ওঠে কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। ব্রহ্মার পূজা আজ আর কে করে? কাজেই রোমাণ্টিকতার বিবরণ দিতে বসে যদি শিবের গীত গেয়ে থাকি অন্যায় করিনি।

ইংরাজি রোমান্টিক সাহিত্যের বর্ণনা উপলক্ষ্যে যা বলেছি তার সংক্ষিপ্ত নিহিতার্থ হচ্ছে মাঝে মাঝে সামাজিক বিপ্লবের ফলে মানুষের চোখের উপর থেকে অভ্যাসের জীর্ণ পর্দাখানা স'রে গিয়ে পুরাতন বিশ্ব নূতন সৌন্দর্য্যে, নূতন বিস্ময়ে, নূতন আনন্দে বিভূষিত হ'য়ে দেখা দেয়। প্রকৃতি আবার স্বমূর্তি ধারণ করে, ভার্সাই রাজোদ্যানের পশুপক্ষীকৃত রূপে আর তার চলে না। যে পাহাড় পর্বত বিষয়ী মাধব দত্তের চোখে বাধা বিশেষ, জানলায় উপবিষ্ট অমলের চোখে তা সুদূরে আহ্বানের ইঙ্গিত। সবশুদ্ধ মিলে মানুষে এমন একটা ভাব অনুভব করে অন্য শব্দের অভাবে যাকে প্রেম বলা যেতে পারে। অনেকের চোখে তা অসামাজিক, তাই বলে অবাস্তব নয়। বৈষ্ণব কবি নিম্নলিখিত পদটিতে এই ভাবেরই আভাস দিয়েছেন, "গোকুল নগরী মাঝে, কতেক রমণী আছে তাহে কোন না পড়িল বাধা, নিরমল মুখখানি রেখেছি যতনে আজি, বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা।" আমাদের বাঙালী রাধা ইংরেজি জানলে এই ভাবটিকেই ভাষান্তরে প্রকাশ করতে পারতেন।

Had we never loved sae kindly,  
Had we never loved sae blindly,  
Never met, or never parted,  
We had ne'er been broken hearted."

এই দিব্যানুভূতি যে তীব্রতায় বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রকাশিত তার অনুরূপ অন্য সাহিত্যে বিরল। শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদাবলীর পরিমাণ বেশি নয়, কিন্তু দিব্যানুভূতির তীব্র গভীরতায় তার তুলনা মেলা ভার। ইংরেজি রোমান্টিক কাব্যের বৈচিত্র্য, বিস্তার, ঘটনাবহুল বহুমুখিতা এখানে আশা করা উচিত হবে না। বাঙালী সমাজ ক্ষুদ্র, তৎকালে আরও ক্ষুদ্র ছিল, বহির্জগতের সঙ্গে তার যোগাযোগ জনশ্রুতির বেশি এগোয় নি, ধান ভানা ও শিবের গীতকে অবলম্বন করে তারা স্থিতাবস্থাকে স্বীকার করে নিয়েছিল। এমন সময়ে ঘটল অভাবিত সমাজ বিপ্লব। তুর্কী আক্রমণ ও তুর্কী শাসন। আর তার কিছু পরেই এক মহাপুরুষের আবির্ভাব। চৈতন্যদেবকে অনেকে অবতার মনে করেন, অনেকে ধর্মগুরু ও মহাপুরুষ মনে করেন। এ সবই হয়তো সত্য কিন্তু এত বড় সমাজ সংস্কারক আর জন্মগ্রহণ করেননি। বিধর্মী রাজশক্তির বিরুদ্ধে একক সন্ন্যাসী। পরবর্তীকালের ভাষায় "one man army."

আবার একটি অলঙ্কারের সহায়তা নিতে হ'ল। শুধু রমণীরাই অলঙ্কার লোভী নয়। যথোচিত জ্ঞানহীন অক্ষম লেখকের পক্ষে অলঙ্কারের মতো সহায় আর কিছু নাই। জনপদ সমতলভূমি, সেখানে মাঠ শস্যে শ্যামল, উদ্যান ফুল ফলের বুক্ষে শোভন, গৃহ সমূহের মধ্যে তারতম্য থাকলেও সমস্তই বাসযোগ্য, তড়াগ, কূপ প্রভৃতি শীতল পানীয়ের আধার, বিপণিগুলি নানা দ্রব্য সম্ভারে পূর্ণ, আছে দেবালয়, আছে অতিথিশালা, আছে গোষ্ঠ, আত্মনির্ভর সুস্থ সুখী জনপদ।

ফলে সুখে দুঃখে অধিবাসীদের জীবনযাত্রা। তাদের কাছে এই স্থিতাবস্থা নিত্য আর নিত্য বলেই স্বীকৃত। এমন সময়ে অতর্কিতে পৃথিবী নড়ে ওঠে, বাড়ীঘর, গাছপালা ভূলুণ্ঠিত হয়, তড়াগ ও কূপের জল পাঠশালা পলাতক ছাত্রদলের মতো কোথায় ছুটে পালায়। সমতল ভূমি মুখ ব্যাদান করে, প্রকাশ পায় অতল গহ্বর, বেরিয়ে পড়ে শুষ্ক বালুকারাশি, হয়তো বা অগ্নিগর্ভ ধূমশিখা। স্থিতাবস্থা অস্থির। যারা তখনো জীবিত এক বাক্যে বলে ওঠে সর্বনাশ। স্থিতাবস্থার নিশ্চিন্ত ভাবের নাশ—কিন্তু সর্বনাশ হতে যাবে কেন! ভূমিকম্পের দোলা থেমে গেলে হয় তো দেখতে পাওয়া যায় ভূগর্ভ থেকে বেরিয়ে পড়েছে অভাবিত রত্নরাজি যার অস্তিত্ব কেউ কখনো কল্পনা করেনি। এই ভূকম্পন সমাজবিপ্লব, আবিষ্কৃত রত্নরাজি রোমান্টিক সাহিত্য, আর ঐ ভূতপূর্ব স্থিতাবস্থাটা তথাকথিত ক্লাসিকাল যুগ। সেটাও কম সুন্দর নয়, তার উপযোগিতাও অপরিহার্য্য, আর ঐ স্থিতাবস্থার বিস্তার নাড়া খাওয়া রত্নগর্ভ ভূমির চেয়ে অনেক বেশি। তবে দুয়ের স্বাদ আলাদা। বিধাতা নানা স্বাদে নিজের রসনাকে তৃপ্ত করেন। এই জন্যেই রোমান্টিক যুগ স্থায়িত্বে দীর্ঘ নয়, আর বৈষয়িক বিচারে সেই সময়টার জীবন যাত্রা আদৌ সুখের নয়। ওয়ার্ডস্বার্থ ও কোলরিজ চল্লিশ বছর বয়সে দেহরক্ষা করলে তাঁদের প্রতিষ্ঠা আরও বেশি হ'তো। রোমান্টিক যুগের জোয়ার চলে গেল, আর ওয়ার্ডস্বার্থ ডাঙায় তোলা নৌকাখানার মতো প'ড়ে থাকলেন। আমি তো কল্পনার ঘোড়দৌড় করেও প্রৌঢ় কীট্‌স, শেলি ও বায়রণ কল্পনা করতে পারিনে।

এবার আবার ঘরে ফেরা যাক্। কিন্তু তার আগে এতক্ষণ ধরে দেশ বিদেশের রোমান্টিক সাহিত্য সম্বন্ধে যে আলোচনা করা গেল তার ফলশ্রুতি স্মরণ করা যেতে পারে। রোমান্টিক সাহিত্য উদ্ভবের নিত্যকারণ অভাবিত

সামাজিক বিপ্লব আর রোমান্টিক সাহিত্যের নিত্য লক্ষণ বিশ্বপ্রকৃতি, প্রেম, সৌন্দর্য্য, আনন্দ ও বিস্ময় রস সম্বন্ধে নূতন মূল্য বোধ। অনেকে বিস্ময় রসকে আলাদাভাবে দেখতে রাজি নন। তাঁদের মতে বিস্ময়রস আলাদা নয় এই জন্যে যে ওটা অন্য সবগুলির মধ্যেই আছে। বিস্ময়কে জল বা তেলের সঙ্গে তুলনা করা চলে। Water colour-এর ছবিই হোক আর oil colour-এর ছবিই হোক্ দু'য়ের জন্যেই যথাক্রমে জল ও তেলের প্রয়োজন। বিস্ময়ের জাদুতেই বিশ্বপ্রকৃতি, প্রেম, সৌন্দর্য্য, আনন্দ উজ্জ্বলতর হ'য়ে অনুভূত হয়। এ মতের সঙ্গে আমার বিরোধ নেই, তবে আমার ধারণা আলাদা করে নিলে ক্ষতি নাই, বরঞ্চ অনেক স্থলে, যথা কপালকুণ্ডলায় বিচারে সুবিধা হয়। আবার সব ক্ষেত্রেই যে সমস্ত নিত্য লক্ষণ প্রকট বা সমান তীব্রতায় প্রকট এমন না হ'তেও পারে; কোনটি একেবারে অপ্রকট এমন হওয়াও অসম্ভব নয়, তবে অধিকাংশ লক্ষণ বর্তমান দেখতে পাওয়া যায়। আরও একটি কথা রোমান্টিক সাহিত্যের রথের সারথি কল্পনা; তথাকথিত ক্লাসিকাল সাহিত্যের সারথি Coinmon sense বা good sense-এর হাত থেকে রথের রশি সে কেড়ে নিয়েছে। মোটামুটি এই লক্ষণগুলি মনে রাখলেই আমাদের কাজ চলে যাবে।

আগে বলেছি যে তুর্কীশাসন সংঘাতের প্রভাবে দেশের চিত্তক্ষেত্রে যে ভূমিকম্প ঘটে গেল তার ফলে ভূগর্ভস্থ রত্নখনির আবিষ্কার ঘটল। এই রত্নের শ্রেষ্ঠ চৈতন্যদেব। এখন আবার চৈতন্যদেবের কথায় ফিরে আসা যেতে পারে। চৈতন্যদেবের প্রভাবে সমাজে যে সব পরিবর্তন ঘটলো তার সমস্ত আমাদের আলোচ্য নয়, আমাদের আলোচ্য বৈষ্ণব সাহিত্য, বিশেষভাবে বৈষ্ণব পদাবলী। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগেও বৈষ্ণব পদাবলীর একটি ধারা ছিল। রায় রমানন্দ ও চণ্ডীদাসের পদগান শুনে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। কোন্ চণ্ডীদাস সে কথায় আমাদের প্রয়োজন নাই। বিদ্যাপতি চৈতন্যপূর্ব কবি। কিন্তু বৈষ্ণবপদের গঙ্গোত্রী খুব সম্ভব বহু প্রভাব সঞ্চারিণী গীতগোবিন্দের গাথা। কিন্তু গঙ্গোত্রীরও আগে গোমুখী, তারও আগে সুদুর্গম হিমবাহ। এক্ষেত্রে গোমুখী রাধাকৃষ্ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত লোকগাথা, আর সুদুর্গম হিমবাহ হচ্ছে মানবচিত্তে মিলনবিরহ প্রভৃতি রসের চিরগম্ভীর ভাব।

চৈতন্যদেবের দিব্যজীবন চৈতন্যপূর্ব ও চৈতন্য পরবর্তী পদাবলীর মধ্যে জল বিভাজন রেখা। চৈতন্যপূর্ব পদাবলীতে আদিরসের প্রাধান্য। এ বিষয়ে

জয়দেব ও বিদ্যাপতিতে বিশেষ প্রভেদ নাই যদিচ বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাপতির পক্ষে রায় দিয়েছেন। চৈতন্যপরবর্তী পদাবলীতে আদিরস থাকলেও ভক্তির প্রাধান্যটাই অধিক। এর কারণ চৈতন্যলীলার দৃষ্টান্ত। চৈতন্যপূর্ব গীতগোবিন্দ, বিদ্যাপতির পদাবলী এবং কোন এক অনির্দিষ্ট চণ্ডীদাসের আদিরসাশ্রিত পদাবলী চৈতন্যের মনে দিব্যভাবের সঞ্চার করতে সমর্থ ও দীপ্ত ব্যক্তি সাধারণের জন্য নয়। চৈতন্যপরবর্তী ভক্তিরস প্রধান পদাবলী সাধারণের সম্পত্তি। তৎকালীন বঙ্গদেশে যে ভক্তির প্লাবন ঘটেছিল এইসব পদাবলীর খাত দিয়েই তা দেশের সর্বত্র পৌঁছেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সাহিত্যের মাপকাঠির বিচারে শ্রেষ্ঠ পদাবলীর সংখ্যা বেশী নয়। বলরাম দাস, জ্ঞানদাস, যদুনন্দন দাস গোবিন্দদাস প্রভৃতি কয়েকজন চৈতন্যপরবর্তী শ্রেষ্ঠ পদকর্তা। শ্রেষ্ঠ পদগুলি এঁদের রচনা থেকেই সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু তবে সর্বজনপ্রিয়, সর্বাধিক পরিচিত চণ্ডীদাস কোথায় গেলেন। আমার যেমন ধারণা পণ্ডিতদের হাতে প'ড়ে একদিকে যেমন তাঁর অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে তেমনি অন্যদিকে আবার কবির সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। শ্রীশ্রীপদকল্পতরুর ভূমিকায় সতীশচন্দ্র রায় চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব একেবারেই উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর মতে চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত শ্রেষ্ঠ পদের সংখ্যা ২০/২৫ টির বেশী নয়—আর সে জন্য কোন এক চণ্ডীদাসের কল্পনা অনাবশ্যক। তিনি পদগুলি জ্ঞানদাস, যদুনন্দন দাস প্রভৃতির মধ্যে বেঁটে দিয়েছেন। তবে যে বহুতর পদে চণ্ডীদাসের ভণিতা সেটা পদাবলী গায়কদের কীর্তি। নিজদলের গৌরব বাড়াবার উদ্দেশ্যে অপরের পদাশ্রয় অবলম্বন করেছেন, হেতু কি না, চৈতন্যদেবের প্রশংসাপত্র। বাস্ পণ্ডিতরা ভাবলেন চণ্ডীদাস সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। হায় রামী! হায় চণ্ডীদাস!

"শুন রজকিনী রামী
ও দুটি চরণ শীতল বলিয়া
শরণ লইনু আমি।"

সেকালের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ পদকর্তা উচ্চবর্ণোদ্ভব ছিলেন, তাঁরা কি প্রেয়সীর নিম্নবর্ণের কথা এমন স্পষ্টাক্ষরে উচ্চারণ করতে পারতেন। একালে বর্ণ অনেক ফিকে হ'য়ে গিয়েছে তবু কবিরা স্পষ্টভাবে না বলে ফুটকি দিয়ে কাজ সারেন। সেকালের বর্ণের গাঢ়তা স্মরণ রাখলে প্রেয়সীকে 'রজকিনী' স্বীকার একেবারেই

অসম্ভব মনে হয়। তা ছাড়া এককালের প্রেয়সী ছাপার অক্ষরে রজকিনী অভিহিত হ'লে কবির পিঠকে ধোপার পাটে পরিণত করতেন। একাজ একমাত্র সেই কবিই পারেন যিনি শুধু কবি বা ভক্ত নন, যিনি চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদের প্রেরণায় উন্মত্ত। তবুতো প্রশ্নের সমাধান হয় না, জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে,

"সত্য ক'রে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেম গান
বিরহতাপিত! হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়েছিল মনে।"

কবি নীরব। পণ্ডিতরা নীরব হলে সমস্যা মিটে যেতো। কিন্তু সমস্যা কি এত সহজে মেটে! রজকিনীর শীতল চরণাশ্রিত পদগুলির কবি কে? চণ্ডীদাসকেই যেন উড়িয়ে দেওয়া গেল, পদগুলি যে গেল না, আর উচ্চবর্ণের কোন কবির পক্ষে এসব রচনা যদি সম্ভব না হয় তবে পদকর্তা চণ্ডীদাসকে অপদস্থ করা কেন? পণ্ডিতগণের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও বাঙালী রসিক সাধারণ রামী-চণ্ডীদাসকে ছাড়তে সম্মত হবে মনে হয় না। ভাগ্যে আমি পণ্ডিত হইনি, পূজ্যপাদ বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় তো চেষ্টার ত্রুটি করেন নি।

চৈতন্য প্রণোদিত রোমান্টিক যুগের একমাত্র কীর্তি পদাবলী নয়, তবে যে তার বিশদ আলোচনা করলাম তার হেতু, পদাবলীগুলি সবচেয়ে লোকপ্রিয় আর আমাদের আলোচ্য বিষয়ও বটে। আরও কীর্তি আছে, সংক্ষেপে তার পরিচয় দিতে চেষ্টা করবো। গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র রচনা, চৈতন্য ও তাঁর পার্ষদগণের জীবনী রচনা দুটি কীর্তি। আর একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত ও অরণ্যিভূত বৃন্দাবনের আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা। এ যে রাধাকৃষ্ণের লীলাভূমি। ইংরেজ রোমান্টিক কবিগণের, বিশেষ বায়রণ ও শেলীর চোখে প্রাচীন গ্রীসের যে মূল্য ছিল এ অনেকটা সেই রকম আর কি? তবে তার চেয়েও বেশী। চৈতন্যদেবের কৃপায় বৃন্দাবন ভৌগোলিক ক্ষেত্র থেকে ভক্তের হৃদয়ক্ষেত্রে স্থাপিত হ'য়েছে—বাংলা সাহিত্যেরও। প্রাচীন গ্রীস, ও প্রাচীন বৃন্দাবন দুই রোমান্টিক প্রেরণায় নূতন মূল্য লাভ করেছে।

কথা প্রায় শেষ করেছি তবু একটি যেন বাকি রয়ে গেল। অধ্যাপক সুকুমার সেন বলেছেন – "রাধাকৃষ্ণ পদাবলীর প্রধান সুর বিরহের। বিরহসুরের রণনেই বাৎসল্যের, অনুরাগের এবং মিলনের শ্রেষ্ঠ পদগুলির উৎকর্ষ। সংস্কৃত সাহিত্যে বিরহ প্রধানত পুরুষের তরফে ··বৈষ্ণবগীতিকাব্যে বিরহ একান্তভাবে নারীরই।" একথা সর্বাংশে সত্য, পদাবলী সাহিত্যে রাধার কাছে কৃষ্ণ ম্লান। পরবর্তীকালে যে দু'খানি রাধাকৃষ্ণ কাহিনী সম্বলিত কাব্য লিখিত হয়েছে দু'খানিই রাধাপ্রধানা, আর শুধু তাই নয় কৃষ্ণ একেবারেই অনুপস্থিত। ব্রজাঙ্গনা ও ভানুসিংহের পদাবলী দুই রাধার বিরহোক্তি, ব্রজাঙ্গনাকে কবি তো নামান্তরে রাধা বিরহ কাব অভিহিত করেছেন।

চৈতন্য পরবর্তী পদাবলীতে বিরহের প্রাধান্য ও তীব্রতা, সে বিরহ আবার রাধার পক্ষে। এর বিশেষ কারণ আছে কি? পদকর্তাগণের অগোচরে একটি সর্বস্বার্থত্যাগিণী, সংসারেব সর্বসুখবঞ্চিতা, বিরহের সুরে যাঁর জীবনতন্ত্রী বদ্ধ, অন্তঃপুরের অন্তরালবর্তিনী দুরূহ সৌভাগ্যবতী সেই নারীই লৌকিক রাধারূপে পদাবলীর রাধার বিরহকে তীব্রতর করে তুলেছেন। কবিরা জানতেও পারেননি কার বিরহতপ্ত হৃদয়, কার চিরাশ্রুসজল নেত্র রাধার হৃদয় ও নেত্রের আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উর্মিলার উপেক্ষায় একালের মহাকবি অনুযোগ করেছেন আদি-কবিকে, কিন্তু হায় এক্ষেত্রে সে সান্ত্বনাটুকুও পাওয়া গেল না। নাই পাওয়া যাক। তবু পদাবলীর বিরহ করুণ যে রক্তপদ্মটির উপরে রাধা দণ্ডায়মানা বিষ্ণু-প্রিয়া তার অর্দ্ধাংশভাগিনী।

ইংরেজি রোমান্টিক পর্বদ্বয়ের সঙ্গে বৈষ্ণব রোমান্টিক পর্বের দুটি মূল প্রভেদ, দুটিই গুরুতর। ইংরেজি রোমান্টিক পর্বদ্বয় সম্পূর্ণ সেকুলার, তারা মোটেই আধ্যাত্মিক প্রেরণাজাত নয়। তাছাড়া ব্যক্তিনির্ভর, তাদের মধ্যে কোন গোষ্ঠী-গত যোগ স্থাপিত হয়নি। বেন জনসন ও শেক্সপীয়ারের মধ্যে ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল, কিন্তু কোন গোষ্ঠীগত যোগ ছিল না। স্যার ওয়াল্টার স্কট ও শেলীর মধ্যে মিল কোথায়? কীটস্ ও বায়রণের মধ্যেই বা মিল কোথায়? তারা সকলেই একই প্রেরণার ফল, একই সামাজিক বিপ্লবের পরিণাম। কিন্তু তার মধ্যে ধর্ম বা ধর্মীয় গোষ্ঠী বলে কিছু ছিল না, সবাই স্বনির্ভর।

অন্যদিকে চৈতন্যোত্তর রোমান্টিক যুগের মূলে রয়েছেন চৈতন্যদেব স্বয়ং, তার প্রেরণা আধ্যাত্মিক। আর পরবর্তী পদকর্তাগণ সকলেই ভক্তিবাদাশ্রিত

কোন না কোন সাধন গোষ্ঠীর অন্তর্গত। তাঁদের রচনার বিষয় একটিমাত্র, রাধাকৃষ্ণের লীলা। এই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ব্যক্তিগত প্রতিভা অনুসারে কেউ বড়, কেউ ছোট। এটুকু ছাড়া ব্যক্তিনির্ভরতার আর কোন লক্ষণ দেখা যায় না। আগে বলেছি যে ইংরেজি রোমান্টিক পর্বদ্বয় অত্যন্ত স্বল্পায়ু ছিল। বৈষ্ণব রোমান্টিক পর্বও খুব দীর্ঘায়ু নয়, তবে ঠিক কত বৎসর নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না। হাতে লেখা তুলোট কাগজ একমাত্র নির্ভর। বঙ্গদেশের গবেষণাবিরোধী কীটসমূহ ষড়যন্ত্র করে ঠিক সালের অঙ্কটি কেটে বসে থাকে ; আর সমস্তই আছে গ্রন্থকার বা পুঁথির লেখক, কবে কোন্ বারে কোন্ তিথিতে কোন্ ঘরে কোন্ মুখ হ'য়ে বসে পুঁথি লিখলেন বা নকল করলেন সমস্তই আছে, কেবল বছরের অঙ্কটি বছরের সঙ্গে লীলা সাঙ্গ করেছে। এই কীটজ অনাচারের ফল যে সব সময়ে অশুভ হয়েছে তা নয় ; ঐ কীটদষ্ট রন্ধ্রপথে পরবর্তী গবেষকগণের কল্পনা প্রবিষ্ট হ'য়ে গবেষণার চূড়ান্ত করবার সুযোগ পেয়েছে। তাই নিশ্চয় ক'রে কাল নির্ণয় সম্ভব নয়, তবে খুব সম্ভব আবেগের পূর্ণ উচ্ছ্বাসের কাল পঞ্চাশ বছরের বেশি নয়। তারপরেও অবশ্য পদাবলী রচনা চলেছে, কিন্তু তখন "যে প্রচণ্ড গতি অবসান।" ঐ সব পদাবলী রচনা ও পদাবলী কীর্তন তখন বৈষ্ণব সাধনার অঙ্গ হ'য়ে পড়েছে। সে আলোচনা করতে গেলে সাহিত্যের আসর ছেড়ে ধর্ম-সাধনার আঙিনায় প্রবেশ করতে হয়। সেটা আমার বিষয় বহির্ভূত।

রোমান্টিক প্রেরণা ক্ষীণ হয়ে এলো, তবে আদৌ ক্ষীণ হল না বাংলা সাহিত্যের ধারা। মঙ্গলকাব্য বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ, সেই সঙ্গে ধরা উচিত রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতির অনুবাদ। মঙ্গলকাব্যকারগণ না ক্লাসিকাল না রোমান্টিক। এঁরা সকলেই রিয়ালিষ্ট। এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ও রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। দীর্ঘকাল ধরে শত শত মঙ্গলকাব্য লিখিত হয়েছে, মায় কপিলামঙ্গল ও ঢেঁকিমঙ্গল। এঁরা বর্তমানকালে জন্মগ্রহণ করলে দমে ভারী উপন্যাস রচনা করতেন, আর পূজার সময়ে সম্পাদকদের সঙ্কটত্রাতারূপে দেখা দিয়ে দু'মাসের মধ্যে ১০।১২ খানা উপন্যাস নামাতেন। একটা কথা মনে করিয়ে দি, এইসব অগণিত মঙ্গলকাব্য কোন না কোন পালপার্বণ উপলক্ষে রচিত ও গীত হ'তো। কাজেই বাংলাসাহিত্যে পূজা সংখ্যা প্রকাশের ইতিহাসের সূত্রপাত বর্তমান কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করা উচিত হবে না।

তা না হয় নাই হল, কিন্তু রোমান্টিক সাহিত্যের ধারা গেল কোথায়? আগে বলেছি রোমান্টিক সাহিত্যের ধারা অনেক সময়ে ক্ষীণ হ'য়ে আসে, একেবারে লোপ পায় না। তিলত্তোমাসম্ভবের প্রকাশ ১৮৬০ সালে। তার আগে রোমান্টিক সাহিত্যের সেই ক্ষীণ ধারাটির সন্ধান কোথায় পাওয়া যাবে। খুব সম্ভব গ্রামাঞ্চলে লোকগাথার মধ্যে পাওয়া যাবে। ময়মনসিংহগীতিকা ও পূর্ববঙ্গগীতিকা রোমান্টিক ভাবাশ্রিত সন্দেহ নাই। কিন্তু এদের জনকত্ব ও কাল সন্দেহাতীত নয়। ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে এই সব গাথার একমেটে রূপ এখনো গীত হয়ে থাকে বলে শুনেছি, কিন্তু রূপ নিয়েই তর্ক। অনেকের সন্দেহ কলকাতার উপকণ্ঠে কোথাও দোমেটে করা হ'য়েছে—"হাতেতে সোনার ঝারি বর্ষা নেমে আসে"—নিতান্তই রাবীন্দ্রিক। যাই হোক আমরা এক মেটেতেই সন্তুষ্ট; কারণ তার মধ্যে প্রবাহিত রোমান্টিক কাব্যের ক্ষীণ ধারাটি। তার পরে নিধুবাবুর গানগুলিকে রোমান্টিক ছাড়া আর কি বলবো। নিধুবাবু দীর্ঘজীবী ব্যক্তি ছিলেন, কাজেই মধুস্থদনের সময়ে এসে পড়া গেল। বিদ্যাসাগর-মধুস্থদন থেকে নব্য বাংলা সাহিত্যের স্থত্রপাত। মধুস্থদনের তিলোত্তমাসম্ভব থেকে স্থত্রপাত বাংলা সাহিত্যে নব্য রোমান্টিকতার। এটাই আমাদের প্রধান আলোচ্য পর্ব। এই পর্বটাকে অনেকে বঙ্গদেশের রেনেসাঁস বলে থাকেন, কেন বলে থাকেন জানি না। রেনেসাঁসের অভিধান-গত অর্থ পুনর্জীবন লাভ বা পুনর্জাগরণ। কিন্তু ইউরোপের ইতিহাসে এর একটি বিশেষ অর্থ আছে। বঙ্গদেশ তথা ভারত সম্বন্ধে এই ঐতিহাসিক মাপকাঠি প্রযোজ্য নয়। তবে যদি বলা হয় যে ইংরাজি শিক্ষা ও ইংরাজি ভাষার খাত দিয়ে নূতন এক জীবনবোধ আমাদের চিত্তক্ষেত্রে এসে পৌঁছেছিল তবে ভুল হয় না, তবু আংশিক সত্যের বেশিও হয় না। উনবিংশ শতকের দুই বাঙালী মনীষী পুরুষ রামমোহন ও বিদ্যাসাগর কারো মন ইংরাজি প'ড়ে তৈরি হ'য়ে ওঠেনি; রামমোহনের মন আরবি ফরাসী পড়ে, বিদ্যাসাগরের মন সংস্কৃত পড়ে তৈরী হ'য়ে উঠেছিল; ইংরেজি তাঁরা বেশি বয়সে শিখে নিয়েছিলেন। অন্য সব মনীষীদের সম্বন্ধে একথা খাটবে না, তাঁদের শিক্ষা ইংরেজি দিয়েই স্থরু হয়েছিল। ইংরাজি শিক্ষা সম্বন্ধে তখন একটা নিদারুণ মোহ দেখা দিয়েছিল। প্রথাগত পাণ্ডিত্যের অধিকারী বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র সংস্কৃত কলেজ ছেড়ে হিন্দু স্কুলে ভর্তি হ'য়েছিলেন, অনেকটা পিতার অমতে। ইংরাজি শিক্ষা বাঙালীর

চিত্তক্ষেত্রে একটা গভীর পরিবর্তন ঘটাচ্ছিল। ডাক্তার টমাস নামে একজন ক্ষ্যাপা পাদ্রী স্বীকার করেছেন যে ধর্মপ্রচার করে একটিমাত্র লোককে খ্রীস্টান করতে সমর্থ হ'য়েছিলেন, সেটাও ধর্মের আকর্ষণে নয়, ডাক্তারি বিদ্যা দিয়ে অসুখ সারাবার কৃতজ্ঞতা বোধে। ডাক্তার টমাস কুড়ি বছরে যা পারেন নি, ইংরেজি শিক্ষা তার অনধিক কালে তার বেশি পেরেছিল। অনেক মেধাবী ছাত্র খ্রীস্টান হ'য়ে গিয়েছিল সত্য, কিন্তু যারা খ্রীস্টান হয়নি নূতন বিদ্যা ও নূতন বোধ তাদের মনে ওলট পালোট ঘটিয়ে দিয়েছিল। একে যদি কেউ রেনেসাঁস বলতে চান তবে সেটা হবে সাধারণ অর্থে; ঐতিহাসিক অর্থে নয়। ইংরাজী শিক্ষার লাঙলের তীক্ষ্ণফলা বাঙালীর মনের জমাট বাঁধা পতিত জমিকে নূতন ফসল উৎপাদনের যোগ্য করে তুল্‌ল। উর্বরতা অবশ্য জমিতেই ছিল, নূতন ফসলের বীছল কতক এলো বাইরে থেকে, কতক দেশজ। এই নূতন ফসলের প্রথম কারবারী (রঙ্গলালের কথা ছেড়ে দিলে) মধুসূদন। এখানে নূতন ও পুরাতনের রেখাটি সুচিহ্নিত। ১৮৫৯ সালে পুরাতন আমলের প্রধান কবি ঈশ্বরগুপ্তের মৃত্যু, আবার নূতন আমলের প্রথম কাব্য ( নাটক বটে ) মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা রচিত। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় "একজন খাঁটি বাঙালী কবি, আর একজন ডাহা ইংরাজ"; তাঁর মতে ঈশ্বর গুপ্ত শেষ খাঁটি বাঙালী কবি; তিনি আরও বলেছেন খাঁটি বাঙালী কবি আর হওয়া সম্ভব নয়, হয়ে কাজ নেই। খাঁটি বাংলা সাহিত্যের জন্য যে-সব ব্যক্তি ( অধিকাংশই অসাহিত্যিক ) এখনো মাঝে মাঝে আক্ষেপ করে থাকেন এই মন্তব্যটি তাদের জন্যই উদ্দিষ্ট।

মমুসূদনের তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য আমাদের অন্যতম আলোচ্য। এতদিন রোমান্টিক কাব্যের যে ক্ষীণ ধারা লোকচক্ষুর প্রায় অগোচরে প্রবাহিত হচ্ছিল, তিলোত্তমায় তা স্পষ্টভাবে প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করলো। কেউ যেন মনে না করেন কাব্যখানির উৎকর্ষ আমার লক্ষ্য। মোটেই নয়, কাব্যখানি অত্যন্ত কাঁচা, কাব্যগত মূল্য নয়, ঐতিহাসিক মূল্যের জন্যই একে গ্রহণ করেছি।

রোমান্টিক সাহিত্যের নিত্যকারণ ও নিত্যলক্ষণের উল্লেখ আগে করেছি, আবার করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। নিত্যকারণ সামাজিক বিপ্লব। এক্ষেত্রে ইংরাজি ভাষাগত শিক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞান সেই পরিবর্তন ঘটালো। ইংরাজি শিক্ষার ফলেই মধুসূদনের পক্ষে বলা সম্ভব হ'ল—"I hate Rama and his rabbles"; রসিককৃষ্ণ মল্লিক বলতে পারলেন—"I do not believe in

the sacredness of the Ganges", আর ডিরোজিওর ছাত্রগণ পরিচালিত Athenaeum পত্রিকায় লিখিত হ'তে পারলো "If there is anything we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism". সামাজিক বিপ্লব আর কাকে বলে! এ গেল নিত্য কারণ। আর নিত্য লক্ষণগুলিও একে একে প্রকট হ'তে লাগলো। প্রেম, প্রকৃতি, সৌন্দর্য্য, আনন্দ ও বিস্ময়রস বিভিন্ন কাব্য অবলম্বনে আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করলো। কাব্য অর্থে এখানে গদ্য ও পদ্য দুই। আগে কোথাও বলেছি সামাজিক ভূকম্পনে ভূগর্ভ দ্বিধা হ'য়ে গেলে অনেক সময় অপ্রত্যাশিত রত্নরাজি প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে। এখানে কোথায় সেই রত্নরাজি? নব্য বাংলা সাহিত্য সেই রত্নরাজি, যার মধ্যে থেকে রোমান্টিক রসাশ্রিত তিনখানিকে বেছে নিয়েছি। আরও দুখানা আছে তবে সুর নীচু স্বরে বাঁধা। তবে এখানে মনে করিয়ে দেওয়া আবশ্যক ইংরাজি শিক্ষিত নব্য বাঙালী সমাজ কেবল ভাবোচ্ছ্বাসেই নবলব্ধ রোমান্টিক চেতনা নিঃশেষ করে দেয়নি, নূতন নূতন কর্ম এবং প্রতিষ্ঠানে রূপ দিতে চেষ্টা করেছে, সমস্ত যদি স্থায়ী না হ'য়ে থাকে মনে রাখতে হবে বঙ্গদেশ পলিমাটির দেশ এবং এখানকার একটি নদীর নাম কীর্তিনাশা।

তিলোত্তমাসম্ভব কাহিনী সুবিদিত। সুন্দ উপসুন্দ ভ্রাতৃদ্বয় তপস্যায় ব্রহ্মার বরে অজেয়, কেবল একটি রন্ধ্র ছিল, ভ্রাতৃভেদে মৃত্যু। দেবতারা স্বর্গ থেকে বিতাড়িত। দেবতাদের ভাগ্যে প্রায়ই এমন ঘটে থাকে, তারকাসুর, বৃত্রাসুর, সুন্দ উপসুন্দ সকলেই দেবগণকে স্বর্গ থেকে খেদিয়ে দিয়েছেন, তাদের যত বিক্রম মানুষের উপরে। ব্রহ্মা ও মহাদেব অপাত্রে বরদানে সিদ্ধহস্ত। তখন উপায়ের সঙ্গে অপায় অবলম্বন করতে হয়। এবারে অপায়রূপে তিলোত্তমাসম্ভব হল। অপূর্বসুন্দরী তিলোত্তমা সেই বনে গিয়ে উপস্থিত যার কাছে সুন্দ উপসুন্দর দরবার। সেখানে গিয়ে সুন্দরী তিলোত্তমা সুদক্ষ চিত্র তারকার মতো আসল উদ্দেশ্য গোপন রেখে কখনো ঝরণার জলে পা ডুবিয়ে বসে নিজের প্রতিবিম্ব দেখছে, কখনো প্রস্ফুটিত পুষ্পচয়ন করছে, আর বলা বাহুল্য ভাবছে কখন দৈত্য ভ্রাতৃদ্বয় আসবে তখনি ওস্তাদের মার দেখাতে হবে। বিশেষ বিলম্ব করতে হল না, সুন্দ উপসুন্দ একসঙ্গে তাকে দেখতে পেলো এবং এক সঙ্গে দুইজনে তার দুই হাত ধরে টানাটানি করতে শুরু করলো, দুজনেরই সমান

দাবী। ফলে ভ্রাতৃভেদ এবং যুদ্ধে দু'জনের পতন। দেবতারা আবার স্বর্গে গিয়ে কায়েম হ'লেন।

তিলোত্তমাসম্ভব মধুসূদনের প্রথম রচনা নয়, তবে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের রচনা বটে। অমিত্রাক্ষর তখনো কবির মিত্র হয়ে ওঠেনি, মেঘনাদবধ ও বীরাঙ্গনায় সেটা হবে। ফলে তিলোত্তমাসম্ভবে মধুসূদনের প্রতিভা আড়ষ্ট। তবে এখানে কাব্যের গুণাগুণের আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য প্রণয়াবেগের সংস্কারমুক্ত প্রকাশ। বাংলা সাহিত্যে এই বোধ করি প্রথম। এই উপলক্ষে বিদ্যাসুন্দর কাব্যের নাম মনে আসা স্বাভাবিক; তবে সেখানে কবি সংস্কারমুক্ত হ'তে পারেন নি; বিদ্যাসুন্দরের বিহারারম্ভের পূর্বে গান্ধর্ব বিবাহের একটা ভান করতে হ'য়েছে। তবু তার মধ্যে একটা বিদ্রোহের ভাব আছে বলে মনে হয়। রাধাকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক প্রেমের উল্টো পালা বিদ্যাসুন্দর কাব্যে। কবি গান্ধর্ব বিবাহের অভিনয়ে সমাজ ও সভাসদ্‌গণের মনস্তুষ্টি করে আপন প্রবল প্রতিবাদ স্থললিত নগ্নতায় প্রকাশ করেছেন।

সুন্দ উপসুন্দের বেলায় কোন কোন সংস্কার ও ভাবের অবলম্বন করেননি কবি। তর্ক উঠতে পারে, কাহিনীটা পৌরাণিক, কিন্তু কলমটা তো তৎকালীন, পাঠকবর্গও তাই। রোমান্টিক সাহিত্যের সংস্কারমুক্তি এখানে প্রবল প্রেমানুভূতি-রূপে দেখা দিয়েছে; দুই ভাই একই নারীর দুই হাত ধরে টানাটানি করছে; ভ্রাতৃবধ্‌ত্বের সংস্কার, পরনারী সম্বন্ধীয় সংস্কার কোথাও এতটুকু শিকড় বসাতে পারেনি। ফলে মৃত্যু। এর মধ্যে ব্রহ্মার বর, অর্থাৎ বরদান ও পরে অপায়দান নিতান্তই ছন্দকেই খাড়া রাখবার উদ্দেশ্যে। আসল কথা এই যে একান্ত রোমান্টিক আর্তি শেষ পর্য্যন্ত সুখের হয় না। "A thing of beauty is a joy for ever" যিনি অনভিজ্ঞ তরুণ বয়সে লিখেছিলেন, সামান্য কয়েক বৎসরের মধ্যেই অভিজ্ঞতার আঘাতে তাঁকে লিখতে হয়েছে—

"She dwells in Beauty, Beauty that must die,  
And joy, whose hand is ever at his lips  
Biding adieu··· ·  
Ay, in the very temple A Delight  
Vail'd Melancholy has her sovran shine"

[ Ode on Melancholy ]

সৌন্দর্য্য মুমূর্ষু, সুখ বিদায় প্রার্থী, আনন্দের [ Delight ] মন্দিরে বিষাদের রাজাসন প্রতিষ্ঠিত। তবে সৌন্দর্য্য, সুখ, আনন্দ, সমস্তই কি বিষাদে পর্য্যবসিত! না, একটা মস্ত কথা কবি তখনো বোঝেননি, পরে বুঝতে পেরেছেন —"Beauty is truth, truth beauty"! সৌন্দর্য্য যতক্ষণ না সত্যে সমন্বিত হচ্ছে সৌন্দর্য্য, সুখ, আনন্দ সমস্তই বিষাদের কালগ্রাসে পতিত হয়। তাই A thing of Beauty is a joy for ever-এর পরিপূরক হ'ল গিয়ে "Beauty is truth, truth, beauty"!

ইংরেজ কবিদের মধ্যে দু'চার জন মাত্র এই চরম সত্যটা উপলব্ধি করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে বয়ঃকনিষ্ঠ কীটস্ অভিজ্ঞতায় গরিষ্ঠ। কিন্তু এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা পদ্মপত্রে শিশির বিন্দুর মতো সদ্যপাতী ছিল তাঁর মনে সেই জন্যই তিনি Romantic Agony থেকে রক্ষা পাননি।

রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রাণীর ও পরবর্তীকালের তপতী নাটকের বিক্রমদেবের একান্ত রোমাণ্টিক প্রেম সুখের হয়নি। স্বীকার না করে উপায় নেই যে মধুসূদনের কলমে প্রথম সংস্কার মুক্তি ব্যাপারটা crude হয়ে দেখা দিয়েছে, সেই সঙ্গে এটাও স্বীকার করতে হয় যে প্রণয়ের ক্ষেত্রে ( কাম বললেই যথার্থ হয় ) সংস্কার মুক্তির প্রথম প্রকাশ তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে, এখানেই নব্য বাংলা সাহিত্যে রোমাণ্টিকতার প্রথম পদক্ষেপ। আমাদের দ্বিতীয় উদাহরণ এই Romantic Agony আরও শিল্পসুন্দর ও দোষত্রুটিশূন্য হ'য়ে দেখা দিয়েছে।

ইংরেজ লেখক Watts Dunton-এর Renaissance of wonder বলে একখানি পুস্তিকা আছে। ( বঙ্কিমচন্দ্র একদা জিজ্ঞাসা করেছিলেন পুস্তক আর পুস্তিকায় প্রভেদ কি? সে প্রশ্নের সদুত্তর আজও পাওয়া গেল না। ) কলেজে পড়বার বয়সে বইটার বক্তব্য আমাকে চমকে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে আবিষ্কার করলাম Renaissance of wonder-এর শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত আমাদের ঘরেই আছে। রাতকানার চেয়ে হতভাগ্য ঘরকানা।

কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় বাংলা গ্রন্থ হ'লেও অনেকের মতে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। বঙ্কিমচন্দ্র বারোখানি মাত্র উপন্যাস লিখেছেন, সেগুলি আবার বিভিন্ন, রসের ও বিভিন্ন রূপের, তাই কোনখানিকে নিশ্চিতরূপে শ্রেষ্ঠ বলা সহজ নয়। কপালকুণ্ডলার মতো সম-রসের ও সম-রূপের উপন্যাস আর তিনি লেখেননি, কাজেই শ্রেষ্ঠ বলা সহজ। তবে গ্রন্থের গুণাগুণ বিচার যেহেতু এক্ষেত্রে গৌণ,

সে বিচারে অগ্রসর হওয়া নিষ্প্রয়োজন। আমাদের উদ্দেশ্য নব্য বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিকতার সূত্রপাতে কপালকুণ্ডলার স্থান নির্ণয়।

কপালকুণ্ডলা বিস্ময়রসের কাব্য। প্রাচীন সংস্কারের জীর্ণ পর্দা আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রামকে বিশ্বের বিস্ময়রস থেকে নির্বাসিত ক'রে রাখে। ঘটনাচক্রে সেই জীর্ণ পর্দা খ সে পড়লে কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়। আর তারাই যথার্থ রূপার পাত্র দেখেও মূল্য বুঝতে অক্ষম। শ্রীভগবান অর্জুনের প্রতি কৃপাপরবশ হ'য়ে তাকে বিশ্বরূপের বিস্ময় দেখিয়েছিলেন। অর্জুন বুঝেছিল। কৌরব সভায় শ্রীকৃষ্ণ যখন বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন হতভাগারা ব্যাপারটা magic বা জাদুবিদ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। কপালকুণ্ডলা গ্রন্থে এই দুই শ্রেণীর লোকই আছে, একজন প্রাচীন ব্যক্তি বলে কথিত আর একজনের নাম নবকুমার।

"প্রাচীন" ও নবকুমার নামদুটি তাৎপর্য্যপূর্ণ। দু'জনেই সমুদ্রদর্শন করেছিল ; প্রাচীনের কাছে সমুদ্র বিস্তৃত জলরাশি, তার উদ্দেশ্য পূণ্যার্জন। বিস্তৃত জলরাশিটাও তার চোখে পড়েছিল কিনা সন্দেহ, কেননা পরবর্তী যাত্রীদের মুখে শুনেছিল প্রতিবেশীরা তার সমস্ত জমির ধান কেটে নিয়ে গিয়েছে, নীলাম্বুরাশির স্থানে লোকটা পরহস্তগত স্বর্ণ ধান্যরাশি দেখছিল। এ সেই বুড়ীর জগন্নাথ দর্শনে গিয়ে অলাবু-সন্দর্শন। আর নবকুমার! সমুদ্রদর্শনে এসেছিল বলেই কৃপাপরবশ হ'য়ে সমুদ্র তাকে দেখা দিয়েছিল। বেচারা সাহিত্যিক নয়, কাজেই কালিদাসের শরণাপন্ন হ'য়েছিল। সমুদ্রদর্শনে বিস্ময়ের সূত্রপাত। প্রাচীন ব্যক্তি কেবল বয়সে প্রাচীন নয়, কালেও। ( প্রাচীন যুগে যখন আর্ত্তকে পুণ্যদান ছাড়া সমুদ্রের আর কোন গৌরব ছিল না, সেই কালের। ) এ সেই সেণ্ট ফ্রান্সিসের চোখ বেঁধে আল্পস পর্বত লঙ্ঘন। মহাপ্রভু জীবনের শেষ আঠারো বছর পুরীতে বাস করলেন অথচ তাঁর জীবনীকারেরা সমুদ্রে বিস্ময় দেখতে পেল না। কপালকুণ্ডলার প্রাচীন ব্যক্তি সেই প্রাচীন দলভুক্ত। আর নবকুমার নামটির সার্থকতা এই যে সে সত্যই নবযুগের সন্তান, যাদের চোখে সমুদ্র বিস্ময়ের রত্নাকর। এখানে নবকুমারের বিস্ময় দর্শনের সূত্রপাত মাত্র।

তারপরে কাপালিক দর্শন। সমুদ্রের ভয়ালরূপের ঘনীভূত মূর্তি কাপালিক দর্শনে অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের আঘাতে নবকুমার বিমূঢ় হ'য়ে পড়ে। কিন্তু সে বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই দেখা দিল সমুদ্রের সৌন্দর্য্যময়রূপের ঘনীভূত মূর্তি কপালকুণ্ডলা, নবকুমার বিস্ময়ে বিমুগ্ধ। সমুদ্র একাধারে ভয়াল ও সুন্দর,

কাপালিক ও কপালকুণ্ডলা সমুদ্রের পূর্ণ প্রতীক, ভয়াল সুন্দর, ভীষণ মধুর। প্রত্যেক কাব্যেই কিছু পরিমাণে বিস্ময়রসের মিশল থাকে, কিন্তু কপালকুণ্ডলা কাব্যে বিস্ময়রসটাই কাব্যের সমগ্র বিষয়। প্রথমে সমুদ্র, তারপরে কাপালিক, তারপরে কপালকুণ্ডলা; বিশ্বনাট্যের প্রযোজক নবকুমারের চোখের উপর থেকে একটার পরে একটা জীর্ণ সংস্কারের পর্দা সরিয়ে দিতে লাগলেন, আর নূতন নূতন বিস্ময় নিয়ে প্রকাশিত হ'য়ে পড়তে লাগলো। Brave new world! বহুকাল আগে একদা যে বিস্ময় দেখে stout hearted cortes নির্বাক হয়ে গিয়েছিল, হাতথেকে খসে পড়েছিল বন্দুক, নবকুমারের জন্য সেই বিস্ময় সঞ্চিত ছিল ঘরের কাছে রসুলপুরের নদীর চরে। তবে বিস্ময়ের এখানেই শেষ নয়। প্রাকৃতিক বিস্ময়ের সঙ্গে এবারে যুক্ত হ'তে চলল মানবিক বিস্ময়। আনাড়ি স্নানার্থীর ঘাড়ের উপরে সমুদ্রের ঢেউগুলো যেমন এসে প'ড়ে তাকে বিভ্রান্ত করে দেয় সেইরকম অবস্থা আজ নবকুমারের।

কপালকুণ্ডলার সঙ্গে সদ্য বিবাহিত নবকুমার যখন চলেছে মনে মনে ভবিষ্যতের সোনার ফসল কাটতে কাটতে, তখন ভগ্ন শিবিকার অভ্যন্তর থেকে প্রশ্নের উত্তরে শুনতে পেলো আমি কপালকুণ্ডলা নই, তবে দস্যুহস্তে সম্প্রতি নিষ্কুণ্ডলা। নবকুমার সে মুহূর্তে বুঝতে পারেনি যে, বিস্ময় ডাকিনীর কবলস্থ হতভাগ্য এতক্ষণ কাটছিল সোনার ফসল নয়, সোনার মরীচিকা। সুপরিচিত কাহিনীর বিশ্লেষণ অনাবশ্যক। উদ্দাম বাসনা যেমন সুন্দ উপসুন্দকে মৃত্যুতে না নিয়ে গিয়ে ছাড়লো না, বিস্ময়রসের মধ্যে যে হলাহল সঞ্চিত ছিল শেষ মুহূর্তে ফেনায়িত হয়ে উঠে করাল ফণায় জড়িত ক'রে অতলে তলিয়ে নিয়ে গেল নবকুমার-কপালকুণ্ডলাকে। বিস্ময়রসের মধ্যে এই আর্তিটুকু আছে বলেই মানুষের মনকে এমন ক'রে নাড়া দেয়, নতুবা তা, উচ্চস্তরের জাদুবিদ্যা মাত্র হ'য়ে থাকতো। এই আর্তি রোমান্টিক সাহিত্যের প্রধানতম লক্ষণ। এই জন্যেই অনেকের মতে রোমান্টিক সাহিত্য স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়, মুক্তার মতো শুক্তির একপ্রকার রোগ। রোমান্টিক সাহিত্যে সেই পূর্ণতার দৃষ্টি নাই, সোফোক্লিস সম্বন্ধে কবি যাকে বলেছিলেন—

"Who saw life steadily and saw it whole."

রোমান্টিক সাহিত্যিকের মধ্যে যাঁরা চূড়ান্তভাবে শ্রেষ্ঠ এই হলাহল পান করেও তাঁরা জীবিত; তাঁরা সাহিত্যের নীলকণ্ঠ।

সমাজবিপ্লবের যজ্ঞাগ্নি থেকে উদ্ভূত দ্রৌপদী যে সর্বধ্বংসী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কারণ। তবু সমস্ত জেনেশুনেও মানুষ মণির লোভে ফণীর মুখে হাত বাড়ায়, নক্রসঙ্কুল সমুদ্রে মুক্তার লোভে ঝাঁপ দেয়, সমুদ্রের চক্রবাত্যায় পাল তুলে দিতে দ্বিধা করে না magic casement এর আড়ালে অপরূপিণী যেখানে অপেক্ষা ক'রে আছে। সেইজন্যেই ঘাটের বন্ধনচ্ছেদ আবশ্যক। এই বন্ধনই তো সংস্কার। সংস্কার ছিন্ন হ'য়ে গেলে তবে তো মানুষ প্রেমের মধ্যে অতলস্পর্শী আহ্বান শুনতে পায়, বিস্ময়ের পর্দাগুলো উঠে গেলে চরাচর ও মানবের অসীম রহস্য দেখতে পায়, আর পূর্বাপর হিসাব বিস্মৃত হ'য়ে সৌন্দর্য্যের নীলাব্ধিতে ঝাঁপ দেয়, কূল যদি বা না পায় অন্ততঃ তল পাবে তো। সেটারও শেষ পরিণাম সাংসারিক বিচারে সুখের নয়। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা পরিণাম করুণ এই রকম একখানি কাব্য।

চিত্রাঙ্গদা কাব্যের গুণাগুণ ব্যাখ্যা যদি আমাদের উদ্দেশ্য হ'তো তবে প্রমথ চৌধুরী লিখিত চিত্রাঙ্গদা বিষয়কে প্রবন্ধটির নাম উল্লেখ করলেই কর্তব্য শেষ হ'তো, ওর চেয়ে উৎকৃষ্টতর আর কোন আলোচনা লিখিত হয়নি বাংলা ভাষায়। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র, আর সেটা কি পাঠকে এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন।

সুখের বিষয় কবিগুরু খঞ্জ প্রায় অনুগামীর মনের কথা বুঝতে পেরে চিত্রাঙ্গদা কাব্যের সূচনায় আমার কাজ সহজ করে দিয়ে গিয়েছেন। তিনি লিখেছেন— "হঠাৎ আমার মনে হ'ল সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তা হ'লে সে তার স্বরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিষ, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য।" এখানেও সেই কথা, সৌন্দর্য্যের মধ্যে তৃপ্তি নেই, যে সৌন্দর্য্য কেবল মাদনিক, কেবল বাসন্তিক. তার পরিণাম সুখকর তো নয়ই, এমন কি শুভকরও নয়। তবু তো মানুষ সৌন্দর্য্যের জন্য পাগল; যে দ্রষ্টা তার চেয়েও বোধ করি বেশি পাগল যে আধার। শিকারীর চেয়ে কস্তুরী মৃগ যে বেশি উদ্ভ্রান্ত নয় কে বল্‌ল।

চিত্রাঙ্গদা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্য নয়, পরবর্তীকালে পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে লিখিত কাব্যগুলি আরও পরিণত, তবে তাদের বিষয় স্বতন্ত্র, প্রায় সমস্ত গুলিরই উপজীব্য লোকধর্ম ও নিত্যধর্মের দ্বন্দ্ব, ধর্মের এই দুই রূপের মূল্য

নির্ণয় চেষ্টা। চিত্রাঙ্গদার উপজীব্য সৌন্দর্য্য। কুরূপা চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের চোখ ভোলাতে পারেনি সেই ক্ষোভে মদন ও বসন্তের শরণাপন্ন হ'য়ে বৎসর কাল ভোগ্য অপরূপ সৌন্দর্য্যবতী হ'য়ে উঠে অর্জুনের চোখ ভোলালো, মন ভোলালো, ঘটল তাদের মিলন। তারপরে বুঝতে পারলো তাকে অবলম্বন ক'রে ভোগ করছে আর একজন, তখন সে ধিক্কারে ধার করা বেনারসী শাড়ীর সৌন্দর্য্য ফিরিয়ে দিয়ে আটপৌরে বসনে স্বরূপ উদ্ঘাটিত করলো অর্জুনের সম্মুখে। মুক্তি পেলো সৌন্দর্য্যছলনার অপমান থেকে। সৌন্দর্য্যে তৃপ্তি নেই এই কথাটি বুঝতে অনেক গ্লানি অতিক্রম করতে হ'য়েছে রাজপুত্রীকে। কাব্যখানির শেষ রাত্রি অংশে চিত্রাঙ্গদার নারীরূপের পরিচয়, আর সূর্য্যোদয় অংশে আসন্ন মাতৃত্বের মধ্যে পূর্ণতর পরিচয়। এখানে শকুন্তলা নাটকের শেষ অঙ্কের প্রতিধ্বনি। তবেই দেখা গেল সৌন্দর্য্যে তৃপ্তি নাই, এই উপলক্ষ্যে উর্বশীর শেষ শ্লোকটি স্মরণীয়। কপালকুণ্ডলা, তিলোত্তমায় বন্ধনহীন কামনার মৃত্যু; বিস্ময়ের বিশ্বরূপ দর্শনে উদ্‌ভ্রান্তি, আর চিত্রাঙ্গদায় মদন-বসন্ত প্রদত্ত সৌন্দর্য্যে অতৃপ্তি। কামনা, বিস্ময় ও সৌন্দর্য্য যখন সামাজিক পটভূমিকে অতিক্রম ক'রে অতিশয় হয়ে ওঠে ডিঙিয়ে যায় তখন কল্যাণকে। রোমান্টিক সাহিত্যের মূলে এই Contradiction. "যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।" যা তার আকাঙ্ক্ষার বিষয় তাতেই তার মৃত্যুর বিষয়। একেই বোধ করি Romantic Agony বলা হ'য়েছে।

তিলোত্তমাসম্ভব, কপালকুণ্ডলা ও চিত্রাঙ্গদা কাব্য অবলম্বনে নব্য রোমান্টিকতার পদক্ষেপের আলোচনা করলাম। কিন্তু মাঝখানকার দু' খানি কাব্য নিয়ে গোলে পড়লাম; বাদ দিতেও পারি না আবার আমার পরিকল্পনার সঙ্গে মেলাতেও পারি না। স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য রূপকচ্ছলে কবির আত্মকথা।* এটা রোমান্টিক কবিতার একটি লক্ষণ। ওয়ার্ডস্বার্থ, শেলী, কীটস্, বায়রণ, রবীন্দ্রনাথ সকলেই এই শ্রেণীর কাব্য লিখেছেন। তাঁদের মতোই দ্বিজেন্দ্র-

* নন্দনপুর থেকে বিলাসপুর, বিষাদপুর, রসাতল, সমরপুর প্রভৃতি হয়ে শান্তিপুর প্রয়াণের বিবরণ। এই কাব্যের আলোচনাকালে প্রিয়নাথ সেন বলেছেন কোন কবিস্বভাব ব্যক্তির মানসিক ইতিহাস এই কাব্য। কিন্তু এই কবিস্বভাব ব্যক্তি যে দ্বিজেন্দ্রনাথ তার প্রমাণ কাব্যের মধ্যেই আছে।

নাথেরও সারথি কল্পনা। কিন্তু তাঁর ভাষা এত সংযত, ছন্দ এমন সরল, চিত্রগুলি এমন অচল অটল রেখায় অঙ্কিত, কাব্যখানি পড়তে পড়তে বোধ হ'তে থাকে অতিশয় সুকুমার ও শীতল শ্বেত পাথরে খোদাই করা। ঐ শীতলতাই পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেয় এখানা পূর্বোক্ত তিনখানি কাব্যের সগোত্র নয়— ঐ যে আগে বলেছি এদের মধ্যে গাঁইয়ের মিল থাকলেও গোত্রের মিল নেই। বিশেষ যে Agony রোমান্টিক কাব্যের নিত্যলক্ষণ তারও অভাব। আর একখানি কাব্য বিহারীলালের সারদামঙ্গল। এ যেন কাব্যের নীহারিকা। রবীন্দ্রনাথ থেকে মোহিতলাল কেহই ধারাবাহিক অর্থসন্ধান করে পাননি। রোমান্টিক কাব্যের চরম পরিণতি মিষ্টিসিজমে। একটি ধাপ অতিক্রম ক'রে শেষ ধাপে পৌঁছতে হয়। সারদামঙ্গল ভাবের আবেগে মাঝখানকার ধাপটি এড়িয়ে গিয়ে একেবারে শেষ ধাপে উপনীত হ'য়েছেন। বাংলা সাহিত্যে সারদামঙ্গল কাব্যই বোধকরি একমাত্র মিষ্টিকরসের কাব্য। ব্লেকের কাব্যের অনেকাংশ এখনও অবোধ্য, বিহারীলাল তো তুলনায় সেদিনকার শিশু।

গোড়ায় কোথাও বলেছি যে সমাজের মধ্যে যখন রোমান্টিক আবেগ সঞ্চারিত হয় কাব্য রচনাতেই তা নিঃশেষ হ'য়ে যায় না। সমাজে তো শুধু কবি নেই, আছে নানাশ্রেণীর কর্মী, একটি বৃহৎ ভাবের প্রেরণায় তারাও কর্মের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে চেষ্টা করে। সব কাব্য যেমন সফল হয় না, সব কর্মও তাই। নিষ্ফল কর্ম হয়তো নিষ্ফল বলেই ঐতিহাসিকের কাছে অধিকতর বরণীয়। ইতিহাসের পাতায় এমন কর্মের সংখ্যা অল্প নয়। স্যার ওয়াল্টার র‍্যালির আমেরিকার উপনিবেশ স্থাপনের ব্যর্থ প্রয়াস, আর্ল অব্ এসেক্সের হঠাৎ আয়রল্যাণ্ডের শাসন ভার পরিত্যাগ ক'রে লণ্ডনে এসে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলবার

"বিলাসপুরে ভূপতি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে কবি আত্মপরিচয় দিয়াছেন—
ভাতে যেথা সত্য হেম, মাতে যেথা বীর,
গুণজ্যোতি হরে যেথা মনের তিমির।
নব শোভা ধরে যেথা সোম আর রবি,
সেই দেব নিকেতন আলো করে কবি ॥"

ইহা স্পষ্টতই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের বিবরণ দেব নিকেতন অর্থে দেবেন্দ্রনাথের ভবন, অন্যান্য ব্যক্তিগণ কবির ভ্রাতা।

ব্যর্থ চেষ্টা, এসমস্তই কর্মের রোমাণ্টিক রূপক পরিণাম শোচনীয়। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে চিরাগত মাস ও বারের নামগুলো পরিবর্তন, এ-ও রোমাণ্টিক কর্মের রূপান্তর, বেশীদিন টিকল না। ইংলণ্ডের রোমাণ্টিক কবিদের মধ্যে যাঁরা Lake poets বলে পরিচিত, সুদূর আমেরিকায় গিয়ে তাঁদের pantisonaly নামে নূতন সমাজ স্থাপনের পরিকল্পনা মনোরম কবি কল্পনা মাত্র। ভূমধ্যসাগরের কোথাও একটা অনধ্যুষিত দ্বীপে শেলীর বসবাসের ইচ্ছা, কিম্বা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধীন ভারতের কোন দেশীয় রাজদরবারে চাকুরি গ্রহণের ইচ্ছা একমাত্র রোমাণ্টিক কবির পক্ষেই সম্ভব। ইংরেজ কর্মী জাত, উপরের সব কর্ম বা কর্মেচ্ছা ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত।*

আমরা বাঙালী। ভাবালু বলে আমাদের দুর্নাম। ভাবালু না বলে ভাবগ্রাহী বলা উচিত, দু'য়ে প্রভেদ মাত্রাগত। যে রোমাণ্টিক যুগের কথা এতক্ষণ বললাম, তার মূলে ভাবগ্রাহিতা, নানা উৎস থেকে এই সব ভাবধারা এসে তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজে একটি বৃহৎ ভাবের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল, সাহিত্যে তার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হলেও সেই ভাবোচ্ছ্বাস শুধু সাহিত্য রচনা করেই ক্ষান্ত হয়নি। ক্ষুদ্র বৃহৎ, অকালে গত, দীর্ঘজীবী, অফলা ও বহু ফলপ্রসূ অনেক কর্মের অনুষ্ঠান আরব্ধ হয়েছিল তখন। সমস্তই বেহিসাবের ফসল, যা নাকি রোমাণ্টিকতার ধর্ম। চিত্রাঙ্গদা রচনাকাল ১৮৯২ সাল—সেটাই আমাদের বর্তমান আলোচনার স্বনির্দিষ্ট সীমা, কিন্তু মনে রাখতে হবে, যে ভাবগ্রাহিতা থেকে চিত্রাঙ্গদার সৃষ্টি, তার তো তখনি সমাপ্তি ঘটেনি, পরবর্তী দীর্ঘকাল ধরে সাহিত্যের নানা শাখা প্রশাখার মধ্যে দিয়ে নিজেকে সার্থকতর করেছিল, কিন্তু তাতেও তার প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয় নি। সাহিত্যকে অতিক্রম করে বিচিত্রতর কর্মের ভিতর দিয়ে আপন সীমা ও শক্তির সন্ধান করে চলেছিল। কিছু উদাহরণ দেওয়া আবশ্যক। যাকে আমরা স্বদেশী আন্দোলন বলি তার আরম্ভ ও শেষ সুস্পষ্ট নয়। তবে কাজ চালাবার উদ্দেশ্যে ১৯০৫ এবং ১৯০৮ এই দুটো সালকে গ্রহণ করা যেতে পারে। ১৯০৫ সালে ভাবের আন্দোলন, কোথা থেকে কিভাবে একটা ভাবের জোয়ার এলো, যে-সব নৌকা দীর্ঘকাল জীর্ণ অবস্থায় ডাঙায় ঠেকেছিল হঠাৎ তার মাঝি দাঁড়িরা 'জয় মা বলে ভাসা তরী' চীৎকার

* বোধ করি একমাত্র সার্থকতার দৃষ্টান্ত ১৮৩২ সালের Reform act.

ক'রে তীরের কাছি খুলে দিল। রামকৃষ্টপুরের রেলের কুলিদের কাছে চাঁদা তুলে এসে অবনীন্দ্রনাথ বললেন, রবিকা, এ যে হ'য়ে গেল; রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন হ'য়ে গেল বইকি। বস্তুতঃ কিছুই হয়নি, কেবল উদ্যোক্তরা মনের মধ্যে একটা মুক্তির উল্লাস অনুভব করেছিল। তখন কেবল সদলবলে আনুষ্ঠানিক গঙ্গাস্নান, রাখীবন্ধন ও কোলাকুলি, গান দিয়ে প্রাণ জাগাবার প্রয়াস, এ হওয়া নয়, আবার না হওয়াও নয়। এর যা কিছু মূল্য ভাবগত। তারপরে ১৯০৮ সালে বোমা ফাটলো, মানিকতলার বাগানে বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হ'ল— শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ ৪৬ জন রাজদ্রোহিতার অপরাধে বিচারার্থ প্রেরিত হ'লেন। কেবল স্বদেশী গান গেয়ে ইংরাজকে তাড়ানো যাবে না, তার জন্যে বোমাবন্দুক পিস্তলের প্রয়োজন। ১৯০৫ সালের ভাবালুতা দৃঢ়তর ভূমিতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তবু এ রোমান্টিক বই নয়। এর সঙ্গে তুলনীয় নেপোলিয়ানিক শাসনের অবসানে উত্তর ইটালীর একদল ভাবগ্রাহীর অষ্ট্রিয়ার শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা, যার মধ্যে বায়রণ জড়িয়ে পড়েছিলেন। এ ১৮২০ সালের কথা। অষ্ট্রিয়ার শাসন পাশ থেকে মুক্তির জন্য রীতিমতো যুদ্ধের প্রয়োজন হয়েছিল—তখন বোধ করি ১৮৫৯ সাল। মানিকতলার বোমাতে ইংরাজ শাসনের দুর্গ ভাঙেনি, তবে দেশবাসীর ভ্রান্ত ধারণা ভেঙে গিয়েছিল, তাদের ভাবটা এই যে তাহলে বাঙালীর দ্বারা এ-ও সম্ভব। একে রোমান্টিক প্রেরণাজাত বলেছি। আনন্দ-মঠের সঙ্গে মানিকতলার বাগানের সম্বন্ধ খুব কষ্ট কল্পনা নয়। সেদিন যে সব সন্তান মনীষীর কল্পনায় মাত্র ছিল আজ তাদের ঝাপসা রেখায় দেখা পাওয়া যেতে লাগলো। গান্ধী আন্দোলনের সঙ্গে এর প্রভেদটা বেশ স্পষ্ট, একটা ভাবগত, একটা কর্মগত। চরকায় সুতো কাটা, কোন একটা উপলক্ষ্যে জেলে যাওয়া—এর মধ্যে রোমান্সের নেই। আমি একদা মানিকতলার বোমার দলের বিশিষ্ট একজন দ্বীপান্তরিত নেতাকে শুধিয়েছিলাম, আচ্ছা দাদা, আপনারা গোটাকত সাহেব মেরে কি ভাবে দেশ স্বাধীন করবেন ভেবেছিলেন। আমার সরল প্রশ্নের তিনি সরল উত্তর দিয়েছিলেন, আরে ভাই, তখন কি অত হিসাব করেছি। হঠাৎ দেখলাম জোয়ার এসে নৌকা ভাসিয়ে তুলেছে, দড়ি দড়া খুলে পাল তুলে দিলাম, কোন্ ঘাটে ভিড়বে, কি আঘাটায় গিয়ে বানচাল হবে ভাববার মতো মনের অবস্থা ছিল না*। এই হচ্ছে কর্মের রোমান্টিক মূর্তি।

* ৺উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আর একটি উদাহরণ, ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা। বিদ্যালয় নয় আশ্রম। বিদেশী শিক্ষা চলবে না, দেশীয় শিক্ষা চাই; সেই দেশীয় শিক্ষার আদর্শের সন্ধানে তাঁর কবি-কল্পনা চলে গেল কোন অনির্দিষ্ট অতীতের অনির্দিষ্ট তপোবনে। এই তপোবনের আদর্শ রবীন্দ্রনাথ প্রধানত পেয়েছেন কালিদাসের রঘুবংশ কাব্য থেকে।* কালিদাস এক্ষেত্রে রিয়ালিষ্ট, তপোবনের মনোরম চিত্র তিনি অঙ্কিত করেছেন রঘুবংশ কাব্যে, কিন্তু তপোবন স্থাপনের চেষ্টা করেননি, কারণ তিনি জানতেন এ তপোবন নিছক কল্পনাশ্রয়ী। কিন্তু সমকালীন রোমান্টিকতার প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে তপোবন প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করলেন, ভুলে গেলেন তপোবন একটি মনোরম কবি-কল্পনা মাত্র। রবীন্দ্রনাথের "প্রাচীন ভারত" এবং শেলীর Hellas-এর অস্তিত্ব রোমান্টিক কল্পনার বাইরে কোথাও নাই। তুলনায় বায়রণের গ্রীস বাস্তব, যার স্বাধীনতা উদ্ধারের আশায় তিনি প্রাণদান করলেন। শেলী জীবিত থাকলে পরিণত বয়সে Hellas-এর কুজ্‌ঝটিকা মুক্ত হ'তেন কিনা জানিনা, তবে "প্রাচীন ভারতের" কুজ্‌ঝটিকা ফিকে হ'য়ে এলেও তার মোহ সম্পূর্ণ কাটেনি রবীন্দ্রনাথের মন থেকে।**

এই সময়ে একই প্রেরণায় ও একই কারণে কলিকাতায় স্থাপিত হ'ল জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ। উদ্দেশ্য জাতীয় শিক্ষা চাই। উদ্যোক্তাগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অন্যতম। তবে তখন তিনি নব প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন আশ্রম নিয়ে ব্যস্ত, কাজেই আলগোছে লেগে রইলেন মাত্র। তাছাড়া জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রধান ঝোঁক কারিগরি শিক্ষার দিকে। এই পরিষদ কালক্রমে Bengal Technical Inst. হ'য়ে বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। রোমান্টিক প্রেরণা কেবল শিক্ষা ও রাজনীতির মধ্যেই আবদ্ধ থাকলো না, ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করলো, এমন দুটি প্রতিষ্ঠানের নাম মনে পড়ছে, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল। সেই মিলে প্রস্তুত লাল পেড়ে মোটা কাপড় বাল্যকালে পরেছি।

* দ্রষ্টব্য—তপোবন প্রবন্ধ, (শান্তিনিকেতন ; ২য় খণ্ড) সতীশচন্দ্র রায় রচিত গুরুদক্ষিণা গ্রন্থের কবিলিখিত ভূমিকা।

** আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, ১১শ খণ্ড, পঃ বঙ্গ সরকার সংস্করণ—দ্রষ্টব্য : প্রবন্ধ ১, আষাঢ় ১৩৪৩ (১৯৩৬) ; প্রবন্ধ ৪, আশ্বিন ১৩৪০ (১৯৩৩)॥

পরবর্তী কালের খদ্দরের মোটা ধুতির মতোই মোটা ছিল দেশাত্মবোধক গৌরবের চিহ্ন। আজ সে মিল আছে কিনা, কি অবস্থায় আছে, কাদের হাতে আছে জানি না। আর একটি প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড পারমাসিউটিকাল ওয়ার্কস। আজ মস্ত ব্যাপার। কিন্তু এর স্বচনার ইতিহাস যাঁরা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের কলমে পাঠ করেছেন কখনো ভুলতে পারবেন না যে সারাদিনের চেষ্টায় এক শিশি জোয়ানের আরক বিক্রি করতে পারলে উদ্যোক্তাগণ মনে করতেন দিনটা সার্থক হ'ল। অর্থাৎ এর স্বচনা ব্যবসায়িক নয়—রোমাণ্টিক। শান্তিনিকেতন আশ্রম ও বেঙ্গল কেমিক্যাল দুয়েরই প্রতিষ্ঠা ১৯০১ সালে।

এসব বাস্তব উদাহরণ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে বাঙালীর চিত্তে রোমাণ্টিক প্রেরণা কেবল ভাবোচ্ছ্বাসেই আপনাকে নিঃশেষ করে দেয়নি, বাস্তব সিদ্ধিও লাভ করেছিল। এই বাস্তব সিদ্ধিলাভের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ দেখা যাবে পূর্বতন রোমাণ্টিক যুগে যার মূল প্রেরণা এসেছিল চৈতন্যদেবের দিব্য জীবন থেকে। সংক্ষেপে বলতে গেলে নূতন করে বৃন্দাবনের পত্তন। তার ফলে বৃন্দাবন আজ ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে ভক্তজনের হৃদি বৃন্দাবনে পরিণত।

এখানেই আমাদের কথা শেষ। কথাটা ছিল নব্য বাংলা সাহিত্যে রোমাণ্টিকতার স্বত্রপাত। কিন্তু কথা শেষ হ'য়েও ফুরোয় না। দীপ নিভে গেলে থাকে তেলের স্বগন্ধ, স্বর্য্য ডুবে গেলে থাকে গোধূলির আলো। বক্তব্য শেষ হ'য়ে গেলে থাকে শ্রোতাদের দাবী। আরম্ভ করেছিলাম এই বলে যে ইংরাজি সাহিত্যের মতোই বাংলাসাহিত্য মুখ্যত রোমাণ্টিক। এখানে মুখ্যত অর্থে শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ ইংরাজি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশ রোমাণ্টিক। এবারে শ্রোতা প্রশ্ন করতে পারেন শেক্সপীয়ারের আমল থেকে উনিশ শতক এই দীর্ঘ কালের মধ্যে কেবল ২৫+২৫ পঞ্চাশটি বছর মাত্র শ্রেষ্ঠ অংশ, তিনশ বছরের মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ বছর। এ কেমন শ্রেষ্ঠত্ব? এ প্রশ্নের উত্তর অলঙ্কার যোগে দেওয়া সহজ। প্রদীপটা যত বড়ই হোক, তার শিখাটি এতটুকু, আর সেটাই তার শ্রেষ্ঠ অংশ। দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, চৈতন্যোত্তর রোমাণ্টিক যুগ অনতি দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর হ'তে পারে, কিন্তু মধুস্বদনের সময় থেকে যে রোমাণ্টিক যুগের স্বত্রপাত তার অন্ত্যসীমা রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর দিগন্ত, আশী বছর কাল, কিছু দীর্ঘ হল না? কেন হ'ল? সব প্রশ্নের যে

সদুত্তর থাকবেই এমন কথা নেই, থাকলেও আমার না জানা থাকতে পারে। আর ইংরাজি রোমাণ্টিক পর্বদ্বয়ের চেয়ে আমাদের দ্বিতীয় পর্বটা যদি দীর্ঘতর হয় সেটা কি আমাদের সৌভাগ্য নয়। তাছাড়া আরও এক কারণে আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই, যেহেতু এই আলোচনার বিষয়টা হচ্ছে রোমাণ্টিকতার স্থত্রপাত। যথাসাধ্য সে কাজ করেছি, তুলনার্থ ইংরাজি সাহিত্যে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে যেটা, একরকম অনধিকারজাত দুঃসাহস। আশা রইলো ভবিষ্যতে কোনো স্থযোগে রোমাণ্টিকতার স্থত্রপাত থেকে অধঃপাত পর্যন্ত আলোচনা করা যাবে।

কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি ন্যায়তঃ ধর্মতঃ বাধ্য। পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে যে কয়টি রোমাণ্টিক পর্ব দেখা দিয়েছে তাদের যোগফল খুব দীর্ঘ নয়। কিন্তু অপরপক্ষে যে সাহিত্য স্থিতাবস্থাকে স্বীকার করে নিয়েছে তুলনায় তাদের দৈর্ঘ্য অনেক বেশি। অথচ দেখা যায় যে রোমাণ্টিক পর্বের কবিদের মহিমা স্থিতাবস্থার অধিকাংশ কবিদের চেয়ে মহত্তর। রোমাণ্টিক পথ দৈর্ঘ্যে কম, কিন্তু তার শ্রেষ্ঠ কবিদের শ্রেষ্ঠতা স্থিতাবস্থার দৈর্ঘ্য স্বীকার করে নিয়েছে যে সব কবি তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। এমন হেরফের কেমন করে সম্ভব হ'ল, আর এ কী স্বভাব-বিরুদ্ধ নয়।

যুক্তির পুঁজি যার অল্প সিদ্ধান্ত প্রমাণের উদ্দেশ্যে অনেক সময়ে তাকে অলঙ্কারের আশ্রয় নিতে হয়। যুক্তি অলঙ্কার নয় তবে অনেক সময়ে যুক্তি বলে চালিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয়। ভূপৃষ্ঠে অধিকাংশই সমতল, মাঝে মাঝে উচ্চ গিরিমালা, অনেক সময়েই চিরনীহার ভূষিত। এ একটি ভৌগোলিক সত্য। ঐ সমতল ভূমিখণ্ড জোগাচ্ছে মোটা ভাত কাপড়, আশ্রয় দিয়েছে জনপদকে, তৃষ্ণার পানীয়ও তার দান। প্রয়োজনের মাপকাঠির বিচারে উত্তুঙ্গ গিরিমালা অনাবশ্যক প্রায়। তাই বলে তার মহিমা ও আকর্ষণ কম নয়। মানুষ প্রাণ হাতে করে আরোহণ করে তার চূড়ায়। শুধু কি তাই। ঐ উত্তুঙ্গ গিরিশিখরের চিরহিমানী যে অজস্র ঝরণা ঝরিয়ে দিচ্ছে সমতলে এসে সেগুলো নদী। সেই নদী জোগাচ্ছে পানীয়, সেই নদী ফলাচ্ছে ফসল। সেই নদীর কল্যাণে সমতল মরুভূমি হ'য়ে যায়নি, হয়েছে উর্বর শ্যামল দ্রুমদল শোভিনী জনপদ। এহেন সমতলভূমিই ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশ। পাহাড় পর্বত আয়তনে স্বল্প হলেও তার মহিমা ও সৌন্দর্য্য সমতলের চেয়ে বেশি বই কম নয়। কিন্তু

শুধু তাই বা কেন ? চির হিমানী ঝরণা না ঝরালে সমতল কি সুখদ বাসযোগ্য হ'তে পারতো। অলঙ্কারকে আর বেশি দূর টেনে নেওয়া উচিত নয়। ঐ দীর্ঘায়ত সমতলভূমি হচ্ছে স্থিতাবস্থা স্বীকারের সাহিত্য। আর আয়তনে অত্যল্প দুর্বার দুরারোহ গিরিমালা হচ্ছে রোমাণ্টিক সাহিত্যের পর্ব। সাহিত্যের ইতিহাস এগুলো ভূকম্পনের ফল—মনুষ্য সমাজে মাঝে মাঝে যে অদম্য উচ্ছ্বাস আসে তার পরিণাম। স্বভাবতই তা ক্ষণস্থায়ী, ক্ষণস্থায়ী হ'লেও চিরস্থায়ী চিহ্ন রেখে যায়, নূতন নদী নির্ঝর নির্গত করে দিয়ে সমতলকে অধিকতর বাসযোগ্য করে তোলে। স্থিতাবস্থা স্বীকৃতির সাহিত্য মানুষের চিরকালীন আশ্রয়, রোমাণ্টিক সাহিত্য মানুষের গিরিলঙ্ঘন ; ক্ষণিক সত্য, তবু ঐ ক্ষণকালের মধ্যেই শ্বাসপ্রশ্বাসে নূতন বায়ু গ্রহণ ক'রে, নূতন প্রাণে নূতন আনন্দে নবজীবন লাভ করে ফিরে আসে সমতলে, সেই সমতল তখন তার পুরাতন নির্মোক খসিয়ে ফেলে নূতন বিস্ময়ে দেখা দেয় তার চোখে। মাঝে মাঝে রোমাণ্টিক সাহিত্যের পর্ব না এসে পড়লে স্থিতাবস্থা দুঃসহ মরুভূমি হ'য়ে যেতো।

# বাংলা রসসাহিত্য

বাংলাদেশের মাটিতে জল, বাতাসে জল, আকাশে জল, উত্তর ভারতের যাবতীয় নদনদীর জলপ্রবাহ বাংলাদেশের পথে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে, এদেশের তাল নারকেল খেজুর গাছের আগায় জল। এত জল, এত রস যে দেশে সে দেশের মানুষের মনের উপরে এর প্রভাব না পড়ে যায় না। এদেশের মানুষের মন কিছু অতিরিক্ত কোমল, অতিরিক্ত সরস। এদেশের আকাশে চাঁদ উঠেছে অথচ গাঁয়ে গাঁয়ে গান ওঠে নি এমন হতেই পারে না বলে মন্তব্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ। চাঁদ জলকেই টানে, মরুভূমি বা পাহাড়কে নয়। এখন এই সরস মাটি আর সজল আবহাওয়ার প্রভাব মানুষেব মনের মধ্যে দিয়ে হাত বাড়িয়ে তার সাহিত্য আর শিল্পকলাকে স্পর্শ করবে এ তো খুব স্বাভাবিক বলে মনে হয়। মাটি আর আবহাওয়া দেশের সাহিত্যকে গড়ে তোলে কিন্তু কি তার সুনির্দিষ্ট পন্থা বলতে পারি নে, খুব সম্ভব Natural selection বা প্রাকৃতিক নির্বাচনের অনুরূপ কোন একটা প্রক্রিয়া এক্ষেত্রেও আছে। কিন্তু এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যাই হোক্ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশের মাটি আর আকাশ-বাতাসের মত এদেশের সাহিত্যেও রসের প্রাধান্য! সাহিত্যের অন্য যে শাখা যা জ্ঞানগর্ভ, তথ্যভূয়িষ্ঠ, প্রমাণ প্রয়োগ, তর্ক আলোচনা, গবেষণা জিজ্ঞাসার খুঁটি ধবে ধরে যা সন্তর্পণে চলে—বাংলা সাহিত্যে তারও অভাব নেই। কিন্তু রস-সাহিত্যের তুলনায় পরিমাণে ও গুণে তা কম। বাংলা দেশেও শক্তমাটি, শুষ্ক নদীখাত, ও রুক্ষ প্রকৃতি আছে যাকে আমরা বলি উত্তর রাঢ়, কিন্তু সমগ্র বাংলা দেশের আয়তনের তা সামান্য ক্ষুদ্র অংশ। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির এই দুই রূপের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের এই দুই অংশ, রসসাহিত্য ও তথ্যভূয়িষ্ঠ সাহিত্যের রূপ যেন দেখতে পাই।

অথচ এমন হওয়ার কথা নয়। বাংলা গদ্যের গোড়ার দিকে রামমোহনের বলিষ্ঠ বাহু, জ্ঞানগর্ভ রচনার দিকে মোচড় দিয়েছিল গদ্য সাহিত্যকে। তিনি সর্বপ্রথম বেদান্ত প্রভৃতি দুরূহ শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ করে গৌড়ীয় ব্যাকরণ রচনা করে জ্ঞানের দিকে ভাষার পথ সুগম করে দিয়েছেন—বাঙালীর মনীষাকে

আহ্বান করেছেন কঠিন গবেষণার দিকে, কঠোর জ্ঞান চর্চার পথে। কিন্তু দেখা গেল যে তার চেয়েও শক্তিশালী বাংলাদেশের প্রকৃতি, হয়তো বা বাঙালী-সমাজেরও প্রকৃতি। রামমোহনের মৃত্যুর ত্রিশ বছরের মধ্যেই সাহিত্যের প্রবাহ জ্ঞানের কুল ছেড়ে রসের কুল ঘেঁষে বইতে শুরু করল। শুষ্কজ্ঞানের কূলে রামমোহনের স্বহস্তনির্মিত গ্রানিট পাথরের ঘাট শূন্য পড়ে রইল। তার পর থেকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বাংলা রসসাহিত্যের ইতিহাস বললে নিতান্ত অন্যায় হবে না।

বাংলা গদ্যকে যিনি গ্রাম্যতার উর্ধ্বে উঠিয়ে সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশক্ষম শিল্প করে তুললেন সেই পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর রসসাহিত্য সৃষ্টি করবার সুযোগ পান নি। তবু তাঁর দুই ক্ষুদ্র রচনাকে রসসাহিত্য পর্যায়ের বলা চলে। একখানি হচ্ছে তাঁর অসম্পূর্ণ আত্মচরিত। আর একখানি নাম প্রভাবতী সম্ভাষণ। প্রভাবতী নামে তাঁর স্নেহের পাত্রী একটি শিশুর মৃত্যুতে এই বীরহৃদয় যে বেদনা অনুভব করেছিল তারই সুবিন্যস্ত প্রকাশ এই রচনায়। মানবপ্রেমিক মহাপুরুষ মানুষের হাতে যে লাঞ্ছনা বিড়ম্বনা সহ্য করেছিলেন তার একমাত্র সান্ত্বনা ছিল ঐ নিষ্পাপ সরল শিশুর সান্নিধ্যে। তাও যখন অকালে গেল কেঁদে উঠল এই গরুড় হৃদয়। প্রভাবতী সম্ভাষণ মৃত্যুঞ্জয় গরুড়ের বুকফাটা ক্রন্দন। বইখানার আরও প্রচার বাঞ্ছনীয়।

রসসাহিত্যের রসবস্তুটা হচ্ছে লেখকের মনের দীপ্তি বা হাসি। ও বস্তু যেখানে গড়ে সেখানে আলো ফুটে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের মনের হাসি ছড়িয়ে আছে তাঁর সমগ্র সাহিত্যে, তুচ্ছতম ছত্রটি, নীরসতম বিষয়টিও ঝলমল করছে আলোয়। সূর্যের আলো যেখানে পড়ে সেখানেই আভা, তবু স্ফটিকের উপরে তার প্রভা প্রবল। বঙ্কিম সাহিত্যের সেই বিপুল স্ফটিক হচ্ছে কমলাকান্তের দপ্তর। এ ত্র্যম্বকের পুঞ্জীভূত অট্টহাসি নয়, বীরহৃদয়ের তুষারীভূত অশ্রু। আর তার উপরে পড়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের মনের হাসি। কতরকম বিপরীত গুণের সমন্বয়ে রচনাটি বিচিত্র। তুষারের বাইরে ঠাণ্ডা, ভিতরে তাপ; বস্তুটা চোখের জল অথচ উত্তরীয় জড়িয়েছে হাসির; বস্তুত কোমল, ঘটনাচক্রে কঠিন। বেদনায়, ব্যঙ্গে, হাসিতে, রসিকতায়, মনীষায়, পাগলামিতে, নেশায়, দিব্যদৃষ্টিতে এমন জড়িত এই রচনাটি যে একে কোন নির্দিষ্ট পর্যায়ভুক্ত করা সহজ নয়। এ নিতান্তই একক যার জুড়ি নেই বাংলা সাহিত্যে। আর পৃথিবীর সাহিত্যের

যতটুকু খবর রাখি তাতেও পাই না এর জুড়ির সন্ধান। সত্য কথা বলতে কি বঙ্কিমচন্দ্র একটি ক্ষুদ্র আঞ্চলিক ভাষায় লিখেছিলেন বলেই তাঁর প্রতিভা সঙ্কীর্ণস্থানে আবদ্ধ রয়ে গেল—নইলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তাঁর স্থান। আর তাঁর পরিকল্পিত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কমলাকান্ত যে একাধারে কবি মনীষী, পাগল নেশাখোর, দেশপ্রেমিক ও দার্শনিক তারও স্থান হ্যামলেট, ফলস্টাফ ও ডন কুইকসট প্রভৃতি বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে একাসনে। বঙ্কিমচন্দ্রের রসকল্পনা তুঙ্গ স্পর্শ করেছে কমলাকান্তের দপ্তরে।

বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের পালামৌ ভ্রমণ একখানি বিস্ময়কর গ্রন্থ। মুখ্যত বইখানা পালামৌ অঞ্চলের ভ্রমণ কাহিনী কিন্তু ভ্রমণটাই এখানে সবচেয়ে তুচ্ছ। আজকের দিনে ভ্রমণের মধ্যে একটা ত্বরা আছে. কিন্তু এখন থেকে ৮০।৯০ বছর আগে রেললাইন থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে ঠেলাগাড়িতে, পাল্কিতে, গোরুর গাড়িতে চলতে হত। তখন ভ্রমণে ত্বরা ছিল না বলেই আনন্দ ছিল আর আনন্দ ছিল বলেই লেখকের চোখে তার গুরুত্ব ছিল। এই আনন্দময় ধীর পদচারণার কার্য পালামৌ ভ্রমণ কিম্বা এ যেন ভ্রমণ সেরে এসে ঘরে বসে রয়ে সয়ে আপন মনে ভ্রমণ-সুখের রোমন্থন। এতে কবিত্ব আছে, মানুষ ও প্রকৃতি সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য আছে, চরিত্রচিত্রণ ও দৃশ্যচিত্রণ আছে আর সবচেয়ে বেশী করে আছে অলস কল্পনার আকাশে মনের যথেচ্ছ ঘুড়ি ওড়ানো। রবীন্দ্রনাথ কি সাধে অনুরাগী ছিলেন বইখানার। পালামৌ-ভ্রমণ বাংলা রসসাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

রবীন্দ্রসাহিত্যে পৌঁছবার আগে আরো দুখানি গ্রন্থের সামান্য পরিচয় দেব। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিত একখানি অমূল্য পুস্তক। বইখানা যদিও শেষবয়সে লিখিত কিন্তু ঘটনাকাল তাঁর জীবনের প্রথম দিক, যখন আধ্যাত্মিক চেতনা শুরু হয়েছিল। একদিকে ধ্যানমনন, ধর্ম ব্যাকুলতা, আর এক দিকে বিচিত্র ঘটনার বিন্যাস—দুয়ে মিলে নিপুণ বুনুনি। বইখানা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে মহর্ষি সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করলে একজন প্রধান সাহিত্যিক হতে পারতেন।

কবি নবীন সেনের সুবৃহৎ 'আমার জীবন' আর এক ধরনের বই কিন্তু সমান সুখপাঠ্য। তিনি জীবনকে যেন বাঁকা কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখেছেন—সব জিনিস বড় হয়ে চোখে পড়েছে। তিনি সামান্য হাকিম কিন্তু ঐ বাঁকা কাঁচের কৃপায়

যেন লাটসাহেব হয়ে উঠেছেন। তাঁর এক হাতে আছে ভিতরের দিকে বাঁকা কাঁচ ( Concave ), অপর ব্যক্তিরা ছোট হয়ে চোখে পড়ছে। এইসব বিপরীত ও অপ্রত্যাশিত গুণের জন্য বইখানাকে Alice in wonderlandএর নূতন সংস্করণ বলে মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ লিখিত রসসাহিত্যের সামান্য পরিচয় দিতে হলে প্রমাণ সাইজের একখানা বই লিখতে হয়। রবীন্দ্রসাহিত্য—মানেই রসসাহিত্য—নীরস বা বিরস একটি ছত্রও বের হয় নি তাঁর কলমে, কেননা তা অসম্ভব। সূর্যকে ঘিরে যেমন সূর্যগোলক তাঁকে ঘিরে তেমনি একটা জ্যোতির, একটা রসের পরিমণ্ডল বিরাজ করত। তাঁর সমস্ত রচনা বিচিত্র উপাদানে গঠিত সত্য কিন্তু একটি উপাদান তাঁর সমস্ত রচনায় সাধারণভাবে বিরাজমান—সেটি হচ্ছে স্মিত প্রসন্ন হাসি। দুরূহ তত্ত্বালোচনায় হাজার মনী নৌকাখানাও ভাসছে স্মিত প্রসন্ন হাসির স্বচ্ছ স্রোতের উপরে, তাই তাকে সহজে নাড়ানো যায়, এত সহজে যে মনে হয় আদৌ ভারী নয়। একেই আলঙ্কারিকরা বলেছেন প্রসাদ গুণ, মনের প্রসন্ন হাসি।

প্রথম যৌবন থেকে শুরু করে শেষ বয়স পর্যন্ত দেশবিদেশে তিনি ভ্রমণ করেছেন। য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র থেকে শেষ বয়সের রাশিয়ার চিঠি, জাভা-যাত্রীর পত্র, পারস্যে প্রভৃতি ভ্রমণগ্রন্থ, সংখ্যা কম নয়, আলমারির একটা তাক ভরে যায়, অমূল্য রসের খনি। মানুষ তিন রকমে জগৎকে দেখে বইয়ের ভিতর দিয়ে, চোখ দিয়ে, আর মন দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীকে দেখেছেন চোখ দিয়ে আর মন দিয়ে, বর্ণনায় আর মননে পূর্ণ তরে ভ্রমণবৃত্তান্ত। কিন্তু সব ছাড়িয়ে উঠেছে মনের প্রসন্নতা, মনের হাসি। অন্ধকার খনির রত্নগুলোও স্রষ্টার মনের হাসি কেড়ে নিয়ে ঝলমল করছে।

দেশের মধ্যেও তিনি কম ভ্রমণ করেন নি, অসংখ্য চিঠিপত্রে আছে তার পরিচয়। পত্ররচনাও তাঁর হাতে মহৎ শিল্পে পরিণত হয়েছে, তার বুনন যেমন সূক্ষ্ম তার সুতোগুলো তেমনি বিচিত্র—আর এই সুতোয় ছড়ানো জীবনের অভিজ্ঞতার টুকরোগুলো যেমন উজ্জ্বল তেমনি গভীর। এই পত্রসাহিত্যের মধ্যমণি হচ্ছে ছিন্নপত্র, বোধ করি বাংলাসাহিত্যের সবচেয়ে সুখপাঠ্য গ্রন্থ। যদিও গদ্যে রচিত, তবু এ কাব্য, যদিও কাব্য তবু বাস্তবভূয়িষ্ঠ, এই পত্রগুলি বঙ্গ-সরস্বতীর ললাটে অক্ষয় পত্রলেখা। কবি নাম দিয়েছেন ছিন্নপত্র, চিঠির টুকরো

—কিন্তু এ ছিন্ন নয়, পদ্মানদী এদের অখণ্ডমাল্যে গ্রথিত করে তুলেছে। এই গদ্যকাব্যের নায়িকা পদ্মা, নায়ক স্বয়ং কবি। প্রকৃতি যে প্রকৃতি থেকেই এমন মানুষ হয়ে উঠতে পারে, রবীন্দ্রনাথ তা দেখেছিলেন কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের তপোবনের মধ্যে, আমরা আবার তা দেখতে পেলাম ছিন্নপত্রের পাতায়।

রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি আর ছেলেবেলা গতানুগতির অর্থে জীবনচরিত নয়, সন তারিখ নামধামের বালাই নেই তাতে। বাস্তবের আর কল্পনার টানা-পোড়েনে তৈরি উত্তরীয়খানা ডুবিয়ে তোলা হয়েছে প্রসন্ন হাসির রঙে—ভাঁজে ভাঁজে ইন্দ্রধনু খেলছে।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মোপদেশগুলি শান্তিনিকেতন নামে দুইখণ্ডে প্রকাশিত। এগুলি অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত। কেন বুঝতে পারি না। ধর্মোপদেশ হলেই নীরস হবে এমন একটা ধারণাই খুব সম্ভব এজন্য দায়ী। কিন্তু এ ধারণা যে সর্বদা সত্য নয়—তার প্রমাণ শান্তিনিকেতন গ্রন্থদ্বয়। সত্য যার কাছে নীরস নয়, মতের প্রকাশ তাঁর কলমে কখনই নীরস হতে পারে না। পাশ্চাত্য দেশে অনেক সাহিত্যিক ধর্মোপদেশ লিখে সাহিত্যের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেছেন, রবীন্দ্র-নাথের গ্রন্থগুলিও তাদের সঙ্গে সমান আসন পেতে পারে। তবে প্রভেদের মধ্যে এই রবীন্দ্রনাথের ধর্মোপদেশে গোঁড়ামি নেই, দৃষ্টির কৃপণতা নেই, নীরসতা নেই, প্রজ্ঞা আর অভিজ্ঞতা আর সরসতায় সর্বত্র সমান হৃদয়গ্রাহ্য। কোন একটি সাধারণ গুণের লক্ষণ দিয়ে যদি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক নির্ণয় করতে হয় তবে বলতে হয় ব্যক্তিত্বের এই জ্যোতিই সেই গুণ! রবীন্দ্রনাথের এই গুণ সুপ্রচুর ছিল বলেই রবীন্দ্রসাহিত্যে তা সর্বত্র উপস্থিত।

আর তিনজন মাত্র লেখকের নাম করবার জায়গা আছে যদিচ এখনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক অনেক। বলেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী।

বলেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রসরচনাগুলি প্রবন্ধ জাতের হলেও বিষয়ের গৌরবের চেয়ে বিষয়ীর গৌরবে সমৃদ্ধ। অলঙ্কার-সমৃদ্ধ ভাষা, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি আর সহৃদয়তা হচ্ছে এদের প্রধান গুণ। অল্পবয়সে বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু হওয়ায় বাংলা সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথ নব্যভারতের শিল্পগুরু বলে পরিচিত। কিন্তু বাংলাদেশে তিনি সাহিত্যে নূতন রীতির স্রষ্টা। তাঁর ঘরোয়া, জোড়াসাঁকোর ধারে, পথে বিপথে

প্রভৃতি গ্রন্থকে সাহিত্যের কোন পর্যায়ভুক্ত করতে হলে রূপকথা বলা যেতে পারে। আধুনিক ঘটনা ও বস্তুকে যে কলমের গুণে রূপকথায় পরিণত করা যায় তার প্রমাণ এই রচনাগুলি। রূপ আর কথা শিল্পী আর সাহিত্যিকের জোড় কলমে লিখিত হয়ে রূপকথায় পরিণত হয়েছে। এই রচনাগুলি যেন গ্রামোফোনের রেকর্ডে ধরে রাখা আঁচড়। পড়তে শুরু করলেই মনে হয় এ যেন একালের কণ্ঠস্বর নয় ; গুন্‌গুনিয়ে ওঠে বিস্মৃত যুগের পিতামহীদের গলা আর, পাল্কির হুম্পাহুমা, আর শিবাধ্বনির তরঙ্গ, আর নিভৃত গৃহ, আর স্তিমিত প্রদীপ আর ঘুমন্ত চোখে কাজলের দাগ, একসঙ্গে রূপ আর কথা। অবনীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করে গিয়েছেন নূতন যুগের রূপকথা। প্রমথ চৌধুরী জাত সমালোচক আর প্রবন্ধকার। তাঁর রচনায় সহৃদয়তা অপেক্ষা বুদ্ধির ধার বেশী। প্রত্যেকটি বাক্য যেন তলোয়ার খেলছে আর তার উপরে বুদ্ধির আভা প্রতিফলিত হয়ে ধাঁধিয়ে দেয়। চিন্তার প্রখরতার সঙ্গে ভাষার প্রখরতার এই সার্থক সহযোগিতা দেখবার মত ব্যাপার। ভাষার বাহুল্যহীন ক্ষিপ্রতা, ভাবের চমকপ্রদ অভিনবত্ব আর দুয়ের উপরে বুদ্ধির খরদীপ্তি তাঁর রচনার প্রধান লক্ষণ। এইসব লক্ষণ দিয়ে একটি নূতন উপাদান যোগ করে দিয়েছেন তিনি বাংলা সাহিত্যে।

এবার রসসাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ইদানীংকালে রসসাহিত্যের এক সরিক জুটেছে যার নাম হচ্ছে রম্যরচনা। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার বা চিন্তার মৌলিকতার বা অনুভূতির গভীরতার উপরে রসসাহিত্যের বনিয়াদ—বাইরে থেকে ওকে যতই চপল চটুল মনে হোক না কেন ওর বুনিয়াদ প্রশস্ত ও দৃঢ়। রম্যরচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভঙ্গীপ্রধান, ওর মূলে চিন্তার বা অভিজ্ঞতার বা অনুভূতির সত্য নেই। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে শুধু বাংলা সাহিত্যে নয় পৃথিবীর সাহিত্যের বাজারে আজ এই শ্রেণীর রচনার খুব প্রসার। এর কারণ মনে হয় সর্বজনীন শিক্ষার কৃপায় লেখক ও পাঠকের জ্ঞানের ব্যবধান কমে এসেছে। পাঠকে এখন আবিষ্কার করেছে যে সে লেখকের প্রায় সমান, কাজেই তার উপরে আর তেমন বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা নেই পাঠকের। লেখক দেখছে যে পাঠক প্রায় হাতছাড়া হওয়ার মতো, গুরুপাক কিছু দিলে হয়তো একেবারে হাতছাড়া হয়ে যাবে, তাই সে বয়স্ক ব্যক্তি যেভাবে ছোট ছেলেকে লজেন্স বিতরণ করে, সেই ভাবে দিচ্ছে রম্যরচনা। পাঠক ধরবার

আগ্রহে রম্যরচনায় লজেন্স বিতরণ এমন ব্যাপক হয়ে উঠেছে যে প্রকৃত রস-সাহিত্য কোণঠাসা হতে চলল। আশঙ্কা হচ্ছে এর পরে ভগবদ্গীতার, নিউটনের ও ডারউইনের গ্রন্থের রম্য সংস্করণ প্রকাশিত হবে। সর্বজনীন শিক্ষার প্রতিকূলতা না করেও বলা যেতে পারে যে আমরা যাকে স্থায়ীসাহিত্য বলি, রসসাহিত্য যার একাংশ—সর্বজনীন শিক্ষা তার অনুকূল নয়। হয়তো এই শিক্ষানীতির মধ্যেই কোথাও গলদ আছে। কিন্তু আর নয়, সাহিত্য থেকে শিক্ষানীতিতে এসে পড়েছি, এবারে থামবার সময় হয়েছে।

# সাহিত্যে অশ্লীলতা

সাহিত্যসৃষ্টির চেয়ে সাহিত্যবিচার কম কঠিন নয়। আমি তো মনে করি অনেক বেশি কঠিন। সৃষ্টি কার্যে সাহিত্যিক অনুপ্রেরণার দ্বারা চালিত বলে কাজটি বহুল পরিমাণে সহজসাধ্য; সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে নিয়ামক তার সচেতন চেষ্টা অর্থাৎ সাহিত্যিক নিজে কারো ইঙ্গিতে তাকে চালনা করে না ব'লে পা টিপে টিপে চলতে গিয়ে ভুলভ্রান্তি করে, কাজের দুরূহতা তখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারে। বড়দরের সাহিত্যিকের নাম অনেক মনে আসবে, বড়দের সাহিত্যবিচারক বা ক্রিটিকের নাম আঙুলে গণনীয়।

সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে সমস্যার অন্ত নেই, কতকগুলি তো চিরন্তন। সাহিত্য বলতে কি বোঝায়, কী তার ধরণ, কী তার উদ্দেশ্য ও আদর্শ এ সমস্তর শেষ বিচার বোধকরি কোন কালে হবে না। সাহিত্যে শ্লীল ও অশ্লীল একটি জটিল সমস্যা, তবে খুব প্রাচীন বলে মনে হয় না। বর্তমানে যে অর্থে আমরা সমস্যাটিকে বুঝি সেই যৌন আচরণ অর্থে কোন দেশের প্রাচীন সাহিত্যেই তাকে বড় আমল দেয়নি। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের মতে গ্রাম্যতাদোষ নিন্দনীয়। অবশ্য এই গ্রাম্যতাদোষের মধ্যে স্থলবিশেষে যৌন আচরণ পড়তে পারে। তবে বিস্তারিতভাবে যৌনআচরণ সেখানে লক্ষ্য নয়। এ সমস্যা বিশেষভাবে অর্বাচীন কালের। কেন এমন হ'ল অর্থাৎ প্রাচীনকাল এ বিষয়ে অসচেতন ছিল আর অর্বাচীন দলই বা কেন অতিচেতন অনুসন্ধানের যোগ্য। একটা স্থূল কারণ মনে হয় প্রাচীন যুগে সাহিত্য রচনা ও সাহিত্য পাঠ ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল আর সে পরিধির মধ্যে স্ত্রীলোক ও বালক ছিল না বললেই হয়। সেই পুরুষ লেখক ও পুরুষ পাঠকের যুগে অনেক কথা খোলাখুলি বলা সম্ভব ছিল। আর একটা স্থূল কারণ সে যুগে ছাপা বই ছিল না, সমস্তই পাণ্ডুলিপি। পাণ্ডুলিপি নকল করার সময় ও ব্যয়সাধ্য কাজেই সাহিত্য ভালো হোক মন্দ হোক, শ্লীল হোক অশ্লীল হোক সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতো। ছাপার যুগে অবস্থার সম্পূর্ণ বদল হয়েছে, বই এখন সুলভ সহজলভ্য, তার উপরে আবার কাগজ মলাট চালু হওয়াতে সুলভতর, সহজতরলভ্য হয়েছে। আরও

একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক বই এখন মস্ত ব্যবসায়। সরস্বতী এখন লক্ষ্মীর সঙ্গে আপোষ ক'রে নিয়েছেন। তাছাড়া এখন পাঠক বলতে কেবল পুরুষ বোঝায় না লক্ষ লক্ষ নারী ও কিশোর বোঝায়। অশ্লীলতা বিচারে নামলে দেখতে পাওয়া যাবে যে মুদ্রাযন্ত্র, পুস্তকের সহজলভ্যতা, ব্যবসায়িক স্বার্থ ও মিশ্র পাঠক সম্প্রদায় এমন একটি সমস্যাকে সৃষ্টি করেছে ভিন্নতর পরিবেশে যা আদৌ সমস্যা বলে গণ্য হ'তো না।

বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার আগে বিচার্য বিষয়ের সীমা সরহদ্দ সম্বন্ধে সজাগ হ'য়ে নেওয়া যাক।

আমাদের আলোচ্য সাহিত্যে অশ্লীলতা। আর অগ্রসর হওয়ার আগে সাহিত্য ও অশ্লীলতা এদের বিষয়ে ধারণা পরিষ্কার করে নেওয়া আবশ্যক। প্রথমে সাহিত্য। ব্যাপকার্থে যা কিছু ভাষায় লিখিত তাই সাহিত্য, সামান্য হ্যাণ্ডবিল ও বিজ্ঞাপনও সাহিত্য। তবে এত ব্যাপকতায় আমাদের প্রয়োজন নেই, কাজেই গণ্ডী ছোট করে নেওয়া যাক। ধর্মগ্রন্থও সাহিত্য। গীত-গোবিন্দকে অনেকে অশ্লীল মনে করেন (আমি করি না)। গীতগোবিন্দের মতো ধর্মগ্রন্থ অশ্লীল হোক বা না হোক এ বিচারে তাকে টানা চলবে না। লৌকিক সাহিত্য বিচারের মাপকাঠি ধর্মগ্রন্থ বিচারে অচল। এদেরই সমপর্যায়-ভুক্ত দেবদেউলের গাত্রে ক্ষোদিত নরনারী মিথুন চিত্র। হাল আমলে কেউ কেউ পলাস্তারা ক'রে এসব ঢেকে দেবার প্রস্তাব করেছেন। এসব চিত্র বা মূর্তি অশ্লীল হোক বা না হোক বিচারের সাধারণ মাপকাঠি এখানে চলবে না। তার-পরে হ'ল যৌন বিজ্ঞান গ্রন্থ। সব ভাষাতেই এ শ্রেণীর বই আছে। এসব বই শ্লীলও নয় অশ্লীলও নয়, বিজ্ঞান। যৌন তথ্যকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রকাশ করাই এদের উদ্দেশ্য। তা যদি করে তবে অভিযোগ করা চলে না, কারণ বিজ্ঞান রুচি নিরপেক্ষ। আর এক শ্রেণীর গ্রন্থ আছে যা বিজ্ঞানের নামে, ধর্মের নামে বা সাহিত্যের নামে যৌন তথ্যকে প্রচার করে। এ সাহিত্য বিজ্ঞান বা ধর্মগ্রন্থ কিছুই নয়, নিছক ব্যবসায়। এসব বইয়ের লেখক বা প্রকাশক অন্য যে কোন ব্যবসায়ে নামতে পারেতো, যে কারণেই হোক অন্য ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ না ক'রে এই ব্যবসায় ধরেছে, হয়তো মূলধন কম লাগে বলেই সাহিত্যের বাজারে ভেজাল চালাতে শুরু করেছে। এখন এই তিন পর্যায়ের গ্রন্থ বাদ দিলে যা বাকি থাকে তাকে বোধ করি সাহিত্য

বলতে কারো আপত্তি হবে না। আমাদের এখানে বিচার্য বিষয় এই শ্রেণীর বই।

এবারে দেখা যাক অশ্লীলতা বলতে কি বোঝায়? বর্তমানে অশ্লীলতা শব্দের একমাত্র অর্থ দাঁড়িয়েছে অনাবৃত যৌন আচরণের বিবরণ। আর কিছু অশ্লীলতা শব্দের পরিধির মধ্যে পড়ে না। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ যাকে গ্রাম্যতা দোষ বলতেন তাকে আমরা অশ্লীলতা গণ্য করি না। তবেই দাঁড়ালো এই যে সাহিত্যে যৌন আচরণের বিবরণ এখানে আমাদের বিচার্য বিষয়।

সত্য কথা বলতে কি সাহিত্যে অশ্লীলতার চেয়েও যদি কিন্তু বেশী নিন্দনীয় থাকে তবে তা গ্রাম্যতা দোষ। এই গ্রাম্যতা দোষকেই বোধ করি ইংরাজিতে Vulgarity বলে। অথচ এ দোষের আমরা বড় নিন্দা করি না, হয়তো নিন্দনীয় বলেও মনে হয় না বরঞ্চ কারো কারো কাছে গ্রাম্যতার দুঃসাহসিক বর্ণনা প্রশংসার বিষয়। শ্রীকান্তের সমুদ্র যাত্রার প্রসঙ্গে জাহাজের খোলের মধ্যে ঝঞ্ঝামথিত নরনারীর বমন ও অন্য দুটি দৈহিক ক্রিয়ার বর্ণনা আছে। এ হলে-হতে-পারতো গ্রাম্যতা দোষ, তবে যে হয়নি তার কারণ শক্তিশালী লেখক হাসির তবকে মুড়ে বিষয়টিকে অতি আলগোছে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করেছেন। আবার মেঘনাদ বধ কাব্যের নরক বর্ণনায় দৈহিক স্বাভাবিক ক্রিয়া-গুলির বর্ণনা আছে। এসবও হ'লে-হ'তে-পারতো গ্রাম্যতা দোষ, তবে যে হয়নি, তার কারণ অলঙ্কার ও ছন্দের তবকে মুড়ে অতি আলগোছে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করেছেন লেখক। অনেক হাল পাঠকের বিচারে রবীন্দ্র সাহিত্য যে অসম্পূর্ণ ও অবাস্তব তার কারণ বমনাদি দৈহিক স্বাভাবিক ক্রিয়ার বর্ণনার অভাব। কিন্তু কোন কোন বর্তমান লেখক অত ছাপাছাপি পছন্দ করেন না, দৈহিক ক্রিয়ার স্বাভাবিক বর্ণনায় তাঁদের অস্বাভাবিক আনন্দ। এখন স্পষ্টত এ গ্রাম্যতা দোষ। আজকাল অশ্লীলতার নিন্দা শুনতে পাই, গ্রাম্যতা দোষের পাই না, বোধ করি এ শব্দটাই অনেকের অজ্ঞাত। আর আগেই তো বলেছি অশ্লীলতার চেয়ে নিন্দনীয় গ্রাম্যতা দোষ।

শক্তিশালী লেখকের হাতে গ্রাম্যতা দোষ কিভাবে ঢাকা পড়ে, জুগুপ্সাজনক বস্তু কিভাবে রসে পরিণত হয়, রসের মধ্যে এ বীভৎস রস, দেখা গেল। এবার দেখা যাক হ'লে হ'তে পারতো অশ্লীলকে কিভাবে রসে পরিণত ক'রে সুন্দর করে তুলেছেন।

চিত্রাঙ্গদা নাটকে এমন বিষয় আছে শাদা গদ্যে লিখিত হলে, যতই অলঙ্কারে আবৃত হোক সে গদ্য, স্থূল ও অশ্লীল হ'য়ে দেখা দিত। বিজয়িনী কবিতার নগ্ন নারী মূর্তি "a Privacy of glorious light"-এ আবৃত; কবি তাকে বসন দেননি, তবে ছন্দে ও মনোরম অলঙ্কারে এমনভাবে প্রচ্ছন্ন করেছেন যে শুধু কন্দর্পকে নয় পাঠককেও তার কাছে পরাভব স্বীকার করতে হয়। শকুন্তলা নাটকের তৃতীয় অঙ্ক আর একটি উদাহরণ সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ও দ্ব্যর্থবাচক কয়েকটি উক্তিতে কবির নাটকীয় অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়েছে। সর্বত্রই বিষয় রসে পরিণত, কোনখানে বীভৎস রস, কোনখানে মধুর রস। রসে উত্তরণ ঘটলে আর আপত্তি থাকতে পারে না, না ঘটলেই সমস্যা হ'য়ে ওঠে। একই বিষয় যেখানে রসে পরিণত হয়েছে আর যেখানে হয়নি এমন দুটি উদাহরণ নেওয়া যাক।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরকে রুচিবাগীশগণ সহ্য করতে পারেন না, তবে আশঙ্কা করা অন্যায় নয় যে, "বাল্যকালে লক্ষ্মীর মতো পক্ষার মাংস খাননি কে? ভবনদীর পারে গিয়ে বেড়াল বসেন আহ্নিকে।" কিন্তু এমন Moral ও Ethical কাব্য বাংলায় অল্পই আছে। (প্রমথ চৌধুরীর মতে বিদ্যাসুন্দরের প্রধান রস হাস্যরস আদৌ শৃঙ্গার রস নয়!) আসলে এ কাব্য রাধাকৃষ্ণের প্রণয় লীলার প্যারডি। প্রধান পদকর্তাদের হাতে সে প্রণয়লীলা যতই রসোত্তীর্ণ হোক কুকবিগণ তার যে বিকৃত রূপ অঙ্কিত করছিল এবং লৌকিক আচরণে ঐ নিত্য প্রণয় লীলার যে পঙ্কিল মূর্তি দেখা দিচ্ছিল ভারতচন্দ্র তাদেরই রসাঘাত করেছেন তখনকার দিনে আর কোন রকমে সমালোচনা করা সম্ভব ছিল না। এইজন্যই কাব্যখানাকে moral ও ethical বললাম। কবির মহৎ উদ্দেশ্য সত্ত্বেও কাব্যখানা অশ্লীল হয়ে উঠতে বাধ্য ছিল না, তা যে হয়নি তার কারণ যথোচিত ছন্দ ও অলঙ্কারের বিভূষণ। আনাড়ির হাতে অশ্লীল ও বীভৎস দুই হতে পারতো। হয়েছেও। ভারতচন্দ্রের অনুকরণে অনেকেই বিদ্যাসুন্দর কাহিনী লিখেছেন, কারো কাব্য রসোত্তীর্ণ হয়নি, সকলের কাব্যই অশ্লীল ও বীভৎস। রামপ্রসাদ সাধক কবি। অশ্লীলতা সৃষ্টি কখনোই তাঁর অভিপ্রেত হ'তে পারে না তৎ-সত্ত্বেও যে তাঁর রচিত বিদ্যাসুন্দর অশ্লীল ও বীভৎস, তার কারণ যে ভূষণে ভূষিত হ'লে বিষয় রস হ'য়ে ওঠে তা তাঁর পেটিকায় ছিল না। তাঁর নিন্দা করবার উদ্দেশ্যে একথা বললাম না তিনি যে চিন্ময় লোকে উঠেছেন সেখানে ভারতচন্দ্রের

প্রবেশ ছিল না। রামপ্রসাদ Spiritual, ভারতচন্দ্র moral; চিত্তশুদ্ধি একজনের উদ্দেশ্য, অপরজনের সমাজশোধন।

ছান্দোগ্যোপনিষদে একটি কাহিনী আছে যে দেবতারা একবার শত্রু ভয়ে আত্মগোপন করবার আশায় ছন্দের আবরণে নিজেদের প্রচ্ছন্ন করেছিলেন। এই কাহিনীর প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারলে আমাদের কাজে লাগবে। ছন্দ এমন একটি গুণ যাতে বস্তুগত রূপ ঢাকা পড়ে যায়। সেইজন্য কবিতায় অনেক বিষয়ের অনায়াসে অবতারণা সম্ভব। উপরে যেসব উদাহরণ দিয়েছি তাদের একটি ছাড়া সমস্তই ছন্দাবৃত। ন্যাড়া গদ্যে যা অশ্লীল বা গ্রাম্যতা দোষদুষ্ট হতে পারতো তা হয়নি। আজকাল গদ্যের পথটাই সাহিত্যের রাজপথ হ'য়ে ওঠায় অশ্লীলতার তর্ক এমন প্রাধান্য লাভ করেছে, কেননা ছন্দের আবরণের এখানে অভাব। যাঁরা শিল্প ও সাহিত্যকে জীবনের যথাযথরূপ কিম্বা দর্পণ মনে করেন তাঁদের কথা স্বীকার করা কঠিন। শিল্প ও সাহিত্য জীবনের যথাযথরূপ বা দর্পণ হ'লে কেউ হাতের কঙ্কণ দর্পণে দেখাবার উদ্দেশ্যে শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির অবান্তর কষ্ট স্বীকার করতো না, শিল্প ও সাহিত্য জীবনের পরিপূরক, যথাযথ রূপ নয়। জগতে তথা জীবনে দোষত্রুটি আছে তারই সংশোধন চলে সাহিত্যে। যা আছে তার সব যেমন প্রবেশ করতে পারে না, যা নাই তার আবার অনেক প্রবেশ করে; এইভাবে হাঁ-এ না-এ মিলিত হয়ে যে সাহিত্য সৃষ্ট হয়ে ওঠে তা জীবনের পরিপূরক যথাযথ নয়।

"পাখীরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান
তার বেশি করে না সে দান।
আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশি করি দান
আমি গাই গান।

ছন্দ ও অলঙ্কার (ছন্দও একপ্রকার অলঙ্কারে) এই পরিপূরকতা সৃষ্টিতে সাহায্য করে। শিল্পের উদ্দেশ্য কি? যথাযথ্য সৃষ্টি শিল্পের উদ্দেশ্য নয়, শিল্পের উদ্দেশ্য পূর্ণতা সৃষ্টির প্রয়াস। যথাযথ্যসৃষ্টি যেমন শিল্পের উদ্দেশ্য নয়, তেমনি আনন্দদান বা সৌন্দর্য সৃষ্টিও শিল্পের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। শিল্পের উদ্দেশ্য, এই মাত্র বলেছি, পূর্ণতা সৃষ্টির প্রয়াস। আগে বলেছি শিল্প জীবনের পরিপূরক, এখন বলছি শিল্প জীবনের পূর্ণতা। এ দুই কেবল শব্দে ভেদ, অর্থে এক, পরিপূরক হয়ে উঠে শিল্প পূর্ণতাকে লাভ করে। ছন্দ ও অলঙ্কার প্রভৃতি

পূর্ণতা লাভের সহায়। এই জন্যেই ছন্দহীন কবিতার পক্ষে ( গদ্য কবিতা ) উচ্চতম পর্যায়ের রচনা হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। শিল্পের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা এ প্রসঙ্গে অবান্তর নয়। কেননা, শিল্পের উদ্দেশ্য জানলে তবেই তার সঙ্গে অশ্লীলতার সম্বন্ধটি জানা সম্ভব। জীবনে যে বিষয় অশ্লীল অর্থাৎ অসুন্দর ( শ্লীলের মূল অর্থ বোধ করি সুন্দর ) শিল্পে তারও স্থান আছে। কিন্তু যেহেতু শিল্পে জীবনের পূর্ণতা বা পরিপূরকতা, মূলে যা অশ্লীল, সে বস্তু যখন শিল্পের পূর্ণ জগতে প্রবেশ করে তখন তাতেও পরিপূরকতা বা পূর্ণতা ঘটে ; মূলে যা অশ্লীল বা অসুন্দর তখন তা সুন্দর বা শ্লীল (শ্রীল ? অর্থাৎ শ্রীযুক্ত হয়ে ওঠে। সোজা কথায় বিষয় বা বস্তু রস হয়ে ওঠে। মনে রাখতে হবে যে নবরসের অন্যতম বীভৎস রস। ভুক্ত খাদ্য পাক যন্ত্রের সহায়তায় খাদ্যসারে পরিণত হয়। খাদ্য ও খাদ্যসারের মধ্যে যে সম্পর্ক ঠিক সেই সম্পর্ক শিল্পে বিষয় ও রসের মধ্যে। চরাচরে এমন বিষয় বা বস্তু নেই শিল্পে প্রবেশের অধিকার থেকে যা বঞ্চিত। কাজেই যাঁরা বলে যে, জীবনের সব বিষয়েরই শিল্পে স্থান আছে তাঁদের সঙ্গে এ পর্যন্ত মতে মেলে। তারপরেই মতে অমিল। অবাধ প্রবেশের নীতি আমিও মানি, সেই সঙ্গে মানি যে শিল্পজগতের নাগরিক অধিকার পেতে গেলে বিষয়ের রসে পরিণত হওয়া অত্যাবশ্যক এই Sea change-কেই বলে জীবনের পরিপূরকতা বা পূর্ণতা।

রচনার বিষয় রসে উত্তীর্ণ না হলে সাহিত্যে নানারকম দোষ দেখা দেয়। অনেক সময় অশ্লীলতা এই কারণ ঘটিত। যেমন রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ও বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। এখানে অক্ষমতাই কারণ। অনেক সময়ে আবার অশ্লীলতার কারণ থাকে লেখকের মনস্তত্ত্বের কোন দুর্বোধ্য কূট গ্রন্থির মধ্যে, দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে সুইফটের রচনায়, তবে এদের অশ্লীলতা না বলে গ্রাম্যতা দোষ বলা উচিত। আবার অনেক সময়েই অশ্লীলতা ইচ্ছাকৃত, সমরসেট মমের অনেক রচনা তার সাক্ষ্য। আর কিছু নয়, আরও কিছু বেশি পাঠক আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্য এই অতিরিক্ত গরম মশলাটুকু দেওয়া। তবে এখানে সাহিত্যের মধ্যে অশ্লীলতার প্রক্ষেপ। কিন্তু যেখানে অশ্লীলতার মধ্যে সাহিত্য প্রক্ষিপ্ত সেখানেই আপত্তিকর। আগেই বলেছি উদ্দেশ্যই একমাত্র মাপকাঠি যা দিয়ে শ্লীলতা অশ্লীলতার কাজ চলা গোছের বিচার সম্ভব। চূড়ান্ত বিচার আদৌ সম্ভবপর নয়।

সামাজিক অবস্থার প্রতিক্রিয়ার ফলে সাহিত্যে রুচির পেণ্ডুলাম বা দোলক দুলতে থাকে। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে তরজা খেউড় প্রভৃতি পালাগানের প্রতিক্রিয়া দেখা গেল দ্বিতীয়ার্ধের সাহিত্যে ; প্রতিক্রিয়া এবং সেই সঙ্গে সহায় ভিক্টোরীয় যুগের ইংরাজি সাহিত্যের ও ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব। সুনীতি অনেক সময়ে পিউরিটানিজম বা নীতিবাগীশতায় পৌঁছেছে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্র-সাহিত্যে নীতিবাগীশতা নেই, আছে মার্জিত রুচি ও সূক্ষ্ম শুচিতা বোধ। এখন আবার এ দুয়েরই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। মার্জিত রুচির প্রতিক্রিয়ার গ্রাম্যতাদোষ আর সূক্ষ্ম শুচিতা বোধের প্রতিক্রিয়ায় অশ্লীলতাদোষ। পেণ্ডুলাম আবার বিপরীত দিকে চলেছে।

এখন প্রশ্ন এই অবস্থার প্রতিকার কী? প্রতিকার প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ পেণ্ডুলামের আবার উল্টো দিকে ফিরে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। সে সময় সাপেক্ষ। অনেকে ততদিন অপেক্ষা করতে রাজি নন, তাঁরা আইন চান কিন্তু বিচারক কে হবে? বিচারের মাপকাঠি কী হবে? এত আইন থাকা সত্ত্বেও ভেজাল দূর করা যাচ্ছে না। আইন করে সুরা নিরোধ সম্ভব হচ্ছে না। আইন করে অশ্লীলতা নিবারণ সম্ভব হবে না। আইন তৈরি করতে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে যে ফাঁক দিয়ে চতুর অশ্লীলতা-ব্যবসায়ী বের হয়ে যাবে, মরতে মরবে নিরীহ সাহিত্যিক। তাছাড়া নীতি হিসাবেও আইন বাঞ্ছনীয় নয়। আগাছা মারতে ভিটেয় চাষ দেওয়া চলে না।

শুচিতা অবশ্যই প্রশংসনীয় তবে শুচিবায়গ্রস্ততা নয়, বিশেষ বর্তমান যুগে নয়। মিনিবসনা সুন্দরীদের পর্দায় নিত্য ইঙ্গিতগর্ভ অঙ্গভঙ্গী, পরিবার পরি-কল্পনার রসাল বিজ্ঞাপন, নরনারীর অবাধ কর্মক্ষেত্র, শালীনতার সীমা ঘেষা নারীদের পোশাক, এ যুগের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ। তারপরে মনে রাখতে হবে যে এ যুগের আর একটি প্রধান লক্ষণ যৌন অতৃপ্তি। এ সমস্ত সাহিত্যকে অবশ্যই প্রভাবিত করেছে এবং সৎ সাহিত্যেও অনেক সময়ে শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করে। তাই বলে আইন বাঞ্ছনীয় নয়, আইনের বলে প্রতিকার হলেও বাঞ্ছনীয় নয়—কিন্তু আইনের বলে প্রতিকার আদৌ সম্ভব নয়। জলাশয়ে যদি বা দু চারটে কুমীর ঢুকে থাকে তাই বলে জল সেচে জলাশয় শুকিয়ে ফেলা সুবুদ্ধির কাজ নয়। অতএব এ চেষ্টা থেকে নিরস্ত হতে হবে।

সাহিত্যে অশ্লীলতা সম্বন্ধে যাঁরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন তাঁদের মনে করিয়ে

দেওয়া আবশ্যক যে, অশ্লীলতার চেয়ে গুরুতর সমস্যা যদি কিছু থাকে, তবে তা সাহিত্যে গ্রাম্যতাদোষ। অশ্লীলতাও গ্রাম্যতা দোষের রকমফের। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে পৃথক একটি প্রবন্ধ লিখতে হয়—সে স্থান এখানে নেই, সে উপলক্ষও এটা নয়। শুধু এইটুকু মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, গ্রাম্যতাদোষ সম্বন্ধে অবিলম্বে সচেতন না হয়ে উঠলে এই দোষেই বঙ্কিম রবীন্দ্র উদ্দীপিত সাহিত্য আবার গ্রাম্যসাহিত্যে পরিণত হবে। সাহিত্যিক অশ্লীলতায় কোন পাঠকের ক্ষতি হয়েছে বলে জানিনে (কেউ অশ্লীল আচরণ শিখতে চাইলে সাহিত্যের বাইরে তার হাজার পথ খোলা আছে) কিন্তু গ্রাম্যতাদোষে পাঠকের মন ক্রমে স্থূল হ'য়ে পড়ে, তখন কোন আচরণকেই নিন্দনীয় মনে হয় না। অশ্লীলতায় ব্যক্তি মনের প্রতিফলন, গ্রাম্যতায় প্রতিফলন সামাজিক মনের। কোন্‌টি গুরুতর সমস্যা? সাহিত্যবুদ্ধির মধ্যে যে স্বাভাবিক সংযম বোধ আছে আর মার্জিত রুচির মধ্যে যে অর্জিত শালীনতা বোধ আছে তাদের মধ্যেই আছে অশ্লীলতা তথা গ্রাম্যতা দোষের সংশোধনের প্রতিকার।

# সাহিত্য আকাদামীর আদর্শ ও প্রচার

ফরাসী একাডেমীর আদর্শে পরবর্তীকালে অনেক দেশে একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের সাহিত্য আকাদামী প্রতিষ্ঠার মূলেও যে সে প্রেরণা আছে, যত ক্ষীণভাবেই থাকুক না কেন, কল্পনা করা অন্যায় হইবে না। কিন্তু ফরাসী একাডেমী ও সাহিত্য আকাদামীর প্রেরণার মূল্য সমান নয়। দু'য়ে প্রভেদটা খুব গোড়া-ঘেঁষা, সজীব ও জড়ের প্রভেদ। ফরাসী একাডেমী প্রতিষ্ঠার ইতিহাস প্রসঙ্গ ম্যাথু আর্নল্ড বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি লিখিতেছেন যে, ১৬২৯ সালের কাছাকাছি প্যারিসে কয়েকজন সাহিত্যরসিক ব্যক্তি ঘরোয়াভাবে মিলিত হইয়া সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিতেন। এই সংবাদটা শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সের রাজনৈতিক কর্ণধার কার্ডিনাল রিশলুর কানে পৌঁছাইল। তিনি উক্ত সাহিত্যরসিক সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহারা রাষ্ট্রানুমোদন লাভ করিয়া একটি সঙ্ঘে পরিণত হইতে চাহেন কিনা। সাহিত্যিকগণ অনেক ইতস্তত করিয়া অবশেষে রাজি হইলেন। ১৬৩৫-এ রাজানুমোদন ও ১৬৩৭ এ পার্লামেণ্টের অনুমোদন লাভ করিয়া উক্ত ঘরোয়া প্রতিষ্ঠান রীতিমত একাডেমীতে রূপান্তরিত হইল। একাডেমীর আদর্শ ও কর্তব্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"The Academy's principal function shall be to work with all the care and all the diligence possible at giving sure rules to our language and rendering it pure, eloqnent, and capable of treating the arts and sciences."

এবারে ফরাসী একাডেমী ও সাহিত্য আকাদামীর প্রভেদটা স্পষ্টভাবে বোঝা গেল। সেখানে সাহিত্যবিষয়ক একটি সজীব প্রতিষ্ঠানকে স্বীকার করিয়া লইয়া রাজশক্তির সাহায্যে তাহাকে লালন ও পুষ্ট করিয়া তোলা হইয়াছে, দেশের মনোভূমিতে যাহা ছিল না তাহার সৃষ্টি করিবার চেষ্টা হয় নাই। আর একাডেমীর উদ্দেশ্য কি? ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষা, ভাষাদেহকে এমন স্বাস্থ্য ও সৌষ্ঠব দান করা যাহাতে তাহার পক্ষে সাহিত্য, শিল্প, জ্ঞানবিজ্ঞানের বাহন

হইয়া ওঠা সহজ হয়। সাহিত্য আকাদামীর প্রেরণার মূলে এ দুয়েরই অভাব। পূর্বতন কোন সজীব প্রবণতার পরিণাম আকাদামী নয়। আবার ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রসঙ্গও ওঠে না, কারণ আকাদামীর নিজস্ব কোন ভাষা নাই, সংবিধান স্বীকৃত চোদ্দটি ভাষা লইয়া তাহার কারবার। এ যেন এমন একটা মন্ত্রিসভা যেখানে প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব কোন দপ্তর নাই, চোদ্দজন মন্ত্রীর চোদ্দটি দপ্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সংযোগ রক্ষা করাই যাহার একমাত্র কর্তব্য। এমন মন্ত্রিসভার পরিণাম শুভ নয়। সাহিত্য আকাদামী সম্বন্ধে তেমন ভয়াবহ ভবিষ্যদ্বাণী করিতে চাই না, কিন্তু মূলে সজীব প্রেরণা না থাকায়, নিজস্ব ভাষা-ভূমি না থাকায় এ বস্তু অবাস্তব হইয়া পড়িতে বাধ্য। ত্রিশঙ্কুর মতো ইহার স্থিতি শূন্যে; আঞ্চলিক ভাষার মর্ত্যলোক, সার্বজনীন ভাষার স্বর্গলোক দুটাই ইহার আয়ত্তাতীত। এ বস্তু নিজেই দুর্বল, কেমন করিয়া বল দান করিবে সাহিত্যে ও ভাষায়?

ভারতের অন্যান্য আঞ্চলিক সাহিত্য আকাদামীর দ্বারা কিভাবে ও কতখানি উপকৃত হইবে আমার পক্ষে বলা কঠিন, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে যে বিশেষ উপকৃত হইবে না অনায়াসে বলা যায়। আকাদামীর উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য "to set high literary standards"। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নিরর্থক। কেন খুলিয়া বলি। প্রধানত দুটি কারণে বাংলা সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতির উপরে আকাদামীর শুভ প্রভাব কার্যকর হইবার আশা নাই। বর্তমান সাল যদি ১৯৫৮ না হইয়া ১৮৫৮ হইত, নব্য বাংলা সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি যদি অনিশ্চিত ও অপরিণত হইত তবে আকাদামীর মতো প্রতিষ্ঠান শুভ প্রভাব বিস্তার করিলেও করিতে পারিত। কিন্তু গত একশ বছরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি সুনির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। একশ বছরের মধ্যে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ বিপুল ও বিচিত্র সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই সৃষ্টিকার্যের দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পথ ও লক্ষ্য পাকাভাবে সুনির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, কাঁচা কিছুই নাই। নূতন কারিগর সাত মহলার সঙ্গে আর এক মহল যোগ করিয়া দিতে পারেন কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নূতন নক্সা আঁকিবার সুযোগ আছে মনে হয় না। আকাদামীর অন্যতম উদ্দেশ্য হইতেছে "to set high literary standards!" সে কাজ বিদ্যাসাগর হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রতিভাবান

স্থপতিগণ করিয়া গিয়াছেন। এ কাজ কোন দেশে করে প্রতিষ্ঠান বিশেষ, কোন দেশে করে বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ। ফরাসী দেশে এ কাজের ভার ফরাসী একাডেমীর উপরে, ইংলণ্ডে বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের উপরে। ভারতের অন্য অঞ্চলে "to set high literary standards" আকাদামী করিলেও করিতে পারেন কিন্তু বাংলা দেশে সে-সুযোগ নাই। আজকার দিনে কোন বাঙালী লেখকের পক্ষে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যিককে অস্বীকার করিয়া কলম চালানো অসম্ভব।

আরও একটি কারণে বাংলা সাহিত্যের পক্ষে আকাদামীর প্রভাব অবাস্তব। সেটা সাহিত্যের জাতি-প্রকৃতি বা ধাতের কথা। ফরাসী সাহিত্যের জাতি-প্রকৃতি একাডেমীর মতো প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ মানিবার অনুকূল। অস্পষ্টভাবে যাহাকে Latin Genius বলে তাহা নিয়মপন্থী শক্তি; নিয়মের ফ্রেমে তাহা বেশ স্বস্তি ও শোভা পায়। সেইজন্য নানা দেশে একাডেমী স্থাপিত হইলেও ফরাসী দেশে যেমন শিকড় গাড়িয়াছে, এমন বোধ করি আর কুত্রাপি নয়। জাতি হিসাবে ইংরাজ পরম নিয়মনিষ্ঠ হইলেও তাহার সাহিত্যিক প্রকৃতি অত্যন্ত বেয়াড়া। নিয়মের বেড়াকে স্বীকার করার চেয়ে তাহাকে ডিঙাইতেই তাহার উল্লাস। ইংলণ্ডে একাডেমী স্বভাবগত হয় নাই। দ্বিতীয় চার্লস দীর্ঘকাল ফরাসী দেশে বাস করিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিলে পর ফরাসী একাডেমীর আদর্শে রয়াল সোসাইটি স্থাপন করিয়াছিলেন। গোড়ায় সাহিত্যিক-গণও তাহার সদস্য হইতেন, যতদূর মনে পড়িতেছে, বিখ্যাত লেখক এডিসন এক সময়ে উক্ত সোসাইটির সেক্রেটারী ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহিত্যিক জাতি-চরিত্র বিদ্রোহ করিয়া বসিল, একাডেমীর বন্ধন স্বীকার করিল না। রয়াল সোসাইটি এমন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান। বাংলা সাহিত্যের ধাতটাও প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ মানিবার অনুকূল নয়। একটা ঘরোয়া দৃষ্টান্ত দিই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও তাহার পূর্বরূপ Bengali Academy of Literature-এর উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন সাহিত্যে গবেষণা ও নূতন সাহিত্যে উৎসাহ দান। এখানেও দেখিতে পাই যে, বাংলা সাহিত্যের জাতি-প্রকৃতি বিদ্রোহ করিয়াছে, নূতন সাহিত্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মুখাপেক্ষী হইতে অস্বীকার করিয়াছে, সাহিত্য পরিষদ এখন প্রাচীন সাহিত্যে গবেষণার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। মোট কথা এই যে, ভারতের অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর সাহিত্য, যাহার প্রকৃতি প্রতিষ্ঠান নির্দেশের

অনুকূল সাহিত্য আকাদামীর প্রভাব তাহার পক্ষে শুভকর হইতে পারে, "high literary standards" মানিয়া লইতে পারে কিন্তু বাংলা সাহিত্যের বর্তমান অবস্থায় তেমন সম্ভাবনা নাই। বাংলা সাহিত্য আকাদামীর গৌণ ফলটুকু মাত্র পাইতে পারে। এক্ষেত্রে গৌণফল আকাদামী কর্তৃক সাহিত্যিকগণকে পুরস্কার সম্মান দান।

সাব-কমিটি কর্তৃক রসসাহিত্যের মান নির্ণয়ের মতো অসঙ্গতিপূর্ণ ব্যাপার সংসারে আর দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। মার্জিতরুচি ও সহৃদয় ব্যক্তি রসসাহিত্যের যোগ্য বিচারক হইতে পারেন আবার প্রাকৃত জনেরও সে গুণের অভাব না থাকিতে পারে, কিন্তু সাব-কমিটি নামধেয় অস্পষ্ট অবাস্তব বস্তুটির সে গুণ আছে মন বিশ্বাস করিতে চায় না। লোকের বিশ্বাস, সাব-কমিটির হাতে রসবিচারের অভ্রান্ত ও সূক্ষ্ম নিক্তিটি বর্তমান, কিন্তু কাছের দৃষ্টিতে দেখিলে সে বিশ্বাস শিথিল না হইয়া পারে না। হয়তো পাঁচজন সদস্যের মধ্যে তিনজন মাত্র উপস্থিত হইলেন, তার মধ্যে একজনের হয়তো উপস্থাপিত পুস্তকগুলি দেখিবারই সুযোগ হয় নাই, তিনি অপর দুইজনের সঙ্গে সুর মিলাইয়া হাঁ হাঁ করিয়া গেলেন। সে দুইজন আবার সারা বছর নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন, বৎসরকালে প্রকাশিত পুস্তকগুলির স্থূল বিবরণটাও হয়তো জানেন না, জানিবার অবসর তাঁহাদের কোথায়? এদিকে আবার নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে পুরস্কার ঘোষিত না হইলে টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে, কাজেই একখানা বই পুরস্কারপ্রাপ্ত ঘোষিত হইল। ঠিক এইভাবেই যে আকাদামীর কাজ হয় তাহা নয়, কিন্তু সাব-কমিটির কাজের ধারাটা সর্বত্র এইরকম বটে। এখন এই বিচারকে বৃহত্তম পাঠকসমাজ বিক্রমাদিত্যের নিক্তির বিচার বলিয়া গ্রহণ করিল। যোগ্যতাসম্পন্ন একক ব্যক্তি যে রসসাহিত্যের যথার্থ বিচারক হইতে পারেন তাহার উদাহরণ কালিদাসের প্রভু বিক্রমাদিত্য। তিনি কালিদাসের কাব্য বিচারে ভুল করেন নাই। আবার প্রাকৃত জনও যে মোটের উপরে সুবিচারক হইতে পারেন তাহার উদাহরণ শেক্সপীয়রের সমকালীন দর্শকগণ। তাহারাও শেক্সপীয়রের নাটকের সমাদর করিয়াছিল। কিন্তু সাব-কমিটিকে সে পর্যায়ভুক্ত মনে করিবার কারণ নাই। নোবেল প্রাইজ সাব-কমিটির বিচার কালের ধোপে কি ফাঁসিয়া যায় নাই? গত সাতান্ন বৎসর ধরিয়া নোবেল পুরস্কারদান হইতেছে পুরস্কারপ্রাপ্তদের কয়জনের নাম আজ স্মরণীয়? তুলনায় নোবেল পুরস্কার কমিটির

উপেক্ষিতদের নামের তালিকা কম স্মরণীয় নয়? টলস্টয়, ইবসেন, হার্ডি এমন অনেক নাম করা যাইতে পারে। কথা উঠিবে, মানুষের বিচার অভ্রান্ত নয়। নিশ্চয় নয়। তবে জানিয়া শুনিয়া এমন দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করে কেন? বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নিজেদের বিচার-বিবেক অনুযায়ী যেমন খুশী পুরস্কারদান করুক, সরকারের সে কাজ নয়।

পুরস্কার সাহিত্যকে পরমুখাপেক্ষী করিয়া তোলে, সরকারী পুরস্কার সাহিত্যিককে সরকারী মুখাপেক্ষী করিয়া তোলে। আমি জানি যে, সাহিত্যিক-পরমুখাপেক্ষী করিয়া তুলিবার ইচ্ছা আকাদামীর নাই। কিন্তু অর্থ ও সম্মান স্বভাব ত্যাগ করিবে কেন? যে হাত খাদ্য জোগায়, মাল্যচন্দন পরাইয়া দেয় তাহার প্রতি আনুগত্য না হইয়া যায় না। সাহিত্যিকের, বাংলা সাহিত্যিকের মূল প্রেরণা বেপরোয়া ভাব, শাসন কর্তৃপক্ষের প্রতি উদাসীনতার ভাব। গত দেড়শ বছরকাল বৃটিশ শাসনে থাকিবার ফলে এই ভাবটির সৃষ্টি হইয়াছে বাঙালী সাহিত্যিকের মনে, সরকার নিরপেক্ষ মহৎ সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে বাংলা ভাষায়। আকাদামীর ও রবীন্দ্র পুরস্কারের আনুকূল্যে যদি তাহা নষ্ট হইয়া যায় তবে বাংলা সাহিত্যের দুর্দিন আরম্ভ হইল মনে করিতে হইবে। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, বৃটিশ সরকার সাহিত্যে পুরস্কার দানের নীতি গ্রহণ করে নাই।

সাহিত্যিককে দান ভালো কিন্তু পুরস্কার দান ভালো নয় এবং সরকার কর্তৃক পুরস্কার দানের মতো ক্ষতিকর ব্যাপার অল্পই আছে। সরকার স্বয়ং বা সরকারের প্রতিনিধিরূপে আকাদামী দুঃস্থ, দুর্গত, প্রবীণ সাহিত্যিকগণের ভার গ্রহণ করুন। যাঁহার সাহিত্যিক জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে, অথচ জীবিকার উপায় নাই তাঁহার ভার সরকার বা তাঁহার প্রতিনিধি গ্রহণ করিলে কালোচিত কার্য হইবে। কিন্তু রসসাহিত্যের ক্ষেত্রে পুরস্কার দান অন্যায় হস্তক্ষেপ। দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি বা অভিধান, ব্যাকরণের জন্য পুরস্কার দান সমর্থনযোগ্য, কেননা, এসব বস্তু বিচারের দুর্লভ নয়, একটা objective standard খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব। কিন্তু সাহিত্যের গুণাগুণ প্রায় অনির্বচনীয়, বড় বড় আলঙ্কারিকেরা তাহার তল পায় না—এমন আকাশকুসুম চয়ন করিবার ভার সরকার লইলে আর কিছু না হোক হাস্যকর হইবার আশঙ্কা। সরকারের পক্ষে সে আশঙ্কা মর্যাদানাশক। কিন্তু কেবল ঐ আশঙ্কাটাই নয় - এর চেয়েও গুরুতর আশঙ্কা আছে। সরকারের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপে সাহিত্যের "খোল, বাজার" নষ্ট হইয়া সাহিত্যের "চোরা-

বাজার" গড়িয়া উঠিতে পারে। সোভিয়েৎ মুল্লুকে এ আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। সেখানে সরকার জানিত সাহিত্যিকেরই মানমর্যাদা খ্যাতি-প্রতিপত্তি। আমি একথা বলিতে চাই না যে, সাহিত্য আকাদামীর সেরূপ অভিপ্রায় আছে। কিন্তু অভিপ্রায় যতই হোক, নানা শ্রেণীর পুরস্কারদান, সরকার কর্তৃক পাইকারী হারে পুস্তক ক্রয় প্রভৃতি সদ্ অভিপ্রায়প্রসূত হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্যের স্বাধীনতা হরণ করিতেছে। স্বাধীন ভারতের সমাদৃত সাহিত্যিকের তুলনায় পরাধীন ভারতের উপেক্ষিত সাহিত্যিক অনেক বেশি স্বাধীন ছিল। ইতিহাসে ইহা এক নিষ্ঠুর বিড়ম্বনা।

আজকার দিনে এদেশের সাহিত্যের আশঙ্কা দু'তরফা। একদিকে সরকারের সদভিপ্রায়জনিত অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ, অন্যদিকে কম্যুনিজম মতবাদের দূরপ্রসারী সুদক্ষ হস্তক্ষেপ। এ দুয়ের টানাটানি বাঁচাইয়া চলা একপ্রকার অসম্ভব। যাহারা কৌশলী ও বিষয়দক্ষ তাহারা এ দুটিকেই তোষণ করিয়া চলিতে পারে কিন্তু সাধারণ বুদ্ধির সাহিত্যিকগণ যে নিতান্ত অসহায়। হয় সরকারের হাতে থাকিতে হইবে, নয় জীবনব্যাপী সাত্ত্বিক একাদশীর বিধান। সাধারণ পাঠকের হাতে থাকিতে আপত্তি কি? সাধারণ পাঠকও যে এ দুই তরফ হইতে উৎকর্ষের ইঙ্গিত গ্রহণ করে, সরকার ভালো বলিল অতএব ভালো, অমুক অমুক দলের কাগজ বা ব্যক্তি ভালো বলিল অতএব ভালো—এই ধারায় সাধারণ পাঠক বিচার করিয়া থাকে। মাঝখান হইতে নিরীহ ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় সাহিত্যিকের অবস্থা দুঃসহ হইয়া উঠিল। ভারতীয় সাহিত্যের বর্তমান দুর্গতির আভাস বিদেশী সমালোচকের দৃষ্টি যে এড়ায় নাই তাহা নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

কার্ডিনাল রিশলুর সময়ে একাডেমী প্রতিষ্ঠায় তেমন ক্ষতি হয় নাই, বিশেষ ফরাসী জাতিপ্রতিভা একাডেমী শাসনের অনুকূল। তখনকার দিনে রাষ্ট্রের বাঁধন আল্‌গা ছিল। সেই কেন্দ্রাভিগ শক্তির দিনে দু'চারটা বাঁধন কেন্দ্রাভি-মুখে টানিয়া বাঁধিলে সমাজের সংহতি বাড়িত। কিন্তু এখন কেন্দ্রাভিগ শক্তির দিন, রাষ্ট্রপ্রভাব এখন সর্বময় ও সর্বশক্তিমান। আগের দিনে চুক্তিরক্ষা ও শান্তিরক্ষা রাষ্ট্রের কাজ বলিয়া পরিগণিত হইত, এখন রাষ্ট্রের অঙ্গুলি, ব্যক্তির মনে এ ব্যবহারের মধ্যে আত্মপ্রবেশ করিয়াছে। এহেন অবস্থায় কেন্দ্রাভিমুখী বাঁধন সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নয়। সাহিত্য আকাদামী সেই কেন্দ্রাভিগ

বাঁধন। এখন আবশ্যক কেন্দ্রাভিগ শক্তির, রাষ্ট্রের সর্বব্যাপী বন্ধন হইতে মুক্তির, মানসিক স্বাধীনতার। সাহিত্য আকাদামী ঠিক সেই প্রয়োজনের পরিপোষক নয়। একযুগোচিত প্রতিষ্ঠান অন্য যুগের পক্ষে ভার।

মোটের উপরে কথা এই যে, সাহিত্য আকাদামীর কিছু কার্যকারিতার ক্ষেত্র আছে, সাহিত্যের উপকার করিবার শক্তিরও অভাব নাই। কিন্তু তাহা "to set high literary standards" প্রচেষ্টা নয়। এখনকার সমাজ এমন বিপুল, তাহার প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব এমন জটিল যে, কোন ব্যক্তিবিশেষ বা প্রতিষ্ঠান বিশেষের সাধ্য নয় এই জনসমুদ্রে সাহিত্যের উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে। দ্রুত শিক্ষা বিস্তারের যুগে, যখন নিত্য নব নব জনখণ্ড পাঠক সম্প্রদায়ভুক্ত হইতেছে বেতার, সুলভ মুদ্রণ ও সংবাদপত্রাদির বহুল ব্যাপ্তির যুগে সাহিত্যমানের অবনমন অবশ্যম্ভাবী। পাঠকসমাজের ব্যাপ্তি সাধন ও ও সাহিত্যের উচ্চাদর্শ রক্ষা একসঙ্গে চলিবে এমন আকাঙ্ক্ষা সম্ভব নয়। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য পুনরায় লোকসাহিত্যে পরিণত হইবার প্রবণতা দেখাইতেছে। এ প্রগতি রোধ সাহিত্য আকাদামীর পক্ষে অসম্ভব। আবার রসসাহিত্যে পুরস্কারদানকেও আকাদামীর কর্তব্য বলিয়া মনে করিতে পারি না। ইহার ফলে সাহিত্যিকের রাষ্ট্রমুখাপেক্ষী ও সাহিত্যের প্রচারসাহিত্য হইয়া উঠিবার আশঙ্কা। কাজেই এহেন পণ্ডশ্রম হইতে বিরত হইয়া অন্যত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে আকাদামীর শক্তির সদ্ব্যয় হইবে। আর সেরূপ ক্ষেত্রেরও যে অভাব নাই, সে বিষয়ে আকাদামীও যে সচেতন তাহা তাহার সংবিধান হইতেই জানা যাইবে।

আকাদামীর উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে তাহার সংবিধানে যে-সব কার্যক্রমের উল্লেখ আছে তন্মধ্যে নিম্নোক্তগুলি বিশেষ প্রশংসনীয়। বিধানের অন্তর্গত 'খ' উপবিধানভুক্ত প্রশংসাযোগ্য কয়েকটি ধারার উল্লেখ করিতেছি।

(1) to promote co-operation among men of letters for the development of Literature in Indian languages,

(2) to encourage or to arrange translations of literary works from one Indian language into others and also from non-Indian into Indian languages and vice-versa,

(3) to publish or to assist associations and individuals in

publishing literary works, including biblio graphies, dictionaries, encyclopae-dias, basic vocabularies etc, in the various Indian languages :

(4) to sponsor or to hold literary conferences, seminers and exhibitions on all India or a regional basis ;

(5) to promote research in Indian language and literature ;

(6) to promote the teaching and study of regional languages and literatures in areas beyong then own ;

(7) to encourage propagation and study of literature among the masses ;

সংবিধানের এই কয়টি উদ্দেশ্য আমার মতে বিশেষ প্রশংসাযোগ্য। আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা ও পরিচয় সাধন, ভারতীয় সাহিত্য ও বিশ্বসাহিত্যকে ঘনিষ্ঠতর করিয়া তোলা—প্রধানত ইহাই আকাদামীর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আর সেই সঙ্গে এতাবদ্‌কাল এদেশে ও বিদেশে যে উচ্চাঙ্গ সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে তাহার আদর্শ এমনভাবে ধারণ করিয়া রাখা যাহাতে মানুষের মন হইতে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লোপ না পায়। এযুগের অন্ধ-বিশ্বাসী, অর্ধবিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী মন রাজনীতির ঘামে-ভেজা ন্যাকড়া দিয়া সাহিত্য ও শিল্পের উচ্চাদর্শকে মুছিয়া দিতে উদ্যত। এই বর্বরোচিত কার্যকে রোধ করিতে না পারিলে মানুষের মন তমসাচ্ছন্ন যুগে গিয়া পড়িবে। সাহিত্য আকাদামী সে ভার লইতে পারেন, তাহার সংবিধান পড়িয়া মনে হইল, একাজে উদ্যতও বটে। এটি মহৎ কার্য। মহৎ কার্যে অসাফল্যও মহৎ। কিন্তু অসাফল্যের প্রশ্ন ওঠে না, যেহেতু একাজে সাহিত্য হিতকামী ব্যক্তি-মাত্রেরই সমর্থন ও শুভেচ্ছা লাভ করিবেন সাহিত্য আকাদামী।

# সংস্কৃত বর্জন না সংরক্ষণ

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে নূতন করে সাজাবার যে উদ্যম চলেছে, তার মূল সূত্রটা হচ্ছে পাঠ্যবিষয়ের ভার কমাতে হবে। পাঠ্য বিষয়ের কাজেই পাঠ্যপুস্তকের ভার যে দুর্বহ হ'য়ে উঠেছিল, সে সম্বন্ধে পাঠ্যপুস্তক প্রণেতাগণ ছাড়া আর সকলেই একমত। পাঠ্যপুস্তক প্রণেতাদের সংখ্যা অন্যদের তুলনায় অনেক কম সত্য কিন্তু ভার তো সব সময়ে সংখ্যার উপরে নির্ভর করে না, অনেক সময়েই নামের ভার সংখ্যার ভারের চেয়ে গুরুতর। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। বাংলাভাষার ব্যাকরণ নাকি অবশ্যপাঠ্য। যে ভাষা এখনো শৈশবে এখনো গড়ে উঠবার মুখে, যে ভাষা অনেকাংশে ইংরাজি ভাষার সক্ষম বা অক্ষম অনুকরণে এখনো গঠিত হচ্ছে ( অক্ষম অনুকরণের দৃষ্টান্ত 'সকলের সম্মুখে বা সভার সম্মুখে কথাটা রাখছি' কিম্বা 'কথাটা তুলে ধরছি' ইত্যাদি ) সে ভাষায় ব্যাকরণ রচনা ! পণ্ডশ্রম আর সেই গবেষণা কণ্টকিত গ্রন্থ পাঠ্যরূপে নির্দেশ শিশুপাল বধের নূতন আয়োজন। তার পরে, ধরুন, চলতি ভাষার ক্রিয়া পদ। করছে, এই ক্রিয়াপদের অসংখ্য রূপ কচ্ছে, কচ্চে, কোরছে, কোচ্চে আরও উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এদের মধ্যে কোনটি গ্রাহ্য? সবগুলি নিশ্চয় হতে পারে না। আমি ব্যাকরণ বিশেষজ্ঞ নই ( কোন বিষয়েই বা ! ) তবু আমার এতটুকু সংশয় নেই যে, আর কারো ব্যাকরণ পড়ায় (গ্রন্থকার ছাড়া ) লাভ হয় না। তার পরে ধরুন—রচনা গ্রন্থ, বাজারে নানা আয়তনের অসংখ্য রচনা গ্রন্থ ও গ্রন্থকার। আর বলা বাহুল্য উভয়েই আর সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এগুলো পড়ে কোন ছাত্র লাভবান হয় বলে বিশ্বাস করবার কারণ নেই, তবে বিশ্বাস করবার কারণ আছে যে, অনেক শিক্ষক হন। কারণ এই মানের রচনা প্রণয়ন তাঁদের বিদ্যার অতীত, গ্রন্থকারের লাভের কথা তোলাই বাহুল্য। এখন যে-সব ছাত্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির প্রবন্ধাদি পড়ছে তাদের কি সত্য অমুক রায়, অমুক সরখেল অমুক কানুনগোর রচনা পড়া অত্যাবশ্যক। ( কাল্পনিক নাম ভয়ে ভয়ে লিখেছি কারণ বাংলাভাষায় আজ কে এই সব গ্রন্থের গ্রন্থকার নন )। এ সব লিখতে

কোন বিদ্যার প্রয়োজন হয় না, তবে কিছু বুদ্ধির প্রয়োজন আছে বটে। নাম মাত্র দক্ষিণা দিয়ে একজনকে ধরিয়ে লিখিয়ে নিলেই হ'ল। (উপরে একটু ইচ্ছাকৃত ভুল আছে! বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের নাম লেখা উচিত হয়নি, কারণ সরকারী মাপকাঠি অনুসারে তাঁরা খ্যাতনামা সাহিত্যিক নন, নতুবা তাঁদের রচনা কিশলয় গ্রন্থে অবশ্যই থাকতো।) নূতন ব্যবস্থাপনায় পাঠ্যবোঝা হাল্কা করাই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে অবশ্যই পাঠ্যপুস্তকের বোঝা থেকে শুরু করতে হয়। বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা যদি নিষিদ্ধ করা যায় তবে অনাবশ্যক বস্তু পাঠের দায় থেকে ছেলেমেয়েরা অনেক পরিমাণে নিষ্কৃতি পায়। নব বৈয়াকরণগণ যদি ব্যাকরণ কৌমুদী পড়ে বিদ্বান হয়ে থাকেন তবে আজকালকার ছেলেমেয়েরাও না হয় তাই পড়লো। এরকম উদাহরণ প্রত্যেক পাঠ্য বিষয় থেকে দেওয়া যায়। প্যারী সরকারের ফার্ষ্ট বুক পড়ে সে আমলের ছেলেরা ইংরাজি এবং ব্যাকরণ কৌমুদী পড়ে সংস্কৃত শিখেছে। তবে এ আমলে চলবে না কেন? কানে শুনেও বিশ্বাস হয়নি যে, ও-সব বই পুরানো হয়ে গিয়েছে। ভালো না হয় আবার কিছু দিন পুরানো গ্রন্থই চলুক। সে আমলের মাপেই না হয় ছেলেমেয়েরা বিদ্বান হোক, তার বেশি না হয় নাই হল। মনে রাখতে হবে সেটা বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার আমল। কিন্তু এহো বাহ্য, আসল রোখটা পড়েছে সংস্কৃতের উপরে।

আজকের শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কৃতের স্থান অনেকটা হাল আমলে 'ক্ষুদ্র ও সুখী পরিবারে' বুড়ি ঠাকুরমা বা দিদিমার মতো বুড়ীকে ত্যাগ করাও কঠিন, রাখাও কঠিন, তাই যতদিন বাঁচে (হিন্দু বিধবারা আবার দীর্ঘজীবী হয়) কোনরকমে সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই। অথচ একদিন ছিল এই বুড়ীরাই সংসারের কর্ত্রী ছিলেন, অশক্ত অবস্থাতেও শুয়ে শুয়ে হুকুমে সংসার চালাতেন। বুড়ি দিদিমা ও ঠাকুরমার সে গৌরবের আসন আজ আর নাই—সংস্কৃত ভাষারও।

সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে বিচিত্র ধারণা আমাদের মধ্যে আছে। ওটা স্কলার বা পণ্ডিতের ব্যাপার, ওটা পুরুত ও শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্মের ব্যাপার, ওটা একটা ডেড ল্যাংগুয়েজ বা মৃত ভাষা, ওটা এ যুগের পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক একটা ব্যাপার; বিচারে নামলে দেখা যাবে এ সব ধারণার কোনটাই সত্য নয় তবে যে চলছে তার কারণ মূর্খতা, এ বস্তু আবার অজ্ঞতার চেয়েও গুরুতর। অজ্ঞ জানে না মূর্খ ভুল জানে।

বিচারের কথা বলেছি। বিচারে বসলে দেখা যাবে যে, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান বাহন সংস্কৃত ভারতী। সংস্কৃতর সঙ্গে সংস্কৃতির মিল কেবল আক্ষরিক নয়, একেবারে আন্তরিক। এই সরল বিষয়টা আমরা জানিনা, অথচ সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের আধিক্যেতার অন্ত নাই। বর্তমানে সমাজে সংস্কৃতি বলে যা চলছে তার মূলে পলিটিকস্। পলিটিকস্ নাম জড়িয়ে সংস্কৃতি রূপ নিয়ে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ।

সর্বকালীন ভারতের সঙ্গে যোগরক্ষার প্রধান উপায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান। এই জ্ঞান থেকে আসে মমত্ববোধ, মমত্ববোধ থেকে দায়িত্ববোধ। 'দেশ আমার, দেশমাতৃক বন্দেমাতরম্' বা 'ভারত ভাগ্যবিধাতা' বলে চেঁচালেই দেশ আমার হবে না। দেশ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান Year Books Parliamentary Report, সংবাদপত্র প্রভৃতি থেকে। কালিদাসের প্রভু বিক্রমাদিত্যের আমলেও রূপান্তরে এ-সব নিশ্চয় ছিল, কিন্তু 'হায় রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল'—কিন্তু কালিদাসের কাব্য তো হারায় নি। তৎকাল সম্বন্ধে আমাদের যা কিছু ধারণা—এই সব কাব্য থেকেই। অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথ এই রকম মনে করেন। রবীন্দ্রনাথের কথা যখন উঠল, সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যকে বাদ দিলে রবীন্দ্রসাহিত্যের কী রূপ দাঁড়ায়। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য থেকে তিনি রস আকর্ষণ করে নিজেকে সঞ্জীবিততর করেছেন। মৃত দেহ থেকে রস আকর্ষণ সম্ভব নয় - মাতৃভাষা থেকেও নয়। একথা প্রত্যেক বাঙালী সাহিত্যিক সম্বন্ধে (ভারতীয় সাহিত্যিক সম্বন্ধেও বটে) সত্য। বিদ্যাসাগর না হয় পণ্ডিত বংশের সন্তান, কিন্তু মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র। আজকার দিনেও প্রতিভাবান সাহিত্যিকের অভাব নেই, অবশেষে তাঁদের প্রতিভা চাঁদমারি লক্ষ্যভেদ করতে পারছে না। তাঁর সে Intellectual Angle-এর মতো ব্যর্থতার আকাশে পাখা ঝটপটিয়ে মরছেন, তার কারণ ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগের অভাব। আরও এক কথা। আজকাল National Integration অর্থ ও জাতীয় সংহতি সাধনের উল্লেখ প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রযুক্তিবিদ্যা দিয়ে নয়, একমাত্র সংস্কৃতি দিয়েই এ যোগসাধন সম্ভব— যে-সংস্কৃতির আবার যোগ সংস্কৃতের সঙ্গে। সংস্কৃত সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান থাকলে সংস্কৃতজাত অন্যান্য ভাষা সম্বন্ধে কাজ চালানো গোছের জ্ঞান হওয়া সম্ভব— অন্ততঃ এ-সব ভাষাকে গ্রীক বা হিব্রু বলে মনে হবে না।

ভালো বাংলা শিখবার প্রধান উপায় সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান (ইংরাজি ভাষা সম্বন্ধেও বটে)। গত কয়েক বছর ধরে যে দেশব্যাপী আধা অরাজকতা চলছে তার কারণ সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে শিক্ষার বিচ্ছেদ যাঁরা সাহেবের বাক্যকে বেদবাক্য বলে মনে করেন তাঁরা অধ্যাপক Barham-এর সাম্প্রতিক মন্তব্য স্মরণ করতে পারেন। Barham ইতিহাসে সুপণ্ডিত আর ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুরাগী। তিনি বলেছেন যে, ল্যাটিন ভাষার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটার য়ুরোপীয় সভ্যতার ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা ঘটেছে। সংস্কৃতের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটলে ভারতের সেই অবস্থা অনিবার্য হয়ে উঠবে। এই মন্তব্যের পরিপূরকভাবে মনে রাখা আবশ্যক বর্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে ল্যাটিনের যোগাযোগের চেয়ে ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে সংস্কৃতর যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। রেনেসাঁসের ফলে য়ুরোপে লাটিনের আসন টল্‌ল। সেখানে দেখা দিল গ্রীক ভাষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান। Reformation-এর ফলে লাটিনের সঙ্গে বিচ্ছেদ আরও পাকা হল, গ্রীসের সঙ্গে বাড়লো ঘনিষ্ঠতা। যত লোক গ্রীক শিখলো তার চেয়ে অনেক অধিক সংখ্যক লোক লাটিন ভুলল। এই প্রক্রিয়া শনৈঃ শনৈঃ দীর্ঘকাল ধরে চলেছে। আমাদের দেশের বেলায় অনুরূপ প্রক্রিয়ার গতি দ্রুততর হয়েছে। য়ুরোপীয় সভ্যতায় গ্রীক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, আমাদের সভ্যতায় তা ঘটালো ইংরাজি ভাষা সাহিত্য আর ইংরাজি ভাষাবাদী জ্ঞান বিজ্ঞান। গ্রীকের সান্নিধ্যে ও দেশে অনেক সুফল ফলিয়েছে ইংরাজির সান্নিধ্যেও সুফল ফলিয়েছে এদেশে। তবে মূল ক্ষতি পূরণ হয়নি। এ সত্যটা এখনো আমরা সর্বাংশে বুঝতে পারিনি তাই শিক্ষা জগতে ও অন্যত্র সংস্কৃত সম্বন্ধে অবজ্ঞা বেড়েই চলেছে। শেষ পর্যন্ত পাঠ্য বিষয় থেকে সংস্কৃত বাদ পড়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে নামে মাত্র আছে।

হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় যাঁরা সাহিত্য পড়েন (Humanitics শব্দের অক্ষম অনুকরণ মানবিকতা শাস্ত্র বা অনুরূপ কিছু) সংস্কৃত তাদের পক্ষে আবশ্যিক ছিল। বিজ্ঞান, কমার্স ও প্রযুক্তিবিদ্যায় ছাত্রগণ সংস্কৃত পড়তেন না। শুনতে পাচ্ছি নূতন ব্যবস্থায় এই চার ধারা আর থাকবে না সকলের পক্ষেই সংস্কৃত আবশ্যিক হবে। এ যদি সত্যই হয় তবে সুলক্ষণ বলতে হবে। তবে কলেজে গিয়ে যাঁরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা প্রভৃতি পড়বেন তারা বলতে পারেন আমাদের উপরে এ জুলুম কেন সংস্কৃত আমাদের কোন কাজে লাগবে। জলাশয়ের তীরে যাদের বাস সযত্নে জল সঞ্চয় করে রাখবার প্রয়োজন তাদের

হয় না। প্রয়োজন মতো তুলে আনলেই চলে। কিন্তু মরুভূমির যাত্রীর পক্ষে জল সংগ্রহ ও সঞ্চয় অত্যাবশ্যক। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার ছাত্রগণ মরুভূমির যাত্রী তাঁদের পক্ষে সাহিত্য (এ ক্ষেত্রে সংস্কৃত) সেই সযত্ন সঞ্চিত জল নীরস বিষয় চর্চায় যখন গলা শুঁকিয়ে যাবে তখন মনের অবচেতনে সঞ্চিত রস বলাধান করবে তাদের মনে। তাছাড়া ভারতের নাগরিক হিসাবে দেশের প্রতি মমত্ববোধ ও দায়িত্ববোধ জাগাবে কি সে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা দেশ কাল নিরপেক্ষ বিশেষভাবে ভারতীয় বলে তাদের চিহ্নিত করবার উপায় নেই। সংস্কৃত হচ্ছে দেশের মাটি, যতক্ষণ ঐ মাটি তাদের পায়ের তলায় আছে তাদের দেশাত্মবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বার আশঙ্কা নেই। কাজেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ছাত্রগণের পক্ষে কিছু সংস্কৃত জ্ঞান অত্যাবশ্যক; সাহিত্য ছাত্রদের চেয়ে তাঁদের প্রয়োজন বেশি বই কম নয়।

এবারে সংস্কৃত পাঠনের রীতি সম্বন্ধে দু'একটি বিষয় বলে আমার কথা শেষ করবো। বি-এ পরীক্ষায় আমার সংস্কৃত পাঠ্য বিষয় ছিল পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে কালিদাসের শকুন্তলা একতম। পরীক্ষায় বসে প্রশ্ন দেখলাম what are the merits of hunting বলা বাহুল্য একটি শ্লোকের অনুবাদ করে দিলেই উত্তর সম্পূর্ণ হল। কিন্তু বিষয় হচ্ছে যে ছাত্র রবীন্দ্রনাথ লিখিত প্রাচীন সাহিত্যের প্রবন্ধগুলি পড়েছে এ প্রশ্ন দেখে সে হাসবে না কাঁদবে! প্রশ্নকর্তার প্রাচীন সাহিত্য পড়া থাকলে অন্য রকম প্রশ্ন অবশ্য করতেন। শকুন্তলা পৃথিবীর সাহিত্যে একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নানা রসের আকর। ছাত্ররা সেই রসের স্বাদ যাতে পায় সেইভাবে অধ্যাপনা আবশ্যক। ব্যাকরণের উদাহরণ জোগাবার উদ্দেশ্যে কালিদাস কাব্য রচনা করেন নি, কিন্তু পণ্ডিত মশায়গণ হতভাগ্য কালিদাসকে দিয়ে সেই কাজ করিয়ে নেন। এ পাঠনরীতির পরিবর্তন আবশ্যক। বাঙালী স্বভাবতঃ রসগ্রাহী রসের স্বাদ পেলে অনায়াসে দুরূহ বিষয় গলাধঃকরণ তারা করতে প্রস্তুত। গোড়া থেকেই সংস্কৃত এমন ভাবে পড়াতে হবে যাতে ছাত্ররা অনুমান করতে পারে অনন্ত রস সমুদ্র তাদের সম্মুখে ব্যাকরণের সামান্য বালুকাময় বেলা অতিক্রম করলেই সেখানে পৌছতে পারবে। সেই সঙ্গে শিক্ষকদের সর্বদা মনে রাখতে হবে কি জন্য সংস্কৃত অধ্যয়ন। ছাত্রদের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত করে তুলবার উদ্দেশ্য নয়—যে দেশের মাটি থেকে এই মহিমময়ী ভাষার উদ্ভব সেই দেশের প্রতি যাতে তাদের

মমত্ববোধ জাগে এই হচ্ছে গিয়ে সংস্কৃত শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ( সব শিক্ষারই বটে )।

এবারে কথা শেষ করে এনেছি—তবু কথা ফুরোতে চায় না। শিখা উপবীত নামাবলী প্রভৃতি প্রতীকের প্রতি এ যুগের বড় অবজ্ঞা। এ সব অত্যন্ত সেকেলে যদিচ অনেকেরই পিতা পিতামহ এ সব চিহ্নধারী ছিলেন। কিন্তু হলে কি হয়—Generation gape (কি অর্থ ?) ঘটে গিয়েছে যে। আবার কোন্ যুক্তি বলে জানি না সংস্কৃতের সঙ্গে এ সমস্তর অপরিহার্য যোগ। সংস্কৃত শিক্ষকের পরিচ্ছদ যদি সংস্কৃত শিক্ষার অন্তরায় হয়ে ওঠে, পাঠ্য বিষয়কে অবজ্ঞাভাজন করে তোলে তবে তার প্রতিকার চিন্তা আবশ্যক। এখন সংস্কৃত শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ যদি দেশের কথা স্মরণ করে ট্রাউজার ও বুশসার্ট ( নাম ঠিক হল তো ! ) পরিধান করে শিক্ষাদান সুরু করেন তবে তাঁদের পরিচ্ছদের পরিবর্তন ছাত্রদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ( এই সঙ্গে বাংলার শিক্ষক ও অধ্যাপকদের পরিচ্ছদেও অনুরূপ পরিবর্তন হওয়া বাঞ্ছনীয় )। যে কলেজে বি-এ পড়বার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সেখানকার একজন তরুণ সংস্কৃত অধ্যাপক দস্তুরমতো সাহেবী পোষাক পরতেন, ছাত্ররা রীতিমতো তাঁকে সমীহ করতো। আমার সঙ্গে রসিকতার সম্বন্ধ ছিল। একদিন বললাম ছাত্ররা আপনাকে ভক্তি করে ; উত্তর পেলাম ভক্তি না হে ভয় সিংহচর্ম পরে যাই যে। আমার এই প্রস্তাব আর যাই হোক পরিহাস বিজল্পিত নয় দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। সংস্কৃত বর্জন না সংরক্ষণের সঙ্গে আধার আধেয় বিষয়টি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

# সাহিত্যবিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যা

ইতিহাসের বড় বড় ফাঁড়াগুলি কাটিয়া না যাওয়া অবধি তাহাদের মারাত্মকতা বুঝিতে পারা যায় না। পাহাড়ের সরুপথ পার হইবার সময়ে তেমন ভয় করে না, কিন্তু পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া শিহরিয়া না ওঠে এমন পাষাণ হৃদয় বিরল। ইতিহাসের ফাঁড়া সম্বন্ধেও ঐ কথা। এমন ফাঁড়ার বিবরণে মানুষের ইতিহাস পূর্ণ। ঘরের কাছের একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। মেকলের বিখ্যাত ডেসপ্যাচের ফলে এদেশে ইংরাজী শিক্ষাদানের নীতি গৃহীত হইয়াছিল। তার সুফল ও কুফল দুই-ই বর্তিয়াছে আমাদের সমাজে। সুলভ কেরানী ও দুর্লভ মাইকেল মধুসূদন জুটিয়াছে আমাদের ভাগ্যে; বিধবা বিবাহ আইন, স্ত্রী শিক্ষা প্রসার ও ও নব্য বাংলা সাহিত্যের উদ্ভবের সঙ্গে পাশাপাশি আছে আত্মকেন্দ্রিক বাঙালীর সমাজবিমুখতা, ব্যক্তিসর্বস্বতা ও পল্লী অঞ্চল পরিত্যাগের প্রবণতা; ঐ শিক্ষার ফলে গোরা বিনয়কে যেমন পাইয়াছি তেমনি পাইয়াছি মহিম অবিনাশকে; পরেশবাবু ও কৃষ্ণদয়ালবাবু একই ইংরেজী শিক্ষার বিচিত্র ফল! ইংরেজী শাসন তথা ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে 'আনন্দমঠে'র লেখক বলিতেছেন, "প্রকৃত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক, কর্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার, বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। অন্তর্বিষয়ক যে জ্ঞান সেই সনাতন ধর্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি, তাহা না জানিলে সূক্ষ্ম কি তা জানা যায় না .....এখন এ দেশে বহির্বিষয়ক জ্ঞান নাই, শিখায় এমন লোক নাই, আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু।...ইংরেজী শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে।"

অনেকে বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তিকে ইংরেজের হাকিমের উক্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা যে, ওয়ারেন হেস্টিংসের সৈন্যদলের পরাজয় বর্ণনার পরিবর্তে ইংরেজ-মহিমা স্বীকৃতির এই উৎকোচটুকু দিয়াছেন হাকিম বঙ্কিমচন্দ্র সরকারের উদ্দেশ্যে! কিন্তু তাহা সত্য নয়। ইহা ইংরেজ শাসনের

তেমন প্রশংসা নয়, যেমন ইংরেজী শিক্ষায়। আর ইহাই ছিল সেকালের শিক্ষিত বাঙালীর মনের কথা। (এখনও পরিবর্তন হয় নাই দেখিতেছি)। বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তির অর্থ এই যে, ইংরেজী শিক্ষার ফলে বৈজ্ঞানিক ও বৈষয়িক বিদ্যা আয়ত্ত হইলে পরে আমরা আত্মবিদ্যা ও তত্ত্ববিদ্যা লাভ করিতে সক্ষম হইব। বঙ্কিমচন্দ্রের এ ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয় নাই। ইংরেজী শিক্ষার সুফলস্বরূপ রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রভৃতি নূতন করিয়া তত্ত্ববোধ উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন আমাদের জীবনে। কিন্তু সেই সঙ্গে শশধর তর্কচূড়ামণির দলেরও উদ্ভব ঘটিয়াছে, ইংরেজের বিজ্ঞানকে যাঁহারা দেশজ কুসংস্কারের তল্পী বহন কার্যে নিয়োগ করিয়াছেন। এই জন্যই গোড়ায় বলিয়া লইয়াছি যে, ইংরেজী শিক্ষার সুফল ও কুফল দুই-ই বর্তিয়াছে আমাদের জীবনে।

কিন্তু এই ব্যবস্থাকে ফাঁড়া বলি না, যেহেতু কাটিয়া গিয়াছে, তাছাড়া এ সু ও কু-য়ে মিশান, সু-এর ভাগটাই বেশী বলিয়া মনে করি।

আসল ফাঁড়া যে সঙ্কট হইলে হইতে পারিত অথবা হয় নাই। ইংরেজী শিক্ষার নীতি গৃহীত না হইয়া যদি সংস্কৃত ও আরবী ফারসী শিক্ষাদানের নীতি গৃহীত হইত, তবে আজ দেশের অবস্থা কিরূপ হইত? এক্ষেত্রেও আশাবাদী লোকের অভাই নাই, কিন্তু, আমার ত শরীর ভয়ে কণ্টকিত হইয়া ওঠে। কিন্তু এর চেয়েও অধিকতর মারাত্মক একটা ফাঁড়া হইলে হইতে পারিত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যদি সুলভ কেরানী তৈয়ারি করিবার নীতি গ্রহণের বদলে সুলভ কারিগর তৈয়ারী করিবার নীতি গ্রহণ করিত। বাঙালী "কেরানী" না হইয়া যদি "কারিগর" হইত, তবে আজ বাংলা দেশের অবস্থা কিরূপ হইত?

মনে করা যাক—ইংরেজ ব্যবসায়ীরা স্থির করিল যে বিলাত হইতে পণ্য আনিয়া এদেশে বিক্রয় করিবার চেয়ে এদেশে তৈয়ারি করিয়া এদেশে বিক্রয় করিবে। তাহাতে লাভ বেশী, এদেশে মজুর সুলভ, কারখানা তৈয়ারি করিবার জমি সুলভ, বিলাতের তুলনায় সবই সুলভ। তবে আবার কাঁচা মাল বিলাতে টানিয়া লইয়া যাইবার প্রয়োজন কি? ল্যাঙ্কাশায়ারের বদলে এদেশেই বসিল কাপড়ের কল। এমনিতর সব কারখানাই এদেশে বসিল। এই ব্যবস্থার কী পরিণাম হইত? নগদ কড়ি আনিতে পারিবে বলিয়া যাহারা ইংরেজী স্কুলে ঢুকিত তাহাদের সকলে না হইলেও অধিকাংশই কি কারখানায় ঢুকিত না?

একেবারে দিন মজুর না হইয়া ঢুকুক, "মেট" বা ঐ রকম কিছু হইয়া ঢুকিত। নগদ কড়ির চেয়ে প্রবল যুক্তি সংসারে বিরল। এমন কিছুকাল চলিলে ইংরেজী শিক্ষার ফলে গত দেড়শ বছরের মধ্যে কেরানী, নানা শ্রেণীর ছোট বড় সরকারী চাকুরে, শিক্ষক, অধ্যাপক, ডাক্তার, উকিল মোক্তারে মিলিয়া যে মধ্যবিত্ত সমাজ, গড়িয়া তুলিয়াছে—নব্য বাঙালী সংস্কৃতির সেই আধার গড়িয়া উঠিত কি ? ইংরেজী শিক্ষার ফলে, অর্থাৎ সাহিত্যশিক্ষার ফলে সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির ধারক বাহক যে মধ্যবিত্ত সমাজ পাইয়াছি, তার স্থানে পাইতাম মজুর-কারিগরের সমাজ। কেরানী-গড়া শিক্ষার ব্যতিক্রম স্বরূপ আমরা বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, ভূদেব, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতিকে পাইয়াছি। কারিগর-গড়া পেশার ব্যতিক্রম স্বরূপ কি এক-আধটা হেনরি ফোর্ড বা এডিসনকে পাইতাম ? বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, দীনবন্ধু প্রভৃতি কারিগররূপে কারখানায় ঢুকিলে বিচক্ষণ "মেট" হয়ত পাইতাম, আর হয়ত নয়, সুনিশ্চিত ইংরেজ রাজত্ব আরও বেশী কায়েম হইয়া বসিত এদেশে। কে না জানে সে ইংরেজের শিক্ষাই নব্য শিক্ষিতদের ইংরেজদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছিল !

কেরানী-গড়া শিক্ষায় সমর্থন আনার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু সেকালের বিখ্যাত শিক্ষা বিষয়ক মন্তব্য কেরানী-গড়ার নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে নাই, চাহিয়াছিল পাশ্চাত্য সাহিত্যবিদ্যাকে প্রতিষ্ঠা করিতে। তৎসত্ত্বেও প্রধানত যদি কেরানী গড়িয়া উঠিয়া থাকে তজ্জন্য সাহিত্যবিদ্যাকে দায়ী করা চলে না। রবীন্দ্রনাথ যাহাকে "বড় ইংরাজ" বলিয়াছেন, সে চাহিয়াছিল সাহিত্যবিদ্যার প্রভাবে মনের দরজা জানলা খুলিয়া দিতে, আর তিনি যাহাকে "ছোট ইংরাজ" বলিয়াছেন, সে চাহিয়াছিল শিক্ষিতদের সম্মুখে অফিস ঘরের দরজাগুলি খুলিয়া দিতে। কেহই কল-কারখানার পথটার দিকে ইঙ্গিত করে নাই, করিলে কী হইত ভাবিতে ভয় করে—একটা আস্ত গোটা সমাজ কারিগর হইয়া উঠিলে কল্যাণ হইত ভাবিত পারি না।

সেকালের ইংরেজ আমাদের ব্যবহারিক ও বৈষয়িক জীবনের বড় বড় দরজাগুলো বেশ আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিল সত্য, কিন্তু জানলাগুলা বন্ধ করে নাই বা করিতে চাহে নাই। আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য ইংরেজ সদাগরের হাতে গিয়া পড়িল, দেশ শাসনকার্য ইংরেজ সিভিলিয়ানের হাতে গিয়া পড়িল, আমাদের উপনিবেশ নাই, বহির্বাণিজ্য নাই, বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্বন্ধ আমাদের

জনশ্রুতিযোগে। এই ত আমাদের অবস্থা। কিন্তু সৌভাগ্য এই যে, জানলাগুলো বন্ধ হয় নাই। সাহিত্যবিদ্যা সেই জানলা। সেই জানলা দিয়া আমাদের কল্পনা উধাও হইয়া যাইত, অজানাদেশের হাওয়া সেই জানলা দিয়া ঢুকিয়া ঘরের মধ্যে মাতামাতি করিত। আমরা বাঁচিয়া গেলাম, পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ না করিলেও যে প্রাণে মরিলাম না তাহা ঐ সাহিত্যবিদ্যার কল্যাণে। গত দেড় শ' বছরে আমাদের সামগ্রিক জীবনে যে সুফল ফলিয়াছে তাহা ঐ সাহিত্য-বিদ্যার কল্যাণে যে কুফল ফলিয়াছে তাহা ঐ সাহিত্যবিদ্যার অকল্যাণে, আমরা প্রাণে বাঁচিয়া গেলাম এটি কল্যাণ; আমরা পূর্ণ স্বাস্থ্য হইতে বঞ্চিত হইলাম এটি অকল্যাণ। সাহিত্যবিদ্যার বদলে কারিগরিতে দীক্ষালাভ করিলে আমাদের আত্মিক মৃত্যু ঘটিত।

অনেকে বলিবেন কথাটা মিথ্যা নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা দিক ভাবিতে হয়। তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, ইংরেজ-শাসনে সাহিত্যবিদ্যায় হাতেখড়ির ফলে আমাদের যেমন উন্নতি ঘটিয়েছে, বৈষয়িক দিকে তেমন কিছু ঘটে নাই। বৈষয়িক দিকের দীনতা আমাদের পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে, সাহিত্যবিদ্যার সাধ্য নাই সে দীনতা পূরণ করে। এখন যন্ত্রবিদ্যার সাহায্যে সে ঘাটতি পূরণ করিয়া লইতে হইবে, নতুবা সাহিত্য-বিদ্যার পূর্ণ ফলটাও আমরা ভোগ করিতে পারিব না। দেহযন্ত্রে জঠরের উপর হৃদয়ের সংস্থান। শূন্য জঠর কি পূর্ণ হৃদয়ের যোগ্য বাহন? তাঁহারা বলিবেন, ইংরেজ-শাসনে দেশের সাহিত্যবিদ্যার পাখানা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, এধারে যন্ত্রবিদ্যার পাখানাকে টানিয়া সাহিত্যবিদ্যার সঙ্গে সমান করিতে পারিলে তবে ত অগ্রসর হইতে পারিব। দুই পায়ে সমান ধাপ ফেলিতে পারিলে তবেই এগনো যায়, এইত চলার স্বাভাবিক নিয়ম। স্বভাবের নিয়মে দেশে চিত্তবল ও বিত্তবল এখন যদি যন্ত্রবিদ্যার চর্চায় নিয়োজিত হয়, তবে খারাপটা কী, এই ত হওয়া উচিত।

এই যুক্তির মধ্যে কিছু সারবত্তা আছে, একেবারে অগ্রাহ্য করিবার মত কথা এ নয়। বরঞ্চ অনেকের কাছেই কথাটা যুগোচিত বলিয়া মনে হইবে। তাঁহারা বলিবেন আজকার পৃথিবীতে যে দুটি অতিকায় রাষ্ট্র সবচেয়ে শক্তিমান, সেই মার্কিন ও সোভিয়েট রাশিয়া যন্ত্রবিদ্যায় শ্রেষ্ঠ। তাহাদের প্রতাপের মূলে যন্ত্রবিদ্যার সাফল্য। ইংলণ্ডের সে প্রতাপের দিন আর নাই। কিন্তু যখন

ছিল তখনও ঐ একই কারণে ছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষে ও উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে যন্ত্রবিদ্যায় ইংলণ্ড ছিল প্রাগ্রসরতম। এ সব ত ইতিহাসের কথা আর বর্তমানের দৃষ্টান্তটা ত চোখে দেখা সত্য—অস্বীকার করিবার উপায় কী? কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভাবিবার বিষয় আছে।

ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষের যথেষ্ট অগ্রগতি হইয়াছে, কিন্তু সে অগ্রগতি একঠেঙে মানুষের কাজেই তা স্বাভাবিক নয়। সাহিত্যবিদ্যার এক পায়ে দীর্ঘ ধাপ ফেলিয়া আমরা অগ্রসর হইয়াছি, যন্ত্রবিদ্যার পাখানা কাজে লাগে নাই। এখন পৃথিবীর বৃহত্তর ক্ষেত্রে সেই অভিনয় হইতে চলিয়াছে। পৃথিবীর প্রবল ও প্রধান রাষ্ট্রগুলি আজ যন্ত্রবিদ্যার পায়ে প্রচণ্ড লাফ মারিতে উদ্যত, সাহিত্য-বিদ্যার পাখানা নিতান্ত অনুগামী মাত্র। সাহিত্যবিদ্যার একঠেঙে চাল যদি সুখকর, স্বাস্থ্যকর ও স্বাভাবিক না হয়, তবে যন্ত্রবিদ্যার একঠেঙে চালও তা-ই, কেবল বিপরীতভাবে তা-ই। সাহিত্যবিদ্যার যদি আতিশয্য আমাদের বিষয়-বিমুখ করিয়া থাকে, তবে যন্ত্রবিদ্যার আতিশয্যেও প্রবল ও প্রধান রাষ্ট্রগুলিকে যথার্থ কল্যাণের বিমুখ করিয়া তুলিবে। সমস্ত স্বার্থ ও সমস্ত শক্তির সামঞ্জস্যই যথার্থ কল্যাণ। মানুষের মনে কোন একটা দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলে সেই সামঞ্জস্যবোধ নষ্ট না হইয়া পারে না। পৃথিবীতে আজ যে ব্যাপক অশান্তি তাহার মূলে নষ্টপ্রায় সামঞ্জস্যবোধ। সাহিত্যবিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যার হেরফের ঘটিয়া গিয়া এই কাণ্ডটি ঘটাইতেছে।

অস্বীকার করিবার নাই যে, যন্ত্রবিদ্যার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়, তাহা দেখা যায়, দেখানো যায়, ওজন করা যায়, মাপা যায় এবং সিন্দুকে ভরিয়া রাখা যায়। যন্ত্রবিদ্যা মানুষকে বিত্তবান ও শক্তিমান করে। সাহিত্যবিদ্যার ফল এমন প্রত্যক্ষ নয়, তাহাকে অস্বীকার করিতে বেগ পাইতে হয় না, নাই বলিলে আছে প্রমাণ করা মুশকিল। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া শক্তিমান হইয়া উঠিবার প্রতি-দ্বন্দ্বিতা এ যুগকে পাইয়া বসিয়াছে, কাজেই যন্ত্রবিদ্যার বড় আদর আধুনিক কালে। আমাদের মনটাও সেই হাওয়ায় যে আন্দোলিত হইবে, সেটা ত খুবই স্বাভাবিক। বাঁচিয়া যখন থাকিতে হইবে, তখন যন্ত্রবিদ্যাকে অস্বীকার করিতে যাইব কেন? কেবল দেখিতে হইবে যে, সাহিতবিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যার স্বাভাবিক অনুপাত বা সামঞ্জস্য যেন নষ্ট না হইয়া যায়। একথা বলিয়া লাভ নাই যে, এক সময়ে যেহেতু সাহিত্যবিদ্যার ঐকান্তিক চর্চা করিয়াছি, এখন না হয়

কিছুদিন যন্ত্রবিদ্যায় ঐকান্তিক চর্চা চলুক। এক সময়ের অস্বাভাবিকতাকে নজিররূপে ব্যবহার করা চলে না। তা ছাড়া আরও কারণ আছে। সাহিত্য-বিদ্যায় আনুরক্তি আমাদের মনকে যন্ত্রবিদ্যার প্রতিকূল করিয়া তোলে নাই। যন্ত্রবিদ্যার আনুরক্তিতে সে আশঙ্কা আছে, সাহিত্যবিদ্যার প্রতি বিরাগ অসম্ভব নয়। যন্ত্রবিদ্যার দীক্ষায় প্রবল রাষ্ট্রগুলি সাহিত্যবিদ্যার সার্থকতা সম্বন্ধে উদাসীন। 'সংস্কৃতি' ও 'সাংস্কৃতিক' শব্দ দুটি আজকাল খুব চড়া দামে বিকাইতেছে সত্য, কিন্তু ইহা 'Culture' বা 'Cultural' শব্দ দুটির প্রতিশব্দ নয়। যন্ত্রবিদ্যায় দীক্ষিত চিত্ত আপন অভিপ্রায় ও ধারণা অনুসারে 'Culture'-কে 'সংস্কৃতিতে' রূপান্তরিত করিয়াছে। 'Culture' 'যত মত তত পথ' স্বীকার করে, 'সংস্কৃতি' 'এক মত এক পথ' ছাড়া কিছু জানে না। যন্ত্রবিদ্যা আপন স্বার্থে অনেক সময়ে সাহিত্যবিদ্যার ঠাট বজায় রাখে সত্য, কিন্তু সুকৌশলে বস্তু বদল করিয়া নেয়। তাই প্রথম নজরে 'সংস্কৃতিকে' 'Culture' বলিয়া ভ্রম হইলেও বস্তুত ঐ দুই স্বতন্ত্র। সাহিত্যবিদ্যা যন্ত্রবিদ্যার মূল্য বোঝে, যন্ত্রবিদ্যা সাহিত্যবিদ্যার মূল্য বোঝে কিনা সন্দেহ, স্বরূপত বোঝে না নিশ্চয়। উদাহরণ স্বরূপ Culture ও সংস্কৃতির উল্লেখ করিলাম।

সাহিত্যবিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যার মধ্যে রেষারেষি সৃষ্টি করিয়া যন্ত্রবিদ্যাকে একঘরে করিবার উদ্দেশ্যে এ প্রবন্ধ রচিত নয়। সুষ্ঠু সমাজজীবন যাপনের জন্য সাহিত্যবিদ্যাও চাই, যন্ত্রবিদ্যাও চাই, তবে সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনার অন্তর্গত করিয়া চাই। পরিকল্পনাধীনভাবে উভয় বিদ্যার প্রসার ঘটিলে সমাজ দুই পায়ের স্বাভাবিক চাল ফিরিয়া পাইবে। কিন্তু আশঙ্কার বিষয় এই যে, যন্ত্র-বিদ্যার প্রসার সুপরিকল্পিতভাবে ঘটিতেছে না, যেমন এককালে সাহিত্যবিদ্যার প্রসার সুপরিকল্পিতভাবে ঘটে নাই।

রাতারাতি বৈষয়িক উন্নতি ঘটাইবার আশা কেন্দ্রীয় সরকার ও অঙ্গরাজ্য সরকারসমূহ যন্ত্রবিদ্যা প্রসারের উপরে প্রবল ঝোঁক দিয়াছেন। ছাত্রসমাজও সেই দিকে গড়াইয়াছে। অর্থবল ও লোকবল এক্ষণে দুই-ই যন্ত্রবিদ্যামুখী। যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষার বিশেষ শিক্ষায়তন সংখ্যায় বাড়িতেছে; কলেজের বিজ্ঞানশ্রেণী উপছাইয়া যাইতেছে; আর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান কোণঠাসা হইবার মত আত্মজ যন্ত্রবিদ্যার চাপে। কিন্তু সংখ্যার হিসাবটাই মুখ্য নহে। দেশের অধিকাংশ মেধাবী ছাত্র ঝুঁকিয়াছে যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষালয়ে। সরকারের

উৎসাহ, অভিভাবকের আগ্রহ, ছাত্রসংখ্যা ও মেধাবা ছাত্র সমস্তই আজ যন্ত্রবিদ্যার অনুকূল। ইহাকেই বলি পরিকল্পনাহীন অগ্রগতি। সাহিত্যবিদ্যা আজ কোনরকমে তৈলনিঃশেষ শিখার মত টিকিয়া আছে। আর দু-এক দণ্ড অতিক্রান্ত হইলেই সব অন্ধকার। তবু এ কেবল কলির সন্ধ্যা। বর্তমান প্রজন্ম যন্ত্রবিদ্যার ঠিক পুরা সুফল পাইবে না, কিন্তু দ্বিতীয় প্রজন্মে যখন পুরা ফল ফলিতে শুরু করিবে, কলকারখানার প্রথম ফসল ঘরে উঠিতে আরম্ভ করিবে তখন সাহিত্যবিদ্যার প্রতি শেষ অনুরাগ ও আস্থাটুকু লোপ পাইবে, শুরু হইয়া যাইবে বৈষয়িক বর্বরতার যুগ। ইংরেজী শিক্ষায় আদি পর্বে পরিকল্পনাধীন সাহিত্যশিক্ষার সংঘাতে নষ্ট ও বিকৃত হইয়াছে দেশের প্রাচীন সংস্কৃতজ 'কালচার' —এবার নষ্ট হইতে চলিল সাহিত্যবিদ্যাজাত নব্য কালচার। সেকালে বাড়ির মেধাবী ছেলেটিকে পাঠান হইত হেয়ার সাহেবের স্কুলে বা পরবর্তী কালে হিন্দু কলেজে আর স্থূলবুদ্ধি ছেলেটি যাইত গ্রামের চতুষ্পাঠীতে। এইভাবেই দীর্ঘকাল চলিয়াছে। ফল হইয়াছে, সংস্কৃতজ কালচারের বিকার বা নাশ। এখনও অনুরূপ প্রক্রিয়া চলিতেছে, তবে ভিন্ন ক্ষেত্রে বাড়ির মেধাবী ছেলেটি যাইতেছে যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে, দ্বিতীয় বিভাগে পাস ছেলেটির জন্য উন্মুক্ত কলেজের সাহিত্য শ্রেণীগুলি। ইহার পরিণামও কি অনুরূপ নয়? সাহিত্য-বিদ্যা যে মানুষকে 'মানুষ' করে না, তাহার পরীক্ষা কি হইবে দ্বিতীয় বিভাগের ছাত্রের মেধার সাহায্যে?

যদি এ আশঙ্কা সত্য হয়, যদি সাহিত্যবিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা অবশ্য কর্তব্য হয়, তবে অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এক্ষেত্রেও পরিকল্পনা অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়। সুপরিকল্পিত জীবনেরই অন্য নাম সমাজতন্ত্র। পরিকল্পনার ছাঁচ গড়িয়া দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, সে সাধ্যও আমার নাই। দেশের সমস্ত মেধাবী ছাত্র যাহাতে যন্ত্রবিদ্যার দিকে না ঝুকিয়া পড়ে, তাহাই হইতেছে পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। ছাত্রসমাজের মেধার ও সরকারী অর্থানুকূল্যের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে,তবেই সাফল্যলাভের আশা।

আশঙ্কা করিতেছি অনেকে চমকিয়া উঠিয়া বলিবেন, সর্বনাশ। এ যে Regimentation-এর মত শোনাইতেছে, এ ত ডিক্টেটারশিপের পথ! তাঁহারা বলিবেন, আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এব্যবস্থা কখনই চলিতে পারে না। তাঁহাদের কথার উত্তরে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে, ডিক্টেটারশিপের

প্রশস্ততম ও সুগমতম পথ যন্ত্রবিদ্যার প্রসার। যন্ত্রবিদ্যা যেমন মানুষের মনকে অল্প সময়ে, আপনার অগোচরে ছাঁচে ঢালাই করিতে সমর্থ এমন আর কিছুই নয়। এ সত্য ডিক্টেটারগণের চেয়ে কেহ বেশী জানে না—তাই তাঁহাদের রাজ্যে যন্ত্রবিদ্যার এত আদর। যন্ত্রবিদ্যা দেশের মনকে কর্তৃপক্ষের অভীষ্ট ছাঁচে ঢালাই করে, মানুষ ক্রমে সংখ্যায় পরিণত হইয়া নৈর্ব্যক্তিক যন্ত্রে পরিণত হয়, আবার যন্ত্রবিদ্যা দেশের সামরিক শক্তিকেও পুষ্টতর করিয়া তোলে। একাধারে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র শাসনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয় যে যন্ত্রবিদ্যা তাহার আদর না হইয়া যায় না ডিক্টেটারশাসিত রাষ্ট্রে। সাহিত্যবিদ্যা ডিক্টেটারশিপের পরম প্রতিষেধক। সেই সাহিত্যবিদ্যাকে উপেক্ষা করিয়া যন্ত্রবিদ্যার কাছে একান্ত-ভাবে আত্মসমর্পণ করিলে শেষ পর্যন্ত এক সময়ে ডিক্টেটারশিপের কাছেও আত্মসমর্পণ করিতে হইতে পারে। সেই সর্বাঙ্গীণ Regimentation-এর ভীতি হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যেই সামান্য এই পরিকল্পনাটুকু মানিয়া লওয়া উচিত। অনিয়ন্ত্রিত ও পরিকল্পনাহীন যন্ত্রবিদ্যা চরিতার্থতার পথ নয়—সঙ্গে সাহিত্যবিদ্যার সুষ্ঠু মিশ্রণ অত্যাবশ্যক।

# যান-যন্ত্র ও সাহিত্য

রমেশচন্দ্র দত্ত যখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তখন তাঁকে অনেক সময় নৌকাযোগে ভ্রমণ করতে হত। নৌকাভ্রমণ কালে তাঁর প্রিয় পাঠ্যগ্রন্থ ছিল গীবন লিখিত 'রোম সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস' আবার যৌবনে রবীন্দ্রনাথের একবার শখ হয়েছিল যে তিনি গরুর গাড়ি করে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড বরাবর রওনা হবেন। অবশ্য তাঁর এই শখ অন্য অনেক শখের মতই পূরণ হয় নি। যদি তিনি সত্যই যাত্রা করতেন, তবে পাঠ্য হিসাবে 'মহাভারত' ছাড়া আর কোন গ্রন্থ নির্বাচন করতেন জানি না। গীবনের ইতিহাস ও মহাভারত—মন্থরযান ও দীর্ঘপথের যথার্থ সঙ্গী।

এখন নৌকা ও গরুর গাড়ির যুগ গিয়েছে। নিতান্ত বাধ্য না হলে কেউ এসব যানবাহন ব্যবহার করে না। রেলগাড়ি মোটরগাড়ি ও এরোপ্লেন এখন যুগোচিত যানবাহন। যদিচ এখনও অতিকায় উপন্যাস সব দেশেই লিখিত হচ্ছে। তবুও এগুলি অতীতের জের, প্রাচীন অতিকায় জন্তু-জানোয়ারের শেষচিহ্নস্বরূপ। এখন আর কেউ গীবনের ইতিহাস বা মহাভারত নিয়ে রেল-গাড়িতে মোটর গাড়িতে বা এরোপ্লেনে চাপবার কথা ভাবে না। পথ দীর্ঘ হলেও ভাবে না। রেলস্টেশনে বইয়ের দোকানে যে-সব গ্রন্থ সাধারণতঃ বিক্রী হয় তাদের মধ্যে যুগবাহনের প্রভাব আছে। কিংবা বলা উচিত যে যুগবাহনের প্রভাবেই অনুপ্রাণিত হয়ে এসব বই লিখিত হয়েছে। এদের আকৃতি ছোট, প্রকৃতি হালকা, মূল্য সুলভ। গাড়িতে উঠবার সময় কিনে নেওয়া যায়, আর নামবার সময় ভুলে ফেলে গেলেও মনে তেমন দুঃখ অনুভূত হয় না। ওসব বইয়ের পাঠ্যবস্তু রেলগাড়ির গতির মতই একটা অবাস্তব ব্যাপার। কোথাও কোন চিহ্ন রেখে যায় না। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে মহৎ লেখক ও বৃহৎ ঘটনা সাহিত্যের আকৃতি ও প্রকৃতিতে যেমন পরিবর্তন ঘটায়, তেমনি বা ততোধিক পরিবর্তন ঘটায় যানবাহনের গতির দ্রুতি বা মন্থরতায়।

ইংরাজিতে যাকে 'থ্রিলার' জাতীয় বই বলে, যার মধ্যে নাকি এডগার এ্যালেন পো ও কোনান ডয়েলের রচনার মত উচ্চাঙ্গ সাহিত্য আছে তাদের মূল

প্রেরণা রেলগাড়ির মত দ্রুত গতিবিশিষ্ট যানবাহন। আবার উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ইংলণ্ডের নানা বিভিন্ন রুচির মাসিকপত্রে যে বিরাট চাহিদা দেখা দিয়েছিল, তার মূলেও আছে, যানবাহনের ব্যাপক প্রচলন ও তাদের দ্রুতগতি। এইসব মাসিকপত্রে দুই ধরনের লেখা থাকত স্বয়ংসম্পূর্ণ ছোটগল্প ও ধারাবাহিক উপন্যাস। ও দুইয়ের উদ্দেশ্য আলাদা। অস্থায়ী পাঠকের জন্যে ছোটগল্পগুলি আর স্থায়ী গ্রাহকদের জন্যে ধারাবাহিক রচনা। একথা সত্য হলেও স্বয়ংসম্পূর্ণ ছোটগল্পের দিকেই সম্পাদকদের ঝোঁক ছিল বেশি। 'স্টাণ্ড ম্যাগাজিনে' কোনান ডয়েলের ডিটেকটিভ গল্পগুলি দীর্ঘকাল ধরে প্রকাশিত হয়েছে। যেগুলি সাহিত্যেব স্থায়ী কোঠায় স্থান পেলেও তাদের প্রথম পাঠক ছিল রেলগাড়ির ডেলি-প্যাসেঞ্জারগণ। কিন্তু কালের নিয়মে ও রেলগাড়ির গতিকে বহুদূরে ছাড়িয়ে গেছে এরোপ্লেনের গতি। গীবনের ইতিহাস যদি নৌকাভ্রমণের যোগ্যপাঠ্য হয়, কোনান ডয়েলের ছোটগল্পগুলি যদি রেল-গাড়ির যোগ্যপাঠ্য হয়, তবে এরোপ্লেনের যোগ্যপাঠ্য তৈরি হয়ে উঠেছে কি? এরোপ্লেন যোগে কলকাতা থেকে দিল্লী যেতে যে সময়টুকু লাগে, তাতে খুব বড়জোর, খান দুই সংবাদপত্র পাঠ করার সময় পাওয়া যায়। অবশ্য এরোপ্লেনের যাতায়াত শুধু কলকাতা দিল্লীর মধ্যে নয়। কলকাতা থেকে লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক, আদ্দিস আবাবা প্রভৃতি স্থানেও লোকে যাচ্ছেন। কোন জাতীয় পাঠ্য নিয়ে তারা বিমানে চড়ছে। ঘর থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়া যে অসম্ভব তা নয়, তবে অধিকাংশ যাত্রী বই সংগ্রহ করে এয়ারপোর্টের বইয়ের দোকানে। সে-সব দোকানে কি জাতীয় বই পাওয়া যায় অনেকেই জানেন। আকৃতি প্রকৃতি ও মূল্যে লঘু শ্রেণীর রচনাই সাড়ে পনেরো আনা। যাত্রীর ব্যক্তিগত রুচি যাই হোক, দোকানের রুচির কাছে আত্মসমর্পণ করতে সে বাধ্য হয়।

চন্দ্রলোকের যাত্রীরা সঙ্গে কোন বই বা পত্রিকা নিয়েছিল কিনা, কী জাতীয় বই বা ম্যাগাজিন নিয়েছিল, সে-সব ধীর ভাবে পড়বার সুযোগ তাদের হয়েছিল কিনা এবং পড়বার ফলে তাদের মনে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল জানতে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। এখানে একটি মূল প্রশ্নের আলোচনা সেরে নেওয়া যেতে পারে।

মানুষ আদৌ বই পড়ে কেন? বলাবাহুল্য আনন্দ বা জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে। অত্যন্ত হালকা প্রকৃতির বই ছাড়া আর গ্রন্থপাঠে অনভ্যস্ত ব্যক্তিমাত্রে একথা

অস্বীকার করব না। তবে আনন্দ ও জ্ঞানের শ্রেণীভেদ আছে। গীবনের ইতিহাস পড়লে যে ধরনের জ্ঞান পাওয়া যায় আর পরিসংখ্যানমূলক গ্রন্থে, পৃথিবীর মধ্যে কোন রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্ম সবচেয়ে দীর্ঘ, কোন ইমারত সবচেয়ে উচ্চ—প্রভৃতির দৈর্ঘ্য ও উচ্চতামূলক যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তা নিশ্চয়ই এক-শ্রেণীর নয়। ম্যাকবেথ নাটক পাঠের আনন্দ এবং মার্কিন 'থ্রিলার' পাঠের আনন্দ নিশ্চয়ই ভিন্নশ্রেণীর। এ দুই শ্রেণী নামে এক হলেও বস্তুত এদের এক বলা ভাষার অপব্যবহার। শেষোক্ত শ্রেণীর আনন্দ ও জ্ঞানলাভেচ্ছু পাঠকগণ আসলে সময় কাটাবার জন্যে বই পড়েন, যদিচ তাঁরা জানেন না বা স্বীকার করতে রাজী নন। সে-সব গ্রন্থকে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য বলা হয়, সময় কাটাবার জন্যে কেউ তা পড়ে না, সময়কে বহুগুনিত করবার আশাতেই যে-সব পড়ে থাকে। অর্থাৎ কারো কাছে সময় অবাঞ্ছিত বোঝা। কোন রকমে সেটাকে পাশ কাটিয়ে যাবার উদ্দেশ্যেই অধিকাংশ লোক বই পড়ে থাকে। অবশিষ্টদের কাছে সময় অমূল্য সম্পদ তার মূল্য বাড়িয়ে নেবার উদ্দেশ্যেই বই পড়তে তারা অভ্যস্ত। এখন আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, যানবাহনের গতির ত্বরা এবং মানুষের জীবনের ব্যস্ততা যুগোচিত এক সাহিত্যের সৃষ্টি করেছে। যার প্রধান উদ্দেশ্য কোনরকমে সময় কাটাতে সাহায্য করা আর স্বভাবতঃই সেই জন্যে সেগুলি হাল্কা উপাদানে গঠিত। এই ব্যস্ত সমস্ত যুগের বিশিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত রচনা ছোট গল্প।

এ হেন যানবাহন সাহিত্যে পরিবর্তন ঘটাচ্ছে, তেমনি বা ততোধিক পরিবর্তন ঘটাচ্ছে নানাবিধ যন্ত্রে—গ্রামোফোন, বেতার, সিনেমা, টেলিভিশন প্রভৃতি সাহিত্যের উপরে যে প্রবল প্রভাব বিস্তার করছে—সে বিষয়ে আমরা সব সময় সম্পূর্ণ সচেতন নই। এখনও দেখা যায় যে, কোন একখানা বই রঙ্গ-মঞ্চে, গ্রামোফোনে, সিনেমা, বেতারে ও টেলিভিশন-যোগে বিতরণ করা হচ্ছে। কিন্তু এমন সময় শীঘ্রই আসবে, হয়তো বা ওদেশে ইতিমধ্যেই এসেছে যে, বেতার ও টেলিভিশনের জন্যই আলাদা ধরনের গ্রন্থ লিখিত হবে। আরো আগের ইতিহাস ধরতে মুদ্রাযন্ত্রকেও এদের মধ্যে ধরা উচিত। মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত ও ব্যাপকভাবে প্রচারিত না হলে গদ্য-সাহিত্য বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয়ে পদ্য-সাহিত্যকে কোণঠাসা করে দিতে পারত না। অর্থাৎ মুদ্রাযন্ত্রকে একটি যন্ত্রমাত্র মনে করলে ভুল হবে। সাহিত্যের আকৃতি ও প্রকৃতি গঠনে মুদ্রাযন্ত্র অতিশয়

সজীব সক্রিয় সত্তা। কিন্তু অতদূরের ইতিহাসে আমাদের কাজ কি? বিংশ শতকের গোড়া থেকেই আলোচনা করা যেতে পারে। আগে যে-সব যন্ত্রের উল্লেখ করেছি, তাদের মধ্যে এখন পর্যন্ত বেতারের প্রভাবটাই সবচেয়ে ব্যাপক। বেতারে মানুষ এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, বেতারের কৃপায় দিনের মধ্যে পাঁচ ছয় বার সংবাদ শুনবার সুযোগ পাচ্ছে—যার ফলে ভোরবেলাকার সংবাদপত্রের সংবাদকেও আর নূতন মনে হয় না। পরদিন প্রভাতে আবার যখন তার হাতে সংবাদপত্র এসে পৌঁছল, তার আগেই দিনে রাতে সন্ধ্যায়, পাঁচ ছয়বার সংবাদ শুনবার সুযোগ পায়। ফলে পরদিন ভোরের কাগজ তার কাছে অনেক পরিমাণে পুনরাবৃত্তি। মানুষের মনের তাল অত্যন্ত দ্রুত হয়ে গেছে। যার ফলে দৈনিক সংবাদপত্র তার কাছে পুরনো। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে ত্রৈমাসিক কাগজের খুব আদর ছিল। পরে তার স্থান অধিকার করে নিল মাসিকপত্র। বর্তমানে মাসিকপত্রের প্রতি পাঠকের এমন অনিচ্ছা দেখা যায় যে মাসিকপত্রের যুগও গত বা গতপ্রায়। এখন চাহিদা সাপ্তাহিকের, কিন্তু সাপ্তাহিকও পিছিয়ে পড়বে। যখন 'দৈনিক' পুরাতন বলে মনে হয় তখন 'সাপ্তাহিকে'র আর কি আকর্ষণ থাকতে পারে। শীঘ্রই অর্ধ-সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশিত হলে বিস্মিত হব না। যানবাহন সম্বন্ধে যা বক্তব্য, যন্ত্র সম্বন্ধেও সেই একই কথা। এই সব যন্ত্রের উদ্ভবে সাহিত্যের প্রকৃতিতে দ্রুত ও বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটছে। সে পরিবর্তন যে সব সময় শুভকর তা নয়, তবে এখন পর্যন্ত অধিকাংশ লেখক কলমের চেয়ে জটিলতর যন্ত্রের উপরে নির্ভরশীল নয়। কাজেই প্রাচীন প্রথার এখনও প্রাধান্য। কিন্তু খুব শীঘ্রই এমন দিন আসবে যে যন্ত্র দিয়েই যাদের হাতেখড়ি সেই সব লেখকই প্রধান হয়ে উঠবে। রঙ্গমঞ্চ, সিনেমা, বেতার, টেলিভিশন সমস্তই কর্মগ্রাহী মিডিয়াম অর্থাৎ এই সব যন্ত্রযোগে যারা সাহিত্যের রসগ্রহণ করে চোখের চেয়ে কানের উপরেই তাদের নির্ভর বেশি। বললে অন্যায় হবে না যে তারা 'পাঠক নয় শ্রোতা'। প্রাচীনকাল থেকে অক্ষর পরিচয়ের উপর সাহিত্যের রসোপভোগ ক্ষমতা নির্ভরশীল ছিল কিন্তু পূর্বোক্ত যন্ত্রগুলির কল্যাণে যে বিরাট শ্রোতৃসম্প্রদায় গঠিত হয়ে উঠেছে—তাদের আদপেই অক্ষর-পরিচয়ের উপর নির্ভর করতে হবে না। অবশ্য এই যন্ত্রপ্রধান সাহিত্য যারা সৃষ্টি করবে তারা লেখাপড়া শিখবে। অর্থাৎ দাঁড়াবে এই মুষ্টিমেয় একদল সাক্ষর সাহিত্যিক আর জগৎ-জোড়া একদল নিরক্ষর শ্রোতা। সাহিত্য প্রচারের যে সমস্ত মিডিয়াম সৃষ্টি হয়েছে এবং আরো হবে, সাহিত্য ও স্বাক্ষরতার উপর তাদের প্রভাব কি রকম হবে তারই কিছু আভাস এই প্রবন্ধে দেওয়া গেল।

# সংস্কৃতি ও বেতার

কয়েকদিন আগে কলকাতা বেতারকেন্দ্রের একজন প্রধান ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কথাপ্রসঙ্গে বললাম যে কলকাতা বেতারকেন্দ্রের কোন কোন কর্মসূচীতে একটা অবনতির ভাব দেখা দিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ রবীন্দ্রসঙ্গীত পুস্তক-পরিচয় ও সাহিত্য-আলোচনার কর্মসূচীর দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। এইসব কর্মসূচীর সবগুলিই যে অপরিণত কণ্ঠের ও অপরিণত বুদ্ধির এমন নয়, তবে অনেকগুলি বটে। যে প্রতিষ্ঠান মাসে ত্রিশদিন এবং বছরে ৩৬৫ দিন এ সব পরিবেশন করছে সেখানে কতক নিম্নমানের হওয়া অপরিহার্য। কিন্তু তারও একটা স্বাভাবিক সীমা আছে। বেশ কিছুকাল থেকে দেখছি কলকাতা বেতারে সেই সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুরু হল, অনেক আশা নিয়ে বসলাম, দু-এক মিনিটের মধ্যেই চাবি বন্ধ করে দিতে হল, সঙ্গীত-বিদ্যায় তানসেন না হয়েও বুঝতে পারা যায় যে গায়কের (অনেক ক্ষেত্রেই গায়িকার) গলা এখনও তৈরী হয় নি। পুস্তক পরিচয় এমন ব্যক্তি দিতে আরম্ভ করেন যার পরিচয় কেউ জানে না বললেই হয়। সাহিত্য-আলোচনার ক্ষেত্রেও এমন উদাহরণ অবিরল। আমার এই মৃদু গঞ্জনার উত্তরে বেতারকেন্দ্রের সেই প্রধান ব্যক্তি বললেন, আসল কথা কি জানেন আমরা এখন 'ফসিল'দের বাদ দিয়ে চলতে চাই। 'ফসিল' শব্দটি শুনবামাত্র বিদ্যুৎ-প্রবাহবৎ মনের মধ্যে অনেক স্মৃতি চমকে উঠল। এই শব্দটির দোহাই দিয়ে সাহিত্যে, রাজনীতিতে, শিক্ষায় অনেক খেলা চলছে যার পরিচয় সংবাদপত্রে ও সাময়িকপত্রে নিত্য দেখতে পাই। এখন দেখলাম যে বেতারকেন্দ্রকেও ঐ মহামারী আক্রমণ করেছে। মানুষ কখন ফসিল হয় তার ধরা-বাঁধা কোন বৈজ্ঞানিক নিয়ম নেই। তবে ব্যবহারিক একটা নিয়ম আবিষ্কার বোধ করি অসম্ভব নয়। কোন ব্যক্তিকে বা মতবিশেষকে অপছন্দ হলেই তাকে ফসিল বলে চিহ্নিত করার চেয়ে আর সহজ কি হতে পারে? ভাবটা এই, আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি ফসিল, তুমি এখন প্রমাণ কর যে ফসিল নও। কোন পক্ষেই প্রমাণ করবার উপায় নেই, কারণ জীবন্ত মানুষ কখনো ফসিল হয় না।

একটা মৃত গাছের টুকরোকে ফসিল হতে হলে লক্ষ বৎসর তপস্যা করতে হয়। তবে হ্যাঁ, ক্ষমতাসীন ব্যক্তির মতের সঙ্গে না মিললে ফসিলে পরিণত হওয়া আশ্চর্য নয়। কাজেই বেতারকর্তার মত সহজবোধ্য ভাষায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায় এই যে, আমরা ( কারা ) ? কতকগুলি ব্যক্তিকে ও কতকগুলি মতকে পছন্দ করি, ( ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা কখনো কারণ দর্শায় না, কারণ প্রদর্শন ক্ষমতাহীনের স্বভাব ) তাই তাদের বাদ দিয়ে কর্মসূচী প্রণয়ন করতে চাই। এ-রকম ক্ষেত্রে তাদের যদি ফসিল আখ্যা দেওয়া হয়, তবে প্রমাণের দায়িত্ব পড়ে গিয়ে সেই হতভাগ্য মানুষ বা মতাবলম্বীদের উপরে।

অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে কিছুকাল আগে, বোধ করি বছর পনেরো হবে শলাকার বা উপদেষ্টা নামে সাহিত্যিকদের চাকরি দেওয়া শুরু হয়। তারপর থেকে কর্মসূচী প্রণয়নে জাত বিচার ও গোষ্ঠিতন্ত্রের সূত্রপাত। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা এমনই দৃষ্টিকটু হয়েছিল যে স্বভাবত অন্ধ কর্তৃপক্ষের নজর এড়াল না। উপদেষ্টাদের বাদ দিয়ে কাজ চালাতে হল। যতদূর জানি কলকাতা বেতারে এখন ঐ পদে কেউ আসীন নেই, অন্য বেতারকেন্দ্রের খবর ঠিক রাখি না। কিন্তু সেই যে সূত্রপাত হয়েছিল, কালক্রমে সেই সূত্র রজ্জুতে পরিণত হয়ে কলকাতা বেতারকে তথা তার হতভাগ্য শ্রোতাদের আষ্টেপৃষ্ঠে এমনই বেঁধেছে যে রবীন্দ্র সঙ্গীতের মত হৃদ্য প্রোগ্রামেরও চাবি তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিতে হয়, পুস্তক-পরিচয় ও সাহিত্য-আলোচনার কথা আর নাই বললাম। আমার মৃদু আপত্তি শুনে সেই কর্তা-ব্যক্তি বলেছিলেন, নূতন লোককে আমরা কর্ম-সূচীর মধ্যে আনতে চাই, সুযোগ না পেলে তাঁরা তৈরী হবেন কি করে? অতি উত্তম প্রস্তাব, নূতন লোককে অবশ্যই সুযোগ দিতে হবে, কিন্তু তার জন্যে পুরাতন শ্রোতাদের উপরে জুলুম কেন? অল ইণ্ডিয়া রেডিও নূতন গায়ক ও নূতন সমালোচকদের তৈরী করে তুলবার জন্যে ট্রেনিং স্কুল খুলুন, সরকারী টাকার মা-বাপ নেই, একটা জুৎসই পরিকল্পনা দিলেই গ্রাহ্য হয়ে যাবে। গ্রাহকরা নগদ মূল্যে বেতারযন্ত্র ক্রয় করেন এবং বছর বছর লাইসেন্সের টাকা গুণে দেন, তাঁরা অবশ্যই চান না যে ট্রেনিংটা তাঁদের উপর দিয়ে হোক, স্বভাবতই তাঁরা পরিণত ফল প্রত্যাশা করেন। কিন্তু যখন দেখেন যার গলা তৈরী হয়ে ওঠেনি সে গান শুরু করল, যার বুদ্ধি মার্জিত হয়নি সে সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান বিতরণ করতে শুরু করল, তখন বেতারের চাবি বন্ধ করে দেওয়া

ছাড়া কি উপায় থাকতে পারে? আমি বলেছিলাম, বয়সের তারুণ্য যদি কাম্য হয় তবে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন অনেক তরুণ অধ্যাপক আছেন যাঁরা ইতিমধ্যেই বাঙালী সমাজে সুধী বলে পরিচিত হয়েছেন, তাঁদের নিয়োগ করুন না কেন? যাদের সমাজে কোন পরিচয় নেই তাদের পরিচিত করার দায়িত্ব বেতারের নয়, বেতার জ্ঞান বিতরণের কেন্দ্র, আনাড়ির ট্রেনিং কেন্দ্র নয়। বলা বাহুল্য, এর উত্তর পাইনি।

বেশ কিছুকাল থেকে লক্ষ্য করছি বেতারের কর্মসূচীতে গোষ্ঠিতন্ত্র দেখা দিয়েছে। কয়েকটি বিশেষ নাম, একধরনের বিশেষ মত ঘুরে ফিরে দেখা দিচ্ছে। এরকম করবার অধিকার বেতারকেন্দ্রের নেই। প্রাইভেট সেকটর এমন কাজ করলে করতে পারেন, কিন্তু পাবলিক সেকটরে পক্ষে একাজ সম্পূর্ণ আইন বহির্ভূত। তারপরে মনে রাখতে হবে বেতারকেন্দ্র ঠিক পাবলিক সেকটারও নয়, তার চেয়েও বেশি, খাস সরকারী ব্যাপার। সরকারের কাছে 'অয়ং নিজ্যো পরোবেতি' নীতি চলা অনুচিত, কিন্তু দেখছি নিরঙ্কুশভাবে চলছে। কোন মন্ত্রে চলছে তা সাধারণের অজানা, অসাধারণে অবশ্যই জানে নইলে চলছে কি করে।

সংস্কৃতির সঙ্গে বেতারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। যেমন স্কুল কলেজ বিদ্যালয় বাছাই করে শিক্ষক গ্রহণ করেন এ ক্ষেত্রেও তাই হওয়া উচিত, কেন না ঐ সব প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেতারের প্রভাব বেশি বই কম নয়। ঐসব প্রতিষ্ঠানকে অনেক সময়েই টাকার ভাবনা ভাবতে হয়, বেতারের সে দুশ্চিন্তা নেই, তবে টাকা দিয়ে দাগী মাল পাচার করবার প্রচেষ্টা কেন? কারণ ছাড়া যখন কার্য হয় না তখন কারণ অবশ্যই আছে, সেই কারণটার অনুসন্ধান আবশ্যক। গোষ্ঠীবিশেষের মনোরঞ্জন সংস্কৃতির উদ্দেশ্য লোকরঞ্জন নয়, গোষ্ঠীরঞ্জন তো নয়ই, সংস্কৃতিয় প্রকৃত উদ্দেশ্য লোকহিত। তবে লোকরঞ্জন ও লোকহিতের মধ্যে দুর্মর বাধা আছে একথাও সত্য নয়। লোকহিতকরের লোকরঞ্জক হতে বাধা নেই। উদাহরণ স্বরূপ কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে সন্ধ্যা সাতটায় যে পল্লী বিষয়ক আলোচনা হয় তার উল্লেখ করা যেতে পারে। গাঁয়ের লোকের পক্ষে হিতকর চাষবাসের অনেক কথা সে সময় বিবৃত হয়ে থাকে, সে বিবরণ এমন সরসভাবে হয়ে থাকে যে তা একাধারে লোকরঞ্জক ও লোকহিতকারী। যাঁরা গাঁয়ের লোক নন, চাষবাস যাঁদের ব্যবসা নয়, তাঁরাও অনেকে ঐ কর্মসূচী শুনে আনন্দ পেয়ে থাকেন।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে লোকহিতকর হলেই যে নীরস হবে এমন কথা নেই। ঠিক এই নীতি সাহিত্য-আলোচনা ও পুস্তক পরিচয় সম্বন্ধে প্রযোজ্য হওয়া উচিত। কিন্তু এমন যে হয় না তার কারণ বক্তা এখনও নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখেনি। কারও অনুগ্রহে বা স্বকীয় তদ্বিরের জোরে তিনি অলক্ষ্য শ্রোতার সম্মুখে উপস্থিত। লোকহিতকর হওয়া দূরে থাকুক, লোকরঞ্জনের ক্ষমতাও তাঁর নেই। অনেক গায়ক সম্বন্ধেও এই কথা। সাধারণত দুটি করে গান গায়করা গেয়ে থাকেন। প্রথম গানটি গাইলেন, 'এ দিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার', তার পরের গান 'মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ'। ব্যস, একলাফে সকাল থেকে সন্ধ্যা। সুরের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, শব্দের মর্মগ্রহণেও গায়কের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান নেই। গ্রীষ্মের ঘর্মাক্ত দুপুর-বেলায় ঘনবর্ষার গান হচ্ছে এমন বিরল নয়। শুনেছি তানসেন মল্লার রাগ গেয়ে বৃষ্টি নামাতে পারতেন, এক্ষেত্রে যদি সেই চেষ্টা হয়ে থাকে, তবে গায়কের প্রশংসা করতে হয় বৈকি। যদি রবীন্দ্রনাথের গান করাই কাম্য হয়ে থাকে তবে গরমে ঘাম ঝরানো গানেরও তাঁর অভাব নেই। বুঝতে পারা যায় যে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিপুল বৈচিত্র্য সম্বন্ধে গায়ক সম্পূর্ণ অনবহিত। হয়তো ঐ গানটিই তাঁর পুঁজি, কাজেই তাপমান যন্ত্র যাই বলুক গ্রীষ্মের দুপুরে ঘনবর্ষার গান গাওয়া ছাড়া তার উপায় নেই। একটি গল্প মনে পড়ল। ১৯৬১ সালে প্রধানমন্ত্রীর হুকুমে ভারতব্যাপী রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী পালন হয়েছে রেলস্টেশন, পুলিসের থানা, হাসপাতাল সর্বত্রই। কোন একটি রেলস্টেশনের মুষ্টিমেয় কর্মচারীদের মধ্যে মাত্র একজনেরই গানের গলা আছে, সেই একজন আবার মাত্র একটিই রবীন্দ্র-সঙ্গীত জানেন। কাজেই সভারম্ভ ও সভা-সমাপ্তি সেই একটি গান দিয়েই হল। সে গানটি 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে'। শুনেছি সময়োচিত কৃতিত্বের জন্যে ঐ লোকটি আসন্ন বদলির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। কলকাতা বেতারকেন্দ্রেরও প্রায় সেই দশা উপস্থিত। এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রথমে চোখে পড়ে না, কারণ এগুলি আকারে অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু এদের যোগফল ভারী হতে বাধা নেই। সেই ভার যখন মাধ্যাকর্ষণের টানে নীচের দিকে নামে তখন অনেক বুনিয়াদ ধুলিসাৎ হয়ে যায়। ইতিহাসের যদি কোন শিক্ষা থাকে, তবে তা এই। যতক্ষণ না হিসাবের গ্র্যাণ্ড টোটাল হচ্ছে, লোকে ভাবে তার ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য হল না। কিন্তু দুদিন বাদেই

হোক আর দশদিন বাদেই হোক, গ্র্যাণ্ড টোটাল অনিবার্য। সেই অনিবার্যের কথা কলকাতা বেতারকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। তবে কোন ফল হবে— সমাজের কোন ক্ষেত্রে কোন ফল হবে এমন আশা করা ছেড়ে দিয়েছি। হয়তো ইতিহাসের এই নিদারুণ ইঙ্গিত বুঝবার ক্ষমতাও লোকে হারিয়ে ফেলেছে। ফসিল হওয়া কারও একচেটিয়া অধিকার নয়। কলকাতা বেতার কেন্দ্র সেই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় নি তো? কেন না ফসিল না হলে অপরকে সাধারণত ফসিল বলে মনে হয় না।

# বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী

অনেক কাল আগে কোন একখানি মূল্যবান বাংলা গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্যতা স্মরণ করে লিখেছিলাম যে, বাংলা বইয়ের বারাণসী তীর্থে অনুসন্ধান করলে খুব সম্ভব বইখানা পাওয়া যেতে পারে। সে বারাণসী তীর্থ আর কিছুই নয় কলকাতার ফুটপাতে বইয়ের বাজার। বারাণসীর গঙ্গার ঘাটে জীর্ণ বৃদ্ধের দল খেয়ার প্রত্যাশায় দিন কাটান, ফুটপাতের বাজারেও বইগুলোর প্রায় সেই দশা। বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি একদিন তাদের খেয়ায় তুলে নিয়ে যায়। কিন্তু এমন দু' দশখানা বই আছে জীবিত অবস্থাতেই যাদের মোক্ষলাভ ঘটেছে, সংস্করণান্তরের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়নি। এমন একখানি অতি মূল্যবান, অতি দুর্লভ গ্রন্থের বিবরণ আজ দিতে উদ্যত হয়েছি।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত ও সঙ্কলিত বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী মোক্ষলব্ধ বিধায় সম্পূর্ণ দুষ্প্রাপ্য। স্বয়ং গ্রন্থকার তৎপ্রণীত অভিধানের সুবাদে পরিচিত কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি (বর্তমান লেখকের বিবেচনায়) বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী বই-খানার নামটাও সাধারণ পাঠকের স্মৃতি থেকে লোপ পেয়েছে। ১৩২২ সালে অর্থাৎ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে বইখানার প্রথম প্রকাশ। তারপরে পুরা পঞ্চাশটি বৎসর অতিবাহিত হয়েছে, কত লক্ষ টন শাদা কাগজ যে মুদ্রাঙ্কিত হয়ে পুস্তক নামে আত্মপ্রকাশ করেছে, ছোট বড় কত প্রকাশকের উত্থান পতন ঘটেছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কত বিদ্বদ সমাজ প্রাচীন ও নবীন অনেক গ্রন্থ সম্পাদন করেছেন, সম্প্রতি সাহিত্য আকাদামীও এই কার্যে ব্রতী, কিন্তু বিশেষ পরিতাপের কথা এই যে লুপ্তপ্রায় এই রত্ন উদ্ধারের দিকে কারো নজর পড়েনি। অথচ বইখানাকে নব্য বাঙালী সমাজের জীবনবেদ বলে অভিহিত করলে অত্যুক্তি হয় না। কেন যে এমন দুর্লভ পদবীদান করতে উদ্যত সেই কথাই কিছু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো। কিন্তু তার আগে স্বয়ং লেখকের মুখে বইখানা প্রণয়ন ও সঙ্কলনের ইতিহাস শোনা আবশ্যক।

( ২ )

'গ্রন্থকারের নিবেদনে' জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস গ্রন্থ সঙ্কলনের যে ইতিহাস লিপি-বদ্ধ করেছেন দুটি কারণে তা উল্লেখ ও উদ্ধারযোগ্য। এলাহাবাদ থেকে প্রবাসী

পত্র প্রকাশিত হয়েই প্রবাসী বাঙালী ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল আর সেই সঙ্গে একজন উৎসাহী ও নিষ্ঠাবান ঐতিহাসিককে লাভ করলো। এ কাজ জ্ঞানেন্দ্রমোহনের কীর্তি হলেও এর মূলে ছিল প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রেরণা।

"সন ১৩০৮ সালের বৈশাখে বঙ্গের প্রসিদ্ধ মাসিকপত্র 'প্রবাসী' এলাহাবাদ হইতে প্রথম বাহির হয়। ইহার প্রবর্তক ও সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এম. এ. মহাশয় ঐ বৎসর প্রবাসীর আষাঢ় সংখ্যায় 'প্রবাসী পদক' নামে একটি বিজ্ঞাপন বাহির করেন। তাহাতে ছিল—"(ক) বিহারে বাঙ্গালী ; (খ) উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা ও পাঞ্জাবে বাঙালী ; (গ) মধ্য ভারতে বাঙালী এবং (ঘ) ব্রহ্মদেশে বাঙালী এই চারিটি বিষয়ে সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য চারিটি পদক দেওয়া যাইবে।" বিজ্ঞাপনে প্রবন্ধ লিখিবার নিয়মাবলীও মুদ্রিত ছিল, এই বিজ্ঞাপন দেখিয়া আমি (খ) চিহ্নিত বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখি। উহা পদকের যোগ্য বিবেচিত হওয়ায় প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় আমায় একটি স্বর্ণ পদক দান করেন। যথাসময়ে সে সংবাদ ও প্রবন্ধ 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের জীবনী এবং ঐতিহাসিক ও ভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থ পত্রাদি পাঠ এবং স্থানীয় অনুসন্ধান করিবার কালে, প্রবাসী বাঙালীর ইতিহাস যে বহু প্রাচীন এবং বিস্তীর্ণ তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধি করি। নানা কারণে ইহাও বুঝিতে পারি যে, বঙ্গের প্রকৃত ইতিহাস এবং বঙ্গের বাহিরে বাঙালীর কীর্তিকাহিনী বাঙালীর দ্বারাই রক্ষিত হইবে। অপর কেহ তজ্জন্য মাথা ঘামাইবে না। এই সময় বঙ্গের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় 'প্রবাসী'কে লক্ষ্য করিয়া লেখেন—"বাঙালীর ইতিহাস নাই, সুতরাং বাঙালীর কীর্তি-কাহিনী সাধারণে সুপরিচিত নহে। বর্তমানযুগে বাঙালী নানাদেশে বাসস্থান নির্মাণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। যাহারা প্রবাসী, তাহারা ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন আচার ব্যবহার জড়িত হইয়াও আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া কতভাবে আত্মপ্রতিভার পরিচয় প্রদান করিতেছে, এতদিনের পর তাহার কাহিনী সংকলিত হইবার উপায় হইল।" অতঃপর ঐ পত্রিকায় প্রবাসী বাঙালী সম্বন্ধে আমার কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তিনি একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—"...প্রবাসী কে কোথায় কি করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার তথ্য সংগ্রহ করিয়া আপনি বঙ্গসাহিত্যের একটি বিশেষ

অভাব মোচন করিতেছেন, উহা ভবিষ্যতের ইতিহাসের উপকারে আসিবে। তজ্জন্য আমি আপনার প্রবন্ধগুলি সর্বদা পাঠ করিয়া থাকি।"···আমি অদ্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভরে স্বীকার করিতেছি যে সহৃদয় মৈত্রেয় মহাশয়ের পূর্বোক্ত মন্তব্য এবং এই পত্র আমার উৎসাহবর্ধনে এবং উদ্দেশ্য সাধনপথে অল্প সহায়তা করে নাই।"

প্রেরণার ইতিহাসের পরে এবারে লেখকের নিষ্ঠার বিবরণ শোনা যাক। ······"গত ২২৷২৩ বৎসর প্রবাসবাসের মধ্যে কর্মসূত্রে আমায় ভারতের বহু স্থানে যাইতে হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশের এমন জেলা নাই যেথায় আমায় মধ্যে মধ্যে যাইতে হয় নাই এবং জেলার মধ্যে প্রায়ই এমন নগর ও গণ্ডগ্রাম নাই যাহার ভিতর দিয়া আমি যাই নাই। কার্যবশে প্রদেশান্তরে যাইতে হইলেও আমার ভ্রমণ সাধারণতঃ হিমালয় হইতে মোগলসরাই এবং ঝান্সী ললিতপুর হইতে নেজালতারাই পর্যন্ত অর্থাৎ অযোধ্যার দ্বাদশটি ও আগ্রা প্রদেশের পঁয়ত্রিশটি জেলায় বদ্ধ ছিল। যেথানেই গিয়াছি তথায় বাঙালী আছেন কিনা, কিভাবে আছেন, কোন্ সময় হইতে কি সূত্রে তথায় আবির্ভূত হইয়াছেন, জন্মস্থানের সহিত তাঁহারা কিরূপ সম্বন্ধ রাখিয়াছেন, প্রবাসে তাঁহাদের জাতীয় কীর্তি কি কি ছিল এবং আজিও বিদ্যমান আছে, তাহা আমার ক্ষুদ্র শক্তি কিন্তু প্রবল আশা ও কৌতূহল লইয়া যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়াছি। সুতরাং প্রবাসী বাঙালীর তথ্য সংগ্রহের পরিসর সুবর্ণপদকপ্রাপ্ত "উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা ও পাঞ্জাবে বাঙালী প্রবন্ধের সীমা অতিক্রম করিয়া বঙ্গের বাহিরে সমগ্র ভারতে এবং ভারতের বাহিরে সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করিয়াছে। আজ প্রায় চতুর্দশ বৎসর ধরিয়া উক্ত মাসিক পত্রে 'প্রবাসী বাঙালী', 'বঙ্গের বাহিরে বঙ্গসাহিত্য', 'প্রবাসে বাঙালীর কীর্তি,' 'প্রবাসী বাঙালীর কথা', 'বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে বাঙালী', 'রাজপুতানায় বাঙালী', 'কাশ্মীরে বাঙালী' প্রভৃতি নাম দিয়া বঙ্গের বাহিরে যে "বৃহদ্বঙ্গ" গঠিত হইয়া উঠিতেছে তাহার ইতিহাস প্রকাশ করিতেছি। তাহারই প্রথম খণ্ড "উত্তর ভারত" অদ্য গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল।"···যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিলেও ইহাতে ভ্রম থাকিবার সম্ভাবনা আছে। সেই কারণেই প্রবাসীর সম্পাদক মহাশয় দ্বিতীয় বর্ষের প্রবাসীতে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি প্রকাশ করিয়াছিলেন—"শ্রীযুক্তবাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস 'প্রবাসী'তে প্রবাসী বাঙালীগণের যে বৃত্তান্ত লিখিতেছেন তজ্জন্য তাঁহাকে গুরুতর পরিশ্রম করিতে

হইয়াছে। কিন্তু বিষয়টি এরূপ যে, প্রভূত পরিশ্রম করিলেও এই বৃত্তান্তে অনেক অসম্পূর্ণতা ও ভ্রম থাকিবার সম্ভাবনা। যদি প্রবাসীর পাঠকগণ এই সকল ত্রুটি নির্দেশ করিয়া বৃত্তান্তটিকে নির্ভুল ও সম্পূর্ণ করিবার পক্ষে আমাদের সাহায্য করেন তাহা হইলে আমরা চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিব।" ইহার পর হইতে যে সকল ভ্রম আমায় প্রদর্শন করা হইয়াছে বর্তমান গ্রন্থে সে সকল সংশোধন করিয়া দিয়াছি। অতঃপর যাঁহারা কৃপা করিয়া এই পুস্তককে নির্ভুল দেখিবার জন্য ইহার অন্তর্গত ভ্রমপ্রমাদ প্রদর্শন করিবেন তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।"

বলা বাহুল্য "উত্তর ভারত" বা প্রথম খণ্ডের পরে আর কোন খণ্ড প্রকাশিত হয়নি, কাজেই বঙ্গের বাহিরে বাঙালীর ইতিহাস অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে। এসব এককের কাজ নয়। দুঃখের বিষয় এই যে, জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব নেওয়ার মতো দ্বিতীয় ব্যক্তি এ পর্যন্ত জোটে নাই, ভবিষ্যতে জুটবে কি না জানি না।

( ৩ )

এবারে বইয়ের ভিতরে প্রবেশের আগে আলোচ্য বিষয়ের দেশ ও কালগত বিস্তার সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা আবশ্যক। লেখক বলেছেন, প্রথম খণ্ড হচ্ছে "উত্তর ভারত"। কিন্তু লেখক কথিত উত্তর ভারত শুধু ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, ভারত বহির্ভূত কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যে বাঙালীর কীর্তির বিবরণও প্রদত্ত হয়েছে। শুধু প্রদেশ ও রাজ্যগুলোর নামোল্লেখ করে গেলেই দেশের বিস্তার বুঝতে পারা যাবে। কাশী, বারাণসী ও গোরক্ষপুর বিভাগ, প্রয়াগ, ব্রজমণ্ডল, আগ্রা বিভাগ,, এলাহাবাদ বিভাগ, ও বুন্দেলখণ্ড, রোহিলখণ্ড, মীরাট বিভাগ, কুমায়ুন বিভাগ ও উত্তরখণ্ড, অযোধ্যা প্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজপুতানা, মধ্যভারত ও মালব, উত্তর-পশ্চিম ভারত, কাশ্মীর, সিকিম, ভূটান ও নেপাল। এই সঙ্গে আফগানিস্থানকেও ধরতে হবে, কারণ কাপ্তেন -রামকৃষ্ণ কর্মকার বারোজন বাঙালী কারিগর নিয়ে কাবুলের আমীর আবদার রহমানের আহ্বানে কাবুল যান এবং সেখানে কারখানা স্থাপন করে বন্দুক ও কামান প্রভৃতি নির্মাণ করেন, আগে এখানে হাতে তৈরী হতো ঐসব যন্ত্রপাতি। (পৃঃ ৫৪৬—৫৪৮)। এই তো গেল আলোচ্য দেশের বিস্তার। আলোচ্য কালের বিস্তারও কম নয়।

পৌরাণিক ও প্রাচীন ইতিহাসের যুগ থেকে লেখক আরম্ভ করে উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছেন। পৌরাণিক ও প্রাচীন যুগ সম্বন্ধে আমরা কোন মন্তব্য করবো না, সে বিষয়ে আমাদের অনধিকার আর বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিকতার অভাব। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতক আমাদের আলোচনার ক্ষেত্র, কারণ এই সময়ে কোম্পানীর শাসনের সূত্রপাতে ইংরাজী শিক্ষার সুযোগে এবং জীবিকার প্রয়োজনে (ও দুই আবার অনেক ক্ষেত্রেই একই সঙ্গে জড়িত) বাঙালী উত্তর ভারতের দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। বাঙালীর এই আচরণকে কর্মবৃত্তি ত্যাগ করে ব্যাঘ্রবৃত্তি অবলম্বন বললে অন্যায় হয় না। বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা আবশ্যক।

( ৪ )

পলাশীর যুদ্ধের সময় থেকে বাংলাদেশ নূতন এক সভ্যতা ও জীবনধারণার সম্মুখীন হতে আরম্ভ করে। অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকে নূতন আচার ও আচরণকে আর এড়িয়ে যাওয়ার উপায় রইলো না। খ্রীষ্টীয় মিশনারী, খ্রীষ্টীয় ব্যবসায়ী ও শাসকগণ যে চক্রব্যূহ তৈরি ক'রে তুলেছিল তার সঙ্গে যোগ দিলেন কয়েকজন হিতব্রতী খ্রীষ্টান, হেয়ার ও কেরী প্রভৃতি। মিশনারীগণ যে উন্মাদনা জাগাতে অসমর্থ হয়েছিল সেই উন্মাদনা জাগালো ইংরাজী শিক্ষার অভিঘাত। মুসলমান শাসন পাঁচশো বছরে যে উদ্দীপনা জাগাতে অক্ষম হয়েছিল পঁচিশ বছরের ইংরাজী শিক্ষায় সেই উদ্দীপনা দেখা দিল নব্যতন্ত্রী বাঙালীর জীবনে। স্বীকার করতেই হবে যে, ইংরাজী শিক্ষার প্রথম যুগে বাঙালী স্খলিতচরণ ও উদ্ভ্রান্ত হয়েছিল আর তার ফলে রামমোহন, রাধাকান্ত দেব ও দেবেন্দ্রনাথের মতো সমাজপতিগণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। এই সময়কার সমাজপতিগণ তত্ত্বদর্শী না হলে বাঙালী সমাজ হয়তো হাত পা গুটিয়ে নিয়ে আত্মরক্ষার জৈব তাগিদে কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করতো। হয়তো নূতন রঘুনন্দনী স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থায় বাঙালী সমাজ আবার আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ হয়ে পড়তো। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে ইসলামের সাক্ষাতের প্রতিক্রিয়ায় যেমন রঘুনন্দন দেখা দিয়েছিলেন এবারে আর তার তেমন নূতন রঘুনন্দন দেখা দিলেন না। এ যুগের ইংরাজী শিক্ষিত হিন্দু বাঙালীর স্মৃতিশাস্ত্র বলে যদি কিছু থাকে তবে তা পারিবারিক প্রবন্ধ ও আচার গ্রন্থ দুখানি। প্রণেতা পণ্ডিত বংশের সন্তান হলেও ইংরেজি শিক্ষিত। কিন্তু

গ্রন্থকর্তা কূর্মবৃত্তি শিক্ষা দেন নি, দিয়েছেন নিজ ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে নিষ্ঠা ও মমত্ববোধের দীক্ষা, দুয়ে কত প্রভেদ। এই প্রভেদ আরও প্রকট হয়ে ওঠে যখন স্মার্ত রঘুনন্দনের সঙ্গে তুলনা করি মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের। 'মহাপ্রভুকে অনেকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অবতার মনে করেন। এখানে অন্য প্রসঙ্গ। মহাপ্রভুর মতো সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি অল্পই জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি বুঝলেন যে, কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করে সমাজ সাময়িকভাবে আত্মরক্ষা করতে পারে কিন্তু কালক্রমে তার লোপ অবশ্যম্ভাবী। তাই তিনি কূর্মবৃত্তির পরিবর্তে ব্যাঘ্রবৃত্তি অবলম্বন করলেন, ভক্তির সরল রাজপথ সকলের সম্মুখে অবারিত করে দিলেন, সঙ্কীর্তন উপলক্ষে সব শ্রেণীর মধ্যে মেলামেশার পথ সহজ করে দিলেন আর 'আচণ্ডালে ধরি দেই কোল' নীতি গ্রহণ করে সঙ্ঘবদ্ধ হিন্দু সমাজকে বিস্তারকামী ইসলামের মুখোমুখি দাঁড়াবার প্রেরণা দান করলেন। বাঘের মতো বাস্তবের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বার শিক্ষা দান করলেন। হিন্দু সমাজকে। হিন্দু সমাজ রক্ষা পেয়ে গেল। এইজন্যই তাঁকে বলেছি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিভাধর বিরাট পুরুষ। এই ঘটনার চারশো বছর পরে য়ুরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে সাক্ষাতের যুগে পরিণাম সচেতন নেতাদের প্রেরণায় সামগ্রিকভাবে বাঙালীসমাজ কূর্মবৃত্তির পথ আদৌ চিন্তা না করে ব্যাঘ্র-বৃত্তি অবলম্বন করলো। তারা যে কেবল বাস্তব অবস্থার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে বদ্ধপরিকর হ'ল শুধু তাই নয়, সাহসের সঙ্গে, বীর্যের সঙ্গে, স্ববে বাংলার ভৌগোলিক সীমাকে অতিক্রম করে সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়লো, হিন্দু-স্থানের সীমাকে অতিক্রম করে কাবুল ও নেপাল রাজ্যে ছড়িয়ে পড়লো। যে ইংরাজী শিক্ষার সুফল তারা ভোগ করতে সুরু করেছিল তারই অকুণ্ঠ ভাগ তারা দান করলো তৎকালে ইংরাজী জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে কুণ্ঠিত দেশবাসীকে। বিস্তার্যমান বাঙালী সমাজের এই প্রথম তরঙ্গকে, বাঙালীর আত্মপ্রকাশের এই সব রাজদূতকে প্রকৃত অর্থে নব্য ভারতের স্রষ্টা বলা যেতে পারে। কেবল জীবিকার তাগিদে এমন একটি যুগসৃষ্টির ব্যাপার ঘটেছিল মনে করা উচিত হবে না। তখনকার দিনে ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালী একটা sense of destiny—নিয়তির নির্দেশ যেন উপলব্ধি করেছিল আর তারই প্রেরণাই 'দুস্তর গিরি কান্তার মরু' লঙ্ঘন করে দিকে দিকে বহন করে নিয়ে গিয়েছে নব্য যুগের জয়-পতাকা। 'বঙ্গের বাহিরে বাঙালী'—একাধারে সেই sense of destiny দ্বারা

চালিত নব্য বাঙালীর আত্মোপলব্ধির, ভারতোপলব্ধির ও নব্য নবযুগ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। সেইজন্যই গোড়াতে বইখানাকে নব্য বাঙালীর জীবনবেদ বলে আখ্যাত করেছি। অতীতের দৃষ্টান্ত বর্তমানে নূতন শক্তি এবং ভবিষ্যতে নূতন প্রেরণা দান করবে। এখন আমাদের শক্তির ও প্রেরণার বড় আবশ্যক। এ গ্রন্থ বাঙালী মাত্রেরই, বিশেষ আজকালকার দিনের অবসাদগ্রস্ত বাঙালী মাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য। এ গ্রন্থ পুনঃ প্রকাশিত হলে বাঙালী সমাজের অশেষ উপকার সাধন করবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

# বইয়ের বাজার ঃ সমালোচক

সমালোচনার নানা মূর্তি, সমালোচকেরও। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র আর রবীন্দ্রনাথের প্রাচীনসাহিত্য থেকে সাময়িকপত্রের পুস্তক পরিচয়; আবার বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ থেকে সাময়িকপত্রের পুস্তক পরিচয়ের সমালোচক—দুয়েই বিপুল বৈচিত্র্য। কাজেই সমালোচক সম্বন্ধে সেই সঙ্গে সমালোচনা সম্বন্ধে লিখতে গেলে একটা বিস্তৃত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে হয়। বিশেষ বাংলাদেশে সমালোচক নয় কে? সাহিত্য, ধর্ম, রাজনীতি, শিক্ষা, বিজ্ঞান যাবতীয় বিষয়ে সকলে সর্বদা মত প্রকাশ করছে। সমস্তই সমালোচনা। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে আমাদের আলোচনা তত বিস্তৃত নয়—শুধু বইয়ের বাজার। কিন্তু এক্ষেত্রটাও খুব সঙ্কীর্ণ নয়, কারণ প্রতি বছর বাংলা বই যত প্রকাশিত হয় এত বোধহয় আর কোন একটা ভারতীয় ভাষাতে নয়। আর এসব বই বড় যে-সে বই নয়, ভাবে ভাষায়, বিষয়ে কিম্বা টেকনিকে প্রত্যেকখানি বই আর সব বইয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ—আর প্রত্যেকখানি বই বৈপ্লবিক সম্ভাবনায় পূর্ণ ও যুগান্তকারী। এমন ক্ষেত্রে সমালোচকদের কাজ কঠিন না হয়ে পারে না। তবু যে সমালোচক অকম্পিত কলমে লিখে যান তার কারণ লেখক ও সমালোচক একই দেশের একই জলমাটিতে তৈরি।

এবারে সমালোচনার বিভিন্ন শ্রেণী সম্বন্ধে কিছু বলা যেতে পারে।

প্রথম হচ্ছে বিজ্ঞাপনে সমালোচনা। বিজ্ঞাপন সরস করে লিখতে পারলে বেশ সুখপাঠ্য হয়, অনেক সময় বইয়ের চেয়ে বেশি সুখপাঠ্য হয়। এতে সুবিধা এই যে দায়িত্ব সম্বন্ধে খুব সচেতন না হয়ে অনেক বড় বড় বিশেষণ ব্যবহার করা যায়। অবশ্য নিতান্ত নাবালক ছাড়া বড় কেউ ভোলে না। এ-ও এক রকম সমালোচনা।

দ্বিতীয় হচ্ছে পুস্তক পরিচয় বা সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। রবীন্দ্রনাথ সংক্ষিপ্ত সমালোচনার ব্যাসবাক্য করেছিলেন যে রচনা সম্যকরূপে ক্ষিপ্ত হলে লেখক সম্যকরূপে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তাকেই বলে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। এ রচনা দুই জাতের। এক ফাঁকা আওয়াজ কেউ আহত হয় না, খানকতই বই বিক্রি হয়

—আর এক নিরেট গুলি, হয় লেখক নয় প্রকাশক নয় দু'জনেই আহত হয়। তবে শেষোক্ত রীতি উঠে যাওয়ার মধ্যে, কারণ যেদেশে সকলেই লেখক, সকলেই সমালোচক, সকলেই প্রকাশক সেখানে একটু হাত সামলে কাজ করতে হয়। তৃতীয় হচ্ছে প্রবন্ধাকারে সমালোচনা। এ জাতীয় রচনায় সাহিত্যিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, পণ্ডিত জনোচিত নিরপেক্ষতা ও সমালোচকের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত অনেক ভাষার কোটেশন থাকে। প্রবন্ধ, রসসাহিত্য ও বিজ্ঞাপনের মিশলে রচিত এইসব রচনার কিছু কিছু পাঠক আছে—কারণ একসঙ্গে তিন বস্তুর রসাস্বাদ করতে স্বভাবতই লোকের আগ্রহ হবে।

চতুর্থ হচ্ছে গ্রন্থাকারে সমালোচনা। এ শ্রেণীতে উঁচু, নীচু, মাঝারি থাক আছে। উঁচু থাকে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র আর রবীন্দ্রনাথের প্রাচীনসাহিত্য আর লোকসাহিত্যের মতো অমর গ্রন্থ। এসব বই-এ সমালোচনা সৃষ্টিকার্য হয়ে উঠে রসসাহিত্য পরিণত হয়েছে। নীচের থাকের বইয়ের সংখ্যা অসংখ্য —এদের প্রধান ঐশ্বর্য নানা ভাষার কোটেশন, ফুটনোট, চামড়ার বাঁধাই ও মুদ্রণ পারিপাট্য—তবে সত্যের খাতিরে বলতে হয় এসব রচনার কোন কোন অংশ পাঠ্য।

এছাড়াও আরও অনেক রকমের সমালোচনা আছে। খ্যাতনামা লেখকদের কাছে অভিমত পাওয়ার প্রত্যাশায় অনেক বই এসে থাকে। তাঁরা যথাসম্ভব প্রসন্নভাবে মুষ্টিভিক্ষা দিয়ে বিদায় করেন—আপনার বই পড়ে আনন্দিত হয়েছি। গল্প আছে যে আমাদের দেশের একজন বিখ্যাত লেখক পোষ্ট কার্ড ছাপিয়ে রেখে ছিলেন—"আপনার—বইখানা পড়ে অশ্রু সম্বরণ করতে পারলাম না।" পদার্থ বিদ্যার বই পাঠিয়ে দিয়ে লেখক ঐ পোষ্ট কার্ডে জবাব পেয়েছিলেন। বিদেশে বইয়ের বাজারে কোটি কোটি টাকা খাটে। শুনতে পাই যে সেখানে উদ্যোগী প্রকাশকরা নিজেদের লোককে বড় বড় সাময়িকপত্রের কর্মীরূপে ঢুকিয়ে দেয় যাতে তাদের বইয়ের ভালো সমালোচনা বের হয়। সুখের বিষয় এ রীতি এখনো আমাদের দেশে দেখা দেয়নি। বিদেশে যেখানে বইয়ের বাজার আর দশটা বাজারের মতো ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে সেখানে চলতি অর্থে তাকে সমালোচনা বলা হয় তা প্রায় সবক্ষেত্রেই বিজ্ঞাপন ছাড়া কিছু নয়, কোনটা থাকে বিজ্ঞাপনের স্তম্ভে, কোনটা থাকে পত্রিকার রচনারূপে—এই যা প্রভেদ। হাজার সতর্কবাণী উচ্চারণ করো, হাজার ধিক্কার দাও, এর অন্যথা হবে মনে হয়

না, কারণ এর মধ্যে Demand to Supply-এর স্বর্গীয় নীতি প্রবিষ্ট হয়েছে, সরস্বতী এখন লক্ষ্মী আর কুবেরকে পার্টনার রূপে গ্রহণ করে লিমিটেড কোম্পানী খুলেছেন—অবশ্য প্রাইভেট সেকটর। আমাদের বইয়ের বাজারের যাতে এমন বিড়ম্বনা না ঘটে সেজন্য এখন থেকেই সাবধান হওয়া আবশ্যক—ষোল আনা ফল না পেলেও কিছু ফল অবশ্যই পাওয়া যাবে।

সাহিত্যে সমসাময়িক রচনার মূল্য নির্ধারণ সবচেয়ে কঠিন কাজ। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মতো মনীষীও ভুল করেছেন। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁরা আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সন্ধ্যাসঙ্গীতের মূল্যে বুঝেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যের মূল্য। যেখানে এদের মতো মনীষীর ভুল হয় সেখানে সাধারণ লোকের কা কথা! সমসাময়িক রচনার মূল্য বোধে কত রকম অন্তরায়—স্বার্থ, গোষ্ঠী, রাজনীতি—আরো কত কি। যেখানে ভ্রান্তি স্বেচ্ছাকৃত নয় সেখানে অবশ্যই মার্জনীয়। সমালোচনার উদ্দেশ্য কি জানতে গেলে আগে জানতে হয় সমালোচকের স্বরূপ কি। অনেকে বলেন সমালোচক হচ্ছেন ঘটক, রচনা আর পাঠকের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন তাঁর কাজ। অনেকে বলেন তিনি দালাল, পাঠক আর লেখকের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানে সাহায্য করা তাঁর কাজ। আমি তো বুঝি সমালোচকের কাজ সবচেয়ে কঠিন, তাঁকে একসঙ্গে পাঠক ও লেখকের বিশ্বাসভাজন হতে হবে, সত্যকথা মধুরভাবে বলতে হবে, অথচ দেখতে হবে কোন পক্ষ যেন মধুর বাক্যকে স্তুতি মনে না করে। "The critic should stop to conquer" তাঁকে নত হয়ে জয় করতে হবে যুগপৎ পাঠক ও লেখকের হৃদয়। তাঁর ভাষা হবে পরিচ্ছন্ন, প্রাঞ্জল ও সংক্ষিপ্ত; তাঁর রচনায় বিদ্যা থাকবে অথচ বিদ্যার আড়ম্বর থাকবে না; জ্ঞান থাকবে অথচ কোটেশন থাকবে না; হাসির প্রচ্ছন্ন আভায় তাঁর বক্তব্য উজ্জ্বল হয়ে উঠবে; কাণ্ডজ্ঞান আর আন্তরিকতার সমন্বয় হবে তাঁর রচনায়; যখন তিনি নিজ সময়ের কথা বলছেন তখনো পরোক্ষে তাঁর মনে উপস্থিত থাকবে দেশবিদেশের সুদীর্ঘকালের সাহিত্যের ইতিহাস; তিনি সাহিত্য-সমালোচক হলেও তাঁকে অন্যান্য বিদ্যা কিছু কিঞ্চিৎ খোঁজখবর রাখতে হবে; সর্বথা তাঁকে পরিত্যাগ করতে হবে ভাবে। ভাষায় সর্বপ্রকার গ্রাম্যতা দোষ বর্জন করতে হবে—তাঁকে অর্জন করতে হবে সেই অনির্বচনীয় মানসিক আবহাওয়া ইংরেজীতে যাকে বলে urbanity! এত গুণের একত্র সমাবেশ সহজ নয়—সেইজন্যই সাহিত্যের ইতিহাসে বড়দরের

সমালোচক এমন বিরল আর অনেক সময়েই তিনি প্রচ্ছন্ন কবি। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত দু'জন বড়দরের সমালোচক হয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। অনেকে বলেন যে হতাশ সাহিত্যিকরাই শেষে সমালোচক রূপ ধারণ করেন। আমার তো মনে হয় ঠিক উল্টো। হতাশ সমালোচকরাই শেষ পর্যন্ত রসসাহিত্যিক রূপে দেখা দেন। কারণ আজকের দিনে বিশ্বের বাজারে যা রম্য-রচনা নামে চলছে তা লিখবার মতো সহজ কাজ আর নেই। প্রবাদে বলেছে 'কালি কলম মন লেখে তিন জন'— রম্যরচনা লিখতে কালি কলমটাই যথেষ্ট আর সচেতন, স্পর্শকাতর, উজ্জ্বল অনুশীলন ভূয়িষ্ঠ মন হচ্ছে সমালোচনা সাহিত্যের প্রজাপতি ব্রহ্মা।

সমালোচকের সম্বন্ধে অনেক কথা বললাম—কিন্তু তার যে কতদূর কি দুর্দশা হতে পারে তা রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করে গিয়েছেন—তারই কতক অংশ না শুনিয়ে শেষ করলে বর্তমান প্রসঙ্গ অসমাপ্ত রয়ে যাবে।

পরজন্ম সত্য হলে
    কী ঘটে মোর সেটা জানি।
আবার আমায় টানবে ধরে
    বাংলাদেশের এ রাজধানী।
গদ্যপদ্য লিখুন ফেঁদে
তারাই আমায় আনবে বেঁধে,
অনেক লেখায় অনেক পাতক
    সে মহাপাপ করবো মোচন।
আমায় হয় তো করতে হবে
    আমার লেখা সমালোচন।

তোমরা, যাঁদের বাক্য হয় না
    আমার পক্ষে মুখরোচক,
তোমরা যদি পুনর্জন্মে
    হও পুনর্বার সমালোচক—
আমি আমায় পাড়বো গালি,
তোমরা তখন ভাববে খালি

কলম ক'ষে ব'সে ব'সে
প্রতিবাদের প্রতিবচন।
আমায় হয় তো করতে হবে
আমার লেখা সমালোচন

লিখবো, ইনি কবি সভায়
হংস মধ্যে বকো যথা
তুমি লিখবে কোন্ পাষণ্ড
বলে এমন মিথ্যা কথা।
আমি তোমায় বলবো মূঢ়,
তুমি আমায় বলবে রূঢ়,
তারপরে যা লেখালেখি
হবে না তা রুচিরোচন।
তুমি লিখবে কড়া জবাব
আমি কড়া সমালোচন।

# রামায়ণ ও মহাভারত

পণ্ডিতেরা এবারে রামায়ণ, মহাভারত ও বহুকাল পরবর্তী তাজমহল নিয়ে পড়েছেন। বোধ করি আর সব সমস্যার মীমাংসা হয়ে গিয়েছে। তাঁদের সমাধানগুলি একাধারে কৌতুক ও শিক্ষার স্থল। তাজমহল আসলে কোন হিন্দু রাজার কীর্তি, পরবর্তী কালে মোগল বাদশা তার উপরে মোগলাই পলাস্তরা লাগিয়ে তাকে তাজমহলে পরিণত করেছেন। বাদশাদের আমলে যখন অনেক হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে, দু'চারটে ইমারতই বা তখন ধর্মান্তর গ্রহণ না করবে কেন? সমান কারণে সমান ফল হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু এ তো সামান্য ব্যাপার। রামায়ণ সমস্যা নিয়ে নূতন লঙ্কাকাণ্ড হওয়ার জোগাড়। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রথমে রামায়ণী তুবড়িতে অগ্নিসংযোগ করেন, সেই দৃষ্টান্তে কাছাকাছি যত তুবড়ি ছিল, সবগুলোই অগ্নিস্পৃষ্ট হয়ে চমৎকার সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেছে। সুনীতিবাবুর মতে রামায়ণের কাহিনীটা হোমারের ইলিয়াড থেকে গৃহীত। বাল্মিকী গ্রীক জানতেন। এ আবিষ্কার চমকপ্রদ হলেও নূতন নয়, নূতন হলে আরও প্রাণ খুলে বাহবা দিতে পারতাম।

কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের উপক্রমণিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—"কোন মহাত্মা বলেন, রামায়ণ হোমারের কাব্যের অনুকরণ; কেহ বা বলেন ভগবদ্গীতা বাইবেলের ছায়ামাত্র," (১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ)। সংস্কৃতে শিক্ষিত ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এই মন্তব্য করেছেন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ভারতীয় পণ্ডিতেরও এই অভিমত। বাল্মীকি নাকি গ্রীক ভাষা জানতেন। সে আবার কেমন করে সম্ভবপর, গ্রীসের সঙ্গে এদেশের প্রথম সংস্পর্শ আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় থেকে, সে ৩২৫ খ্রীঃ পূঃ অব্দের কথা। রামায়ণ তো তার অনেক আগে লিখিত। এত সহজে পার পাওয়া যাবে না। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের অনেক আগে থেকে গ্রীসের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ঘটেছিল—আর সে যোগাযোগ দেশের পশ্চিম সীমান্ত থেকে গড়াতে গড়াতে বর্তমান উত্তরপ্রদেশ পার হয়ে বিহার পর্যন্ত এসে

পৌঁছেছিল। সেখানে বসে নাকি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেছিলেন। গ্রীসের স্পর্শদোষ না ঘটলে কি করে তিনি গ্রীক শিখলেন? আর গ্রীক না শিখলে কি করে তিনি ইলিয়াড পড়লেন? তবে না রামায়ণ লিখতে পারলেন। যুক্তি একেবারে অকাট্য হলেও একটা ফাঁক রয়ে গেল যে। যোগাযোগ বলতে এক তরফা ব্যাপার বোঝায় না, গ্রীকরা যদি এসে থাকে তবে এ দেশীয়গণও গ্রীসে গিয়াছে। এই তো স্বাভাবিক; কাজেই বাল্মীকির পক্ষে যদি গ্রীক শেখা ও ইলিয়াড পাঠ সম্ভব হয়, তবে হোমারের পক্ষেই বা সংস্কৃত শেখা ও রামায়ণ পাঠ সম্ভব নয় কেন? কিন্তু কথা উঠতে পারে হোমার বাল্মীকির পূর্ববর্তী। একটা ভুল করে ফেললে তার সূত্রে অনেক ভুলকে সমর্থন করতে হয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও হোমারকে খ্রীঃ পূঃ ৯০০ বছরের আগে টেনে নিতে পারেননি, অর্থাৎ এখন থেকে মোট ২৯০০ বছর। কাজেই বাল্মীকির সময়কে এগিয়ে নিয়ে এখন বড়জোর খ্রীঃ পূঃ ৫।৬ শতকে ফেলতে হয়, তাহলে প্রাক্ আলেকজাণ্ডার গ্রীক যোগাযোগের সঙ্গেও বেশ মিলে যায়। এদিকে ভারতীয় ট্রাডিশন অনুসারে রামায়ণ হচ্ছে মহাভারতের পূর্ববর্তী। কিন্তু ট্রাডিশন তো "পাথুরে প্রমাণ" নয়, কাজেই তাকে লঙ্ঘন করাতেই পাণ্ডিত্যের প্রমাণ। কিন্তু এই ট্রাডিশনের মূলে কোন যুক্তি আছে কি? রামায়ণ ও মহাভারত মিলিয়ে পড়লে দেখা যাবে পরবর্তী গ্রন্থের তুলনায় রামায়ণের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা অনেক সরল, তেমনি উক্ত কাব্যে উল্লিখিত ভারতীয় ভূগোলের সীমান্ত অনেক সঙ্কীর্ণ। কাজেই মহাভারত অনেক পরবর্তী, আর ভারতযুদ্ধের কাল খ্রীঃ পূঃ ১৪৩০ সাল। রামায়ণ তার পূর্বের হ'লে হোমারের সময়কে ডিঙিয়ে যায়, কাজেই বাল্মীকির পক্ষে গ্রীক শেখার চেয়ে হোমারের পক্ষে সংস্কৃত শেখা অনেক বেশি সম্ভবপর। রামায়ণ মহাভারত মিলিয়ে আমার বক্তব্য পরে বিশদভাবে বলবো, এখন এই পর্যন্ত।

মূল তুবড়িতে আগুন ধরতেই গৌণ তুবড়িগুলোও জ্বলে উঠল। একজন পণ্ডিত বললেন রাবণের লঙ্কার সঙ্গে বর্তমান শ্রীলঙ্কার কোন সম্পর্ক নেই। সে লঙ্কা ছিল মধ্যভারতের হ্রদবহুল কোন দুর্গম অঞ্চলে। সেই হ্রদগুলো উত্তীর্ণ হ'য়ে একটি দ্বীপে পৌঁছতে হয়েছিল। তারই কল্পনাগত অতিশয়োক্তি বানর সেনার সমুদ্রবন্ধন। কিন্তু তাহলে বাল্মীকির গ্রীক জানবার কি গতি হল?

যিনি কষ্ট স্বীকার করে গ্রীক শিখে ইলিয়াড পড়েছেন তিনি কি আর ওডিসি কাব্যে সমুদ্রের বর্ণনা সুপ্রচুর। বাল্মীকি যদি বা স্বচক্ষে সমুদ্র না দেখে থাকেন, হোমারের চোখে তো দেখেছেন। তারপরেও কি হ্রদগুলোকে সমুদ্র বলে তিনি গ্রহণ করবেন? সমুদ্র না দেখেও বরঞ্চ সমুদ্রের বর্ণনা করা সম্ভব, কিন্তু অসম্ভব গোটাকতক হ্রদকে সমুদ্র বলে চালানো। এসব কথার সমর্থন আর কিছুই নয়, কাণ্ডজ্ঞানহীন পাণ্ডিত্য মাত্র। ঐ হ্রদবহুল অঞ্চলের একটি দ্বীপের চেয়ে রাবণের লঙ্কা হওয়ার দাবী যবদ্বীপে ও বলিদ্বীপের অনেক বেশি। কারণ সেখানে রামায়ণের কাহিনী এখনো ট্রাডিশন রূপে সজীব ও বহুলপ্রচার।

এদিকে আবার পণ্ডিতেরা মিলে রামায়ণের রচনাকালকে টানতে টানতে খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ-৫ম শতকে এনে ফেলেছেন। ভারতীয় ট্রাডিশন অনুসারে মহাভারতের পূর্ববর্তী রামায়ণ। কুরুক্ষেত্র যদি খ্রীঃ পূঃ ১৪৩০ সালে হ'য়ে থাকে, তবে মূল মহাভারত রচনা তার কিছু সালের মধ্যেই, কারণ ভারতযুদ্ধে নিহত অভিমন্যুর পৌত্র জন্মে জয়ের সভাতে মহাভারত প্রথম বিবৃত হয়। কিন্তু ভারতযুদ্ধ যে ১৪৩০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে তার প্রমাণ দিই। প্রমাণ বঙ্কিমচন্দ্র রচিত কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থ। তিনি জ্যোতিষিক হিসাব করে ঐ সালে পৌঁছেছেন। তারার ঘড়ি মিথ্যা বলে না, চলে না আগুপিছু। বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের শুধু শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক নন, তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রত্নতাত্ত্বিক। বস্তুতঃ আচার্য শঙ্করের পরে এত বিপুল মণীষাসম্পন্ন ব্যক্তি এদেশে আর জন্মেছেন কিনা সন্দেহ। আর কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে উনবিংশ শতকের বাঙালীর মেধার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। একথা অবশ্যই ভারতীয় মণীষীরা স্বীকার করেন না, কেননা দুর্ভাগ্যবশত বইখানা একটি ভারতীয় ভাষায় লিখিত। ইংরাজি কি জার্মাণ, অনুবাদের অনুবাদ তস্য অনুবাদ পড়ে তাঁরা গর্ব, অনুভব করতেন। ন্যাশনাল বুকট্রাস্ট কত কি মাথামুণ্ডু অনুবাদ করে ছাপেন যার অধিকাংশই কাটে না, এমনকি উই ইঁদুরও নয়। কৃষ্ণচরিত্রের অনুবাদ তাঁরা করেন না কেন? বিক্রি হবে না। তাদের কোন্ বই বা বিক্রি হয়? আসল কথা বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক খ্যাতি তাঁর ঐতিহাসিক ওপ্রত্নতাত্ত্বিক খ্যাতির অন্তরায়। অপনা সবংশে হরিণী বৈরী।

বঙ্কিমচন্দ্র যে কেবল মহাভারতের কাল নির্ণয় করেছেন তা নয় রামায়ণের আদর্শে যে মহাভারত পরিকল্পিত তা বিবৃত করে রামায়ণের পূর্ণগামিতা স্বীকার করেছেন তাঁর বিশ্লেষণ অনুসারে রামের আদর্শে যুধিষ্ঠির, লক্ষ্মণের আদর্শে অর্জুন

দশরথের আদর্শে ধৃতরাষ্ট্র, বিভীষণের আদর্শে বিদুর এবং কুম্ভকর্ণের আদর্শে ঘটোৎকচ পরিকল্পিত। একথা স্বীকার করলে রামায়ণ পূর্বগামী হয়ে পড়ে মহাভারতের। এখন প্রশ্ন, "পাথুরে প্রমাণের" কাছে কি ট্রাডিশন দাঁড়াতে পারে। সত্যই পারে না। কারণ "পাথুরে প্রমাণ" নিপুন ভাবে নিক্ষিপ্ত হলে বেচারা ট্রাডিশন তো দূরের কথা, খোদ পণ্ডিত ব্যক্তিরা দাঁড়াতে পারেন না।

আগে উল্লেখ করেছি মহাভারত সম্বন্ধে পরে আরও কিছু বলবো। এবারে সেই কথা।

রামায়ণ ও মহাভারত ভারতের চিরন্তন আশ্রয়। রামায়ণ একাধারে কাব্য ও ধর্মগ্রন্থ; মহাভারত আরও কিছু বেশি। কাব্য ও ধর্মগ্রন্থ হওয়া ছাড়াও ইতিহাস; রামায়ণে ঐতিহাসিক উপাদান থাকতে পারে কিন্তু মহাভারত খাস ইতিহাস, অবশ্য সেকালে ইতিহাস যেভাবে লিখিত হতো তাই, ইতিহাস লিখবার রীতি কালে কালে বদলেছে।

এখন, মহাভারতের ইতিহাসে দুটি গুরুতর অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় আছে। ভারতযুদ্ধের উদ্দেশ্য ভারতকে অখণ্ড রাখবার চেষ্টা। তবে এই যুদ্ধে দেশের তাবৎ ক্ষাত্রশক্তি ধ্বংস হয়ে যায়, আর তা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরে এবং ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পথে বহিরাগতের আক্রমণ শুরু হয়। ভারত যুদ্ধের আগে আততায়ীর আক্রমণের বিবরণ ইতিহাস বা কিম্বদন্তীতে পাওয়া যায় না, সমস্তই ভারতযুদ্ধের পরে। মূল উদ্দেশ্যের ঠিক বিপরীত ব্যাপার ঘটলো। ভারতযুদ্ধ না হ'লে আলেকজাণ্ডার এ দেশে প্রবেশ করতে সাহস করতো কিনা সন্দেহ। এই গেল প্রথম শিক্ষণীয় বিষয়। দ্বিতীয় শিক্ষণীয় বিষয় ভারতের স্বেচ্ছাকৃত অস্ত্র সম্বরণ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাশুপাত, ব্রহ্মাস্ত্র, একঘ্নী প্রভৃতি যে সব অস্ত্রের উল্লেখ আছে তা থেকে কবিকল্পনার আতিশয্য বাদ দিলেও যা থাকে তার মারাত্মকতা কম নয়। যুদ্ধের পরে দেশের মনীষীগণ বুঝেছিল এসব অস্ত্র রক্ষণের অর্থ সার্বজনীন মৃত্যুবীজ লাগান। কাজেই তারা এসব মারাত্মক অস্ত্র আর যাতে ব্যবহৃত না হতে পারে তার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে ছিলেন। প্রথম পানিপথ যুদ্ধে বাবর প্রথম কামান ব্যবহার করেন, সেই থেকে পুনরায় দেশে মারাত্মক অস্ত্রের ব্যবহার সুরু হল। কিন্তু তার অনেক আগে ভারতবর্ষ মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছিল। আলেকজাণ্ডার কোন

মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করেছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার যুদ্ধ জয়ের মূল রহস্য নিপুন সৈনাপত্যগুণ। এ গুণটিও ভারতীয়েরা ভুলে গিয়েছিল ভারত যুদ্ধে সৈন্য চালনায় নিপুন ক্ষাত্রশক্তির বিলোপের সঙ্গে। কাজেই বহিরাগতের সম্মুখীন হওয়ার সময়ে ভারতের না ছিল যথেষ্ট মাত্র ধন, না ছিল মারাত্মক অস্ত্রসস্ত্র। না ছিল সৈনাপত্য প্রতিভা। ফলে বারম্বার পরাজিত হয়েছে। আততায়ীর সঙ্গে ভারতীয়েবযুদ্ধের ইতিহাস একটানা পরাজয়ের ইতিহাস। এটি একটি প্রধান কারণ যে জন্য মহাভারতকে ভারতের ইতিহাস বলা যেতে পারে। আর পরবর্তী পরাজয়ের ইতিহাস মনে রাখলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসের একটি প্রতীকী গান বলা অত্যুক্তি নয়। আমি পুরাতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক নই, কাজেই আমাব বক্তব্যের কতখানি ওজন তা বিচার করবার ভার ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিকদের উপরে ছেড়ে দিলাম। তাঁরা সম্প্রতি অনেক অবান্তর বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, সেসব ছেড়ে দিয়ে এমন বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করুন, যার উপরে ও সঙ্গে দেশের বর্তমান ইতিহাসের শুভাশুভ জড়িত।

# নবসাক্ষর

গত পঁচিশ বছরে শিক্ষাপ্রসার আশানুরূপ না হ'লেও এমন পরিমাণে হয়েছে যার প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যেই সমাজে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখনও শিক্ষাপ্রসারের সর্বব্যাপী আইন প্রণয়ন হয়নি। আশা করা অন্যায় নয় যে অচিরে তা হবে; তা হ'লে আগামী পঁচিশ বছরের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া স্পষ্টতর হবে। সামাজিক প্রতিক্রিয়ার শুধু একটি মাত্র দিক নিয়ে এখানে আলোচনা করবো—সাহিত্যের উপরে প্রতিক্রিয়া।

আলোচনায় প্রবেশ করবার আগে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, বাঙালী শিক্ষিত সমাজে নানা স্তর আছে। বহু সহস্র পরিবার আছে যাদের মধ্যে শিক্ষা ব্যাপারটা ধরাগত। তাদের মধ্যে নবাবী আমলের আগে শিক্ষা ছিল সংস্কৃত ভাষাবাহী, তারপর নবাবী আমলে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ফার্সি ভাষা মিলিত হ'ল। ইংরেজ আমলে ইংরেজী ভাষার যেমন আদর, নবাবী আমলে ছিল ফার্সি ভাষার। ব্যবহারিক প্রয়োজনেই এ ভাষাটা ঢুকেছিল, তারপরে শিক্ষিতের মান হ'য়ে দাঁড়ালো। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি ফার্সি সাহিত্যে অভিজ্ঞ ছিলেন। পরবর্তীকালে ইংরাজী শিক্ষিত মহলে শেক্সপীয়রের যে স্থান ছিল, শেক্সপীয়রের কোটেশন দিয়ে লোকে নিজের জ্ঞানের পরিচয় দিত, প্রকৃতিস্থ লোকে তো দিতই, এমন কি ঘোর অপ্রকৃতিস্থ অবস্থাতেও দিতে ভুলতো না।

ক্রমে ফার্সির কদর যতই কমতে লাগলো বাড়তে লাগলো ইংরাজীর আদর। মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র পাত্রগণের মুখেও ইংরেজীর বুলি। এই পরিবর্তনটা ঘটেছে ১৮১৭ থেকে শুরু ক রে ১৮৩৫-এর মধ্যে। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা আর ফার্সির বদলে ইংরাজীর আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রবর্তন। আগেই বলেছি, এমন বহু সহস্র পরিবার ছিল যাদের মধ্যে শিক্ষা কম বেশি এই তিন ভাষা অবলম্বী ছিল। কিন্তু এদের বাদ দিলে এমন বহু সহস্র পরিবার ছিল যাদের মধ্যে আদৌ শিক্ষার প্রসার ছিল না। প্রয়োজন কালে ফার্সি বাংলা দু'চারটে ইংরাজী বুলি মিশিয়ে কাজ সারতো যার প্রকৃষ্টতম প্রমাণ স্বরূপ এখনো আছে আদালতী ভাষায় লিখিত দলিল দস্তাবেজ। যাদের পক্ষে এসব দলিল লিখিত হ'তো

তাদের অনেকেরই অক্ষর পরিচয় ছিল না। স্বাধীন হওয়ার পরেও এ-রকম লোক যথেষ্ট ছিল, এখনো আছে।

কিন্তু এবারে তার পরিবর্তন ঘটতে সুরু করেছে নানা কারণে। শিক্ষার প্রয়োজন লোকে অনুভব করছে, শিক্ষা পেলে চাকুরী জোটে এই আশায় (হায়! আশা কুহকিণী।) এবং শস্যমূল্যের অভাবিত বৃদ্ধিতে (এটি চাষী পরিবার সম্বন্ধে মাত্র প্রযোজ্য।) আরও কারণ আছে। তপশিলী জাতি ও উপজাতি-সমূহকে বিশেষ সুবিধা দানের ব্যবস্থা। এমন বহু সহস্র পরিবারে শিক্ষার প্রসার ঘটছে যাদের মধ্যে শিক্ষা চিরাগত নয়—সম্পূর্ণ নবাগত। এদের বলতে পারা যায় নবসাক্ষর। তাঁরা লিখতে পড়তে শিখছে, কিন্তু উচ্চদরের সাহিত্য-বোধ তাদের হয় নি, কারণ তা বহু কালের শিক্ষার ও রুচিমার্জনার ফল। এ হচ্ছে গিয়ে 'সহস্রবর্ষের সাধনার ধন।' তারা লেখাপড়া শিখেছে, বই কিনবার ইচ্ছা ও সামর্থ্য তাদের হ'য়েছে। কিনছেও বই? কী বই তারা কিনবে? কারা লিখবে সে সব বই? নবসাক্ষরদের জন্য চাই নব-সাহিত্য। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এখনো তাদের ধারণাতীত। শরৎচন্দ্রের ছোট বইগুলো খানিকটা তাদের ধারণার মধ্যে। তবে এই সব নব সাক্ষরদের জন্য নব সাহিত্য প্রণয়ন প্রচেষ্টা সুরু হয়ে গিয়েছে, এখনো তার শৈশব। জীবিত লেখকদের দৃষ্টান্ত দিয়ে গঞ্জনা ভোগ করতে চাইনা। তাই বিদেশের নজির উদ্ধার করছি।

১৮৭০ সালে ইংলণ্ডে শিক্ষার সর্বাত্মক আইন পাশ হয়। তার প্রতিক্রিয়ায় অত্যল্প কালের মধ্যে নবসাক্ষরদের বুদ্ধি ও রুচির মাপে সাহিত্য সৃষ্টি হ'তে থাকে। ঠিক ১৮৭০ সালে ডিকেন্সের মৃত্যু হ'লেও তাঁর বইগুলো এই দাবী অনেক পরিমাণে মেটাতে সক্ষম হ'য়েছিল। থ্যাকারের বই পারেনি। শক্তির বেশি কমের জন্য নয়—থ্যাকারে লিখেছেন চিরাগত শিক্ষিতদের জন্য। ডিকেন্সের রচনা চিরাগত ও নবাগত দুই ধারাকেই তৃপ্তি দিতে পেরেছে। ভিন্নতর পরিবেশে শেক্সপীয়রও এই কাজে সক্ষম হয়েছিলেন। ও এক বিশেষ ক্ষমতার ব্যাপার। সেদেশের নবসাক্ষরদের জন্য যে সব রচনা লিখিত হ'য়েছিল তার অধিকাংশই নগণ্য—স্বভাবতই লোপ পেয়েছে। কিন্তু নব-সাক্ষরতা একটু পরিণত হ'য়ে উঠতেই এক প্রজন্ম সালের মধ্যে এমন সব সাহিত্যিক দেখা দিলেন যাদের রসের আবেদন নবসাক্ষরদের তৃপ্তি দিয়েও ফুরিয়ে যায় নি। আর এল. ষ্টিভেনসনের Treasure Island বালকদের জন্য প্রকাশিত কাগজে মুদ্রিত

হ'য়েছিল—তবে তার আবেদন প্রবীনদের উপরে আছে। কনান ডয়াল এবং রাডিয়ার্ড কীপলিং এই রকম আর দু'জন লেখক। এঁদেরও প্রধান পাঠক নবসাক্ষর। বিশেষ শক্তির সঙ্গে সাহিত্যের মান অটুট রেখেও তাঁরা নবযুগের রুচি চাঁদমারি ভেদ করতে সমর্থ হ'য়েছিলেন।

আমাদের দেশে নবসাক্ষরদের জন্য যে সব লেখক লিখছেন তাঁদের মধ্যে এখনো ষ্টিভেনসন, কনান ডয়াল বা কীপলিং দেখা দেননি। যুগধর্মে অবশ্যই দেখা দেবেন। অরণ্যের প্রান্তে থাকে আগাছা ও ছোট জাতের গাছপালা, অভ্যন্তরে বনস্পতি—এই হচ্ছে প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম।

# রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের উপন্যাসগুলির মধ্যে 'যোগাযোগ' উপন্যাসটি নানা কারণে একটি মহৎ ব্যতিক্রম। শেষ পর্বের উপন্যাসে যে তত্ত্বের মুখ্যতা ও কাহিনীর গৌণতা, বিশ্লেষনী নীতি ও লিরিক রীতির একান্ত প্রাধান্য দেখা যায় 'যোগাযোগ' সেই সকল লক্ষণ বর্জিত। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের উপন্যাস পড়তে পড়তে মনে হয় যেন তাঁর কলম শ্লথ গতি হয়ে পড়েছে। সেই জন্যই বোধ হয় নাটকে, উপন্যাসে ও ছোট গল্পে গল্পাংশ অপ্রধান হয়ে তত্ত্বকে সিংহাসন ছেড়ে দিয়েছে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'যোগাযোগ' এবং নাটকের ক্ষেত্রে 'নটীর পূজা' এ ধারণাকে খণ্ডন করেছে। 'যোগাযোগ' পাঠে দেখতে পাওয়া যায় যে, 'চোখের বালি'র কলম বিন্দুমাত্র শক্তি হারায়নি। বস্তুতঃ এমন প্রবল বেগ সম্পন্ন কাহিনী কবি অল্পই লিখেছেন। এই কথা মনে করলে 'যোগাযোগ' এর অসম্পূর্ণতার জন্য খেদের অন্ত থাকে না। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, উপন্যাসখানি প্রথমে 'তিনপুরুষ' নামে পত্রিকায় প্রকাশিত হতে শুরু করে। কিন্তু অতি শীঘ্রই তার নতুন নামকরণ করা হয় 'যোগাযোগ'। ঐ পুরাতন নামের সূত্রে বোঝা যায় যে একটি প্রাচীন ও নবীন বংশের মিশ্রিত কাহিনী লিখবেন বলে তিনি প্রস্তুত হয়েছিলেন এবং সে কাহিনী তিনপুরুষের জীবনকে অবলম্বন করে গড়ে উঠবে। একথা সত্য হলে 'যোগাযোগ' এর বর্তমান আকারে তিনপুরুষের কাহিনী পাওয়া যায় না। মধুস্দন ও কুমুদিনীর পুত্র অবিনাশের জীবন সম্বন্ধে একটি মাত্র তথ্য আমরা জানতে পারি যে, ৩২শে আষাঢ় তার জন্মদিন। পুত্রের জন্মদিন উপলক্ষে গল্পটি আরম্ভ হয়ে পিতামাতার জীবন কাহিনীর দিকে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। উপন্যাসগুলির 'তিনপুরুষ' নামের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবার ইচ্ছা হয়তো কবির মনে ছিল। তিনি অনেক সময় উপন্যাসখানি সঙ্গে নিয়ে নানাস্থানে ভ্রমণও করেছিলেন। কিন্তু যে কারণে হোক উপন্যাসখানি নতুন করে আরম্ভ করার সুযোগ আর ঘটেনি। এই অভাবটি বাংলা সাহিত্যে একটি দুর্ঘটনা বলে মনে করতে হবে। এর অনুরূপ আর একটি বৃহৎ দুর্ঘটনার কথা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আছে বলে মনে হয়। শুনতে পাওয়া যায় যে শেষ জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের বৈদিক আমলের কাহিনী নিয়ে একটি উপন্যাস রচনা করার

ইচ্ছা ছিল। তিনি নাকি ধীরে ধীরে প্রস্তুত হচ্ছিলেনও। এমন সময় অকাল মৃত্যু এসে যবনিকাপাত করলে সমস্ত চির রহস্যাবৃত রয়ে যায়।

ইতিপূর্বে 'যোগাযোগ' উপন্যাসকে তৃতীয় পর্বের একটি ব্যতিক্রম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যতিক্রমটি কিসের তারও কিছু আভাস দেওয়া হয়েছে। আরও কিছু বলা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি উপন্যাস যেমন 'চোখের বালি' বা 'নৌকাডুবি' তাঁর মানস-মুকুর স্বরূপ। এগুলিতে যে ছায়া প্রতি-বিম্বিত—সে ছায়াতে তাঁর ব্যক্তিমনের অবস্থা ও গতিবিধি সুস্পষ্ট। আরও কতকগুলি উপন্যাস আছে যেমন 'গোরা' 'ঘরে বাইরে', 'শেষের কবিতা'—এ-গুলিতে যুগধর্ম যেমন প্রতিবিম্বিত হয়েছে, ব্যক্তিরূপ তেমন নয়। 'যোগাযোগ' এর অন্যতম। কোন একটা যুগকে প্রতিবিম্বিত করতে হলে যে বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োজন হয় তাকে কলমের "এপিক কোয়ালিটি" বলা যেতে পারে। যদিও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিশেষ লক্ষণ "লিরিক কোয়ালিটি" তা সত্ত্বেও কখনও তিনি যেমন যুগের প্রধিনিধিত্ব করতে সক্ষম হয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র ব্যতীত তেমন আর কেউ পারেন নি। শেষ জীবনের এই উপন্যাসখানিতে তিনি সামাজিক শক্তির উত্থান-পতনের একটি চিত্র বৃহৎ পটভূমির ওপরে আঁকতে শুরু করে-ছিলেন। ভূমি নির্ভর প্রাচীন জমিদার বংশের অবনতি যেমন ঘটেছে তেমনি আবার ব্যবসায়-নির্ভর নতুন বংশের অভ্যুত্থান হয়েছে। বিত্তের ও সেই সঙ্গে শিক্ষা-দীক্ষার রূপান্তর ঘটেছে। এই অবস্থা বাঙালী সমাজ সম্পর্কে একটি ঐতিহাসিক সত্য। বলা বাহুল্য, এর সূচনা কোম্পানীর শাসনের প্রারম্ভে এবং কোম্পানীর হাত থেকে বৃটিশরাজের হাতে শাসনভার যাবার কালে এই অবস্থা স্থায়ীরূপ লাভ করেছে। এই সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিবর্তনের ইতিহাসই 'যোগাযোগ'এর পটভূমি। এই গ্রন্থে বিত্তের ও শিক্ষার গৃহ পরিবর্তনের চিত্রটা হাতে অঙ্কিত হয়েছে। বিপ্রদাস ও মধুসূদন বিলীয়মান ও উত্থানমান ধারা দুটির যোগ্য প্রতিনিধি। দোষে এবং গুণে দুটি চরিত্রই প্রবল শক্তিশালী।

সমাজের অর্থ নৈতিক শক্তি এবং তারই অনুসঙ্গরূপে শিক্ষা-দীক্ষার উত্থান-পতন রবীন্দ্রনাথ যত অনায়াসে অঙ্কন করতে পারেন এমন আর কোন বাঙালী ঔপন্যাসিক পারেন না। এমন কি নানাবিধ চরিত্র অঙ্কনে স্বাভাবিক পটুতা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রও এক্ষেত্রে ন্যূন। রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পিত কয়েকটি চরিত্র আলোচনা করলেই আমাদের বক্তব্য বুঝতে পারা যাবে। 'গোরা' উপন্যাসের

গোরা 'ঘরে-বাইরে'র সন্দীপ, 'শেষের কবিতা'র অমিত রায় এই শক্তির প্রধান দৃষ্টান্ত। এরা কেউই সজীব চরিত্র নয়—যুগ চরিত্র। 'গোরা' উপন্যাসের ঘটনাকাল যদি উনবিংশ শতকের অষ্টম দশকে ধরা যায়, 'ঘরে-বাইরে'র ঘটনাকাল স্পষ্টতঃ ১৯০৫ সাল আর 'শেষের কবিতা'র ঘটনাকাল ও রচনাকাল অভিন্ন। তবেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, বাঙলাদেশের সামাজিক ইতিহাসে প্রায় পঞ্চাশ বছর কাল রবীন্দ্রনাথ এই কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত করে তুলেছেন। গোরা ও সন্দীপের মধ্যে দৃষ্টি, সংস্কৃতি ও আদর্শবাদে বিস্তর প্রভেদ থাকলেও তাদের দু'জনকেই নবজাগ্রত বাঙালী সমাজের প্রতিনিধি বলে গ্রহণ করা অসম্ভব নয়। এদের সঙ্গে তুলনা করলে অমিত রায়কে ভিন্ন একটি যুগের লোক বলে মনে হয়। কথিত ৫০ বছরের বাঙালীর সামাজিক মনে যে পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে তার এমন সূক্ষ্ম ও সর্বস্পর্শী বিবরণ আর অন্যত্র পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। এটি রবীন্দ্রনাথের কলমের একটি বিশেষগুণ এবং এর মূলে মানবচরিত্র সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা যতই থাক না কেন এর আসল প্রেরণা তাঁর মনীষা। মহৎ ঔপন্যাসিক হলেই যে এই গুণের অধিকারী হওয়া যায় তা নয়, এ এক বিশেষ ধরণের ক্ষমতা।

এবারে বিপ্রদাস ও মধুসূদন—এই চরিত্র দুটি আলোচনা করলে এই ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাবে। গোরা ও বিনয়ের মধ্যে মতে ও আদর্শে যতই প্রভেদ থাকুক না কেন, তারা এক সময়ের এক সমাজের লোক। নিখিলেশ ও সন্দীপ সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। 'শেষের কবিতা'র অধিকাংশ নরনারী এক ঝাঁকের পাখী। কিন্তু বিপ্রদাস ও মধুসূদনকে এক সমাজের লোক বলে মনে হয় না। আভিজাত্যের যে উদার মনোভাব সম্পন্ন যুগ গত বা গতপ্রায় বিপ্রদাস তার চিহ্ন স্বরূপ আজও জীবিত। যে ধনগর্বী আত্মস্বাতন্ত্র্য পরায়ণ কাল আসন্ন মধুসূদন তারই অগ্রদূত। উভয়ের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। তবে সে ব্যবধান ব্যক্তিগত রুচিমাত্র নয়—কালের দৃষ্টি, কালের রুচি, কালের বহুপ্রকার চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত। কাজেই মধুসূদন ও বিপ্রদাসের মধ্যে শিষ্টতার অবকাশ থাকলেও মনে মিলের ক্ষেত্র নাই। কুমুদিনীকে নিয়ে উভয়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তার মূলে এই দুই ভিন্ন কালের প্রেরণা। এর সমাধান কোন ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা সম্ভব নয়। কেননা, এই সমস্যার সৃষ্টি কালের স্বভাবের মধ্যে নিহিত—কালের নিয়মেই তার সমাধান হবে, ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপে নয়। অবিনাশ চরিত্রের মধ্যে খুব সম্ভব এই কালের

নিয়মের হস্তক্ষেপ প্রত্যাশা করার ছিল। কিন্তু অবিনাশ চরিত্রের যে সামান্য একটু আভাস তা নিয়ে দিগন্ত পাওয়া যায়, তারপরে নিশ্চিন্ত কোন সিদ্ধান্ত খাড়া করা চলে না। তবু বোধ করি বলা যায় যে মধুসূদন চরিত্রে ও বিপ্রদাস চরিত্রে যে বিশেষ গুণগুলি ছিল অবিনাশ চরিত্রে এসে তাদের যুগোচিত সমন্বয় ঘটেছে। এর অধিক কিছু অনুমান করা সঙ্গত হবে না। কেন না, লেখক সমস্ত গল্পটিকে একটি অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝুলিয়ে রেখেছেন। তবে ব্যক্তিচরিত্রের এই আরোপ এটাই 'যোগাযোগ' উপন্যাসের ভিত্তি ও লক্ষণ। পূর্বকথিত উপন্যাসগুলি থেকে 'যোগাযোগ' এর ভিত্তি প্রশস্ততর, লক্ষণগুলি স্পষ্টতর। বস্তুতঃ, এমন ভাবে দৃঢ় বনিয়াদ গেঁথে লেখক আর কোন উপন্যাস সৃষ্টি করতে বসেন নি। সুতরাং এর অসমাপ্তি মনে এমন পরিতাপের সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে যে ত্বরা ও গ্রন্থি শিথিলতার ভাব লক্ষ্য করা যায় 'যোগাযোগ' এ তা নেই।

এবারে উপন্যাসের বনিয়াদ ও যুগপ্রবণতা ছেড়ে দিয়ে চরিত্রসৃষ্টি ও কাহিনী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পদার্পণ করলে দেখা যাবে যে, বয়সের জীর্ণতা তাঁর লেখনীকে স্পর্শ করেনি। 'চতুরঙ্গ', 'দুইবোন', 'মালঞ্চ'প্রভৃতি উপন্যাস নামধেয় রচনায় যদি ত্বরা ও আংশিকতার লক্ষণ দৃষ্ট হয় তবে 'যোগাযোগ' সাক্ষ্যে বুঝতে পারি তা ক্ষমতার অভাবে নয় অন্য কারণে ঘটেছে। বিশেষ সন্তোষের বিষয় এই যে, খণ্ড বা তত্ত্ব উপন্যাস রচনার ইচ্ছা 'যোগাযোগ' উপন্যাসকে আক্রমণ করেনি। ফলে যা পেয়েছি তা তত্ত্বের ব্যাখ্যা নয়, জীবন দর্শনের একটি সরস ও সজীব চিত্র। বিপ্রদাস ও মধুসূদন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যতই হোক কুমুদিনী চরিত্রটি এর আসল সম্পদ। কবি মন্তব্য করেছেন যে, বাংলা সাহিত্যে পুরুষ চরিত্রের তুলনায় নারী চরিত্রগুলি অধিকতর দীপ্তিমান। বঙ্কিম প্রসঙ্গে এই উক্তি হয়ে থাকলেও এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ কবি স্বয়ং। তাঁর যাবতীয় পুরুষ ও নারী চরিত্র সম্পর্কে এই কথা কতখানি প্রযোজ্য তার বিশদ আলোচনা এক্ষেত্রে না করেও বলা যায় যে, কুমুদিনী রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত একটি শ্রেষ্ঠ নারী চরিত্র। অগ্রজ ও স্বামীর ভিন্নমুখী আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়ে সে দুঃখ পেয়েছে বটে কিন্তু স্বীয় ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে যন্ত্রচালিত পুত্তলিতে পরিণত হয়নি। উচ্চ আদর্শবাদ ও উদার আভিজাত্যের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে লালিত হয়ে অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় সে এক এমন সংসারে উপস্থিত হল যেখানে আদর্শবাদ ও আভিজাত্যের নামমাত্র

নেই। মধুসূদন ভেবেছিল যে, প্রাচীন বংশের ধ্বংসাবশিষ্ট চূড়ার ওপরকার এই স্নিগ্ধোজ্জ্বল তারাটিকে সহজেই করায়ত্ত করা যাবে। তাই সে সমস্ত ধনবল নিয়োগ করে চূড়ার ওপরে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু যখন দেখল, সেই তারা আগে যত উঁচুতে ছিল তখনও ততখানি দূরে রয়ে গেল তখন আর বিস্ময় ও ক্ষোভের অন্ত রইল না।

ধনবলের দ্বারা যে নারী-চিত্ত জয় করা যায় না, এটা তার পক্ষে এক নতুন অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতার সূত্রেই কুমুদিনী ও মধুসূদনের দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বের সকল আঘাত এসেছে মধুসূদনের দিক থেকে। সমস্ত আঘাত কুমুদিনী নিঃশব্দে সহ্য করেছে। সামান্যতম আর্তনাদও করেনি। মধুসূদনের কাছে এটা একরকম অবাধ্যতা বলে মনে হয়েছে। ধনগর্বী মধুসূদন এই প্রথম বুঝলো সংসারে এমন স্থানও আছে যেখানে তার মত অসহায় আর কেউ নেই। কুমুদিনীর এই নীরব সহিষ্ণুতার দায়িত্ব, মধুসূদনের কাছে বিপ্রদাসের বলে মনে হয়েছে। সে কেবল কুমুদিনীকে পত্নীরূপে চায় নি, পুরাতন আভিজাত্যের ওপর নতুন ধর্মের জয়চিহ্ন রূপে কামনা করেছিল। কিন্তু নিশান যখন বাতাসে প্রসারিত হোল তখন দেখা গেল তা ইঙ্গিত করছে বিলীয়মান আভিজাত্যের সেই ধ্বংস প্রাসাদটির অভিমুখে। এর সমাধান মধুসূদনের অজ্ঞাত। বস্তুত এই কাহিনীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা কৃপার পাত্র হতভাগ্য মধুসূদন--অমূল্য বস্তু পেয়েও মুল্য বোঝবার ক্ষমতা যার হোল না। কুমুদিনীর অদৃষ্ট বিড়ম্বিত নিঃসন্দেহ, কিন্তু তার নির্ভর একটি অজেয় আদর্শবাদ। বিপ্রদাসের অদৃষ্ট ও বিড়ম্বিত নিঃসন্দেহ, কিন্তু তার নির্ভর প্রাচীন আভিজাত্যের নিঃশব্দ মহিমা। বেচারা মধুসূদনের একমাত্র ভরসা নবার্জিত ঐশ্বর্য। কিন্তু সে দেখে বিস্মিত হোল যে, একটি দুর্বল নারীর আদর্শবাদের কাছে এবং একটি নিঃসহায় অভিজাত ব্যক্তির মহিমার কাছে সে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়েছে। এর প্রতিকার সে জানে না।

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ উপন্যাসেই দেখা যায় যে, একটি প্রধান নারীচরিত্র অন্যান্য পুরুষ ও নারীকে আচ্ছন্ন প্রায় করে সবলে ভাবলোকে উত্থিত হয়। 'যোগাযোগ'ও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। 'চোখের বালি'তে বিনোদিনী 'ঘরে বাইরে'তে বিমলা এবং 'যোগাযোগ' এ কুমুদিনী পূর্বোক্ত নিয়মের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 'গোরা' উপন্যাসে পরিধি বিস্তার ও ঘটনা বাহুল্য অনেকগুলি প্রধান নারী চরিত্রের সৃষ্টি করেছে। আনন্দময়ী, সুচরিতা ও ললিতা এই ত্রয়ীকে

'গোরা' উপন্যাসের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ বলা যেতে পারে। কিন্তু এই উপন্যাসে এমন একটি বিরাট পুরুষ চরিত্রের কল্পনা করেছেন যা ডালপালা মেলে ঐ নারী চরিত্রগুলিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। 'গোরা' উপন্যাসখানিকে বাদ দিলে দেখা যায় যে, তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসে ঘটনায়, ভাবনায় জড়িত যে রূপ তার প্রধান অবলম্বন একটি নারী চরিত্র। অন্তত 'যোগাযোগ' সম্বন্ধে এ বিষয়ে দ্বিমত হবার আশঙ্কা নেই। একদিকে বিপ্রদাস অপর দিকে মধুস্থদন—এই দুজনের টানাটানিতে যে সমুদ্র মন্থন চলেছে তারই রহস্যগর্ভ থেকে লক্ষ্মীর ন্যায় উদিত হয়েছেন কুমুদিনী। কুমুদিনী চরিত্রের প্রধান শক্তি তার নীরব সহিষ্ণুতা। ললিতার প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ তাতে নেই কিংবা কবির শেষ জীবনে পরিকল্পিত নায়িকাগনের মধ্যে যেমন 'স্ত্রীরপত্র'র মৃণাল, 'পয়লা নম্বরের' অনিলা কিংবা আরও পরবর্তীকালের 'ল্যাবরেটরী'র সোহিনীর মত প্রত্যক্ষ অসহিষ্ণুতাও তার মধ্যে নেই। কুমুদিনী সমস্ত প্রবৃত্তি ও অভিপ্রায়ের ভারসাম্যে একটি শতদল সৃষ্টি করে তারই ওপরে দণ্ডায়মান। তুলনায় ললিতা অনেক বেশী সুসহ। তার সঙ্গে লড়াই করার উপায় আছে। সোহিনী দুঃসহ হলেও একেবারে অপরাজেয় নয়। তার সঙ্গে লড়াই না চলুক বিবাদ চলতে পারে। কিন্তু এই মহিয়সী নারী স্বাভাবিক আভিজাত্যের প্রেরণায় এমন একটি উত্তুঙ্গ নীরবতার শীর্ষে বিরাজিত যে তার বিরুদ্ধে মনে যত ক্ষোভই থাকুক না কেন, তার কাছে তা পৌঁছিয়ে দেবার উপায় মাত্র নেই। সে যদি ললিতার মত প্রগলভ্, সোহিনীর মত কলাকৌশলময়ী হত তবে হয়তো মধুস্থদনের সমস্যাব সমাধান দুরূহ হত না। এই শ্রেণীর যে সমস্ত নারী-চরিত্র কবি সৃষ্টি করেছেন কুমুদিনী তার শীর্ষস্থানীয়। তার সংগে সুচরিতার অনেকখানি মিল আছে বটে।

গৌণ চরিত্র অঙ্কনে লেখকের এক বিশেষ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। দু' একটি আঁচড়ে একটি বিশিষ্ট নারী অথবা পুরুষ চরিত্র সৃষ্টি করার শক্তি সহজ নয়। এ বিষয়ে বঙ্কিমের কৃতিত্ব বোধকরি সকলের উপরে। তাঁর উপন্যাস পাঠ করলে সোনা ও রূপা, দিবা ও নিশার মত বহু নরনারী পাওয়া যাবে যাদের সৃষ্টি করতে লেখকের দু'চারটির অধিক আঁচড়ের প্রয়োজন হয় নি। রবীন্দ্রনাথেরও এই ক্ষমতা সুপ্রচুর। মতির মা, নবীন, শ্যামাসুন্দরী অবশ্যই গৌণ চরিত্র, কিন্তু একে অপরের সংগে মিশে যায় না। এদের অনেকেই নেপথ্যে আছে, অনেক

সময়েই নেপথ্যের পর্দায় তাদের ছায়ামাত্র রূপে আছে, তা সত্ত্বেও তারা যেমন সজীব তেমনি স্বতন্ত্র।

উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাস পড়লে দেখা যায় যে, অনেক বড় ঔপন্যাসিকের রচনায় তেমন রচনাসৌষ্ঠব নেই। সাহিত্যের যাবতীয় ব্যাখ্যার মধ্যে একমাত্র উপন্যাসেই রচনাসৌষ্ঠবের অভাব কতকটা ক্ষমার যোগ্য। গল্পের টান ও নর-নারীর বিচিত্র জীবনলীলা পাঠকের মনকে এমন ভাবে আকর্ষণ করে থাকে যে, রচনাসৌষ্ঠবের শিথিলতা চোখে পড়ে না কিংবা রসবোধেও তেমন হানি ঘটায় না। সৌভাগ্য বশতঃ বাংলা সাহিত্যের তিনজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র রচনাসৌষ্ঠবে বলীয়ান। কাহিনীতে রসসৃষ্টির পক্ষে রচনা-সৌষ্ঠব যে একটি অপরিহার্য উপাদান একথা তাঁরা কখনও ভোলেন নি। শরৎ-চন্দ্রের আশ্চর্য ভাষারীতি তাঁর কৃতিত্বের ও জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ। বঙ্কিম-চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের তুলনায় তাঁর কাহিনী বস্তু অনেক হাল্কা হলেও তাঁর গুরুত্ব কম নয়। তাঁর অদ্ভুত ভাষারীতি কাহিনীকে প্রচণ্ড প্রাণবন্ত করে তুলেছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই উক্তি বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য—যদিও তাঁদের কাহিনীর নিজস্ব গুরুত্ব বর্তমান। রবীন্দ্রনাথ জীবনের পর্বে পর্বে ভাষারীতির বিচিত্র পরীক্ষা করেছেন। মধ্যপর্বে লিখিত 'গোরা' উপন্যাসে তাঁর ভাষারীতি একটি ভারসাম্যে উপনীত হয়েছে। 'ঘরে বাইরে' থেকে আরম্ভ করে শেষ জীবনের উপন্যাসগুলিতে এই ভারসাম্য লোপ পেয়ে তার বদলে একটি ভাস্বরতা দীপ্যমান হয়ে উঠেছে। 'শেষের কবিতা'র ভাষা যেন কাঁচের গম্বুজে মধ্যাহ্ন সূর্যকিরণের প্রতিফলন। চোখ এমন ঝাপসে যায় যে, গম্বুজের প্রকৃতি দেখার সুযোগ পাওয়া যায় না। 'তিনসঙ্গী'র ভাষা সম্বন্ধেও একথা খাটে। 'যোগাযোগ' এই সময়ের রচনা হলে ও ভাষারীতির বিশেষ প্রকৃতিটি তেমন প্রকট হয়ে ওঠার সুযোগ পায় নি। তার কারণ মনে হয় এই যে, গল্পের বেগ ও পাত্র-পাত্রীর জীবন দ্বন্দ্বের কাছে কবির কলম নত হয়েছে। 'শেষের কবিতা'র গল্পাংশ অতি সামান্য। গল্পাংশের সেই সামান্যতা রচনাসৌষ্ঠবের অসামান্যতা দ্বারা কবি আবৃত করে দিয়েছেন। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ 'যোগাযোগ' এ তা ঘটেনি। এর কাহিনীটি এমন বিস্তৃত, এর পটভূমি এমন ব্যাপক আর এর উপাদানগুলি এমন জটিল ও বিচিত্র যে রচনা সৌষ্ঠব একান্ত হয়ে উঠে গল্পের হানি ঘটাতে পারেনি। তা সত্ত্বেও কবির শেষ জীবনের ভাষা

লক্ষণ এতে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। বহু 'সুভাষিত' তাঁর শেষ জীবনের ভাষার একটি প্রধান সম্পদ। 'ঘরে বাইরে' থেকে আরম্ভ করে 'ল্যাবরেটারী' পর্যন্ত যত্রতত্র এদের দেখা পাওয়া যাবে। 'যোগাযোগ'-এও আছে। তবে প্রকাণ্ড গল্পের মধ্যে তারা মুখ্য হয়ে উঠে গল্পের স্রোত থেকে পাঠকের মনকে অন্যদিকে আকর্ষণ করে না।

# বড়দিদি

১৯০৭ সালে ভারতী পত্রিকায় বড়দিদি গল্পটি প্রকাশিত হয়, প্রথম দুই সংখ্যায় লেখকের নাম ছিল না। পাঠক সমাজের ধারণা হয়েছিল এ লেখা রবীন্দ্রনাথের, কোন কারণে নাম না দিয়ে লিখছেন। পাঠক সমাজের ধারণা যাই হোক বঙ্গদর্শনের সহকারী শৈলেশ মজুমদার কিঞ্চিৎ রুষ্ট হয়েছিলেন ; এ কি রকম ব্যাপার, নিজের বঙ্গদর্শন থাকতে রবীন্দ্রনাথ কি না শেষে ভারতীতে লিখতে গেলেন ; নাম না দেওয়ার কারণ অনুমান করলেন চক্ষুলজ্জা। তিনি সোজা গিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে অভিযোগ করলেন। রবীন্দ্রনাথ তো অবাক। পাঠিয়ে দিয়ো তো লেখাটা। দেখলেন পাকা হাতের লেখা। পরে প্রকাশ পেলো লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কোন ভাবী সাহিত্যরথীর পক্ষে এর চেয়ে ভালো curtain raiser হতে পারতো না। কেবল বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ নয়, একেবারে তাঁর লেখার সঙ্গে সামিল হওয়া। বড়দিদি তাঁর প্রথম রচনা নয়, শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যেও নয় তবু শারদীয় বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা না করেও বলা যায় যে একটি নূতন রস সঞ্চারিত হল, নূতন বিভা প্রতিফলিত হল বাংলা সাহিত্যে—আর সেই সঙ্গে আনলো ভবিষ্যতের ভরসা।

গল্পটির প্রধান পাত্র ধনীর সন্তান সুরেন্দ্রনাথ, যিনি পিতার অবহেলায় এবং বিমাতার অত্যুগ্র স্নেহময় কর্তব্যপরায়ণতায় নিজেকে কখনো আবিষ্কার করতে পারেন নি। এম-এ পাশ করেছেন তবু নিজের শক্তি ও সত্তা সম্বন্ধে নিরক্ষর। সুরেন্দ্রনাথের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ 'নিশ্চেষ্ট সরলতা' এরকম লোক বাংলা সাহিত্যে আরও আছে। রবীন্দ্রনাথের মেঘ ও রৌদ্র গল্পের শশিভূষণ এবং অপরিচিতা গল্পের অনুপম এই রকম ছাঁচে গড়া। শশিভূষণ অনেকগুলো পাশ করা সত্ত্বেও কাজকর্মের চেষ্টা না করে গাঁয়ের শান্ত পরিবেশে জীবন কাটিয়ে দেয়—তার একমাত্র সঙ্গিনী, খেলার সাথী বলাই উচিত গিরিবালা নামে একটি বালিকা। অনুপমের জীবনও এই ভাবে কাটছিল এমন সময়ে একজন সাহেবের বিষনজরে, আর একজন মাতুলের লুব্ধ নজরের শিকারে পরিণত হল—

অকস্মাতের সংঘাতে তাদের জাগ্রত পৌরুষ আবিষ্কার করলো নিজেদের। বঙ্কিমচন্দ্রের কুন্দনন্দিনী 'নিশ্চেষ্ট সরলতার' পুত্তলী, বিষপানের পরে নিজের উপর থেকে শেষ পর্দাখানা অপসারিত হয়ে যাওয়ায় তার মুখ ফুটেছে। এবার সুরেন্দ্রনাথে ফিরে আসা যাক। এই কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তিকে বন্ধুরা বুঝিয়ে দিল তার বিলেত যাওয়া আবশ্যক—তখনি সে বিলেত যেতে প্রস্তুত। পিতা বাধা দিলে আবার বন্ধুরা বুঝিয়ে দিল তার মতো লোকের পক্ষে কলকাতায় চাকুরি পাওয়া অসম্ভব নয়—চাকুরিদাতারা উদ্যত হয়ে বসে আছে। সুরেন্দ্রনাথ কলকাতার মহাসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে হাবুডুবু খেতে খেতে ভাগ্যগুণে একদিন বড়দিদির বাড়ীতে গৃহশিক্ষকরূপে আশ্রয় পেলো।

গল্পটির মধ্যে বড়দিদি বারো আনাই প্রচ্ছন্ন। বিপত্নীক ধনী জমিদার ব্রজরাজ লাহিড়ীর বিধবা জ্যেষ্ঠা কন্যা বড়দিদি। বিবাহের পরেই বিধবা হয়ে ফিরে এসেছেন পিত্রালয়ে এবং কন্যাপদ থেকে একেবারে ডবল প্রোমোশন পেয়ে বাড়ীর কর্তৃত্ব গ্রহণ করবার পরে বাড়ীর শ্রী ও শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। বাড়ীর কর্তা নামেমাত্র, বড়দিদিই সব। ঝি-চাকর পুত্রকন্যা সকলেই মুখেই বড়দিদি-রব। সুরেন্দ্রের ছাত্রী প্রমীলা, বড়দিদির কনিষ্ঠা ভগ্নী। সুরেন্দ্রনাথ ছাত্রীকে পড়ায় না, শ্লেট নিয়ে সে আঁকজোক করে আর সুরেন্দ্রনাথ আপন মনে উচ্চ গণিতের সমস্যা সমাধান করে। প্রমীলার বিদ্যার অগ্রগতি দেখে বড়দিদি জিজ্ঞাসা করে পাঠায় ছাত্রীকে কেন পড়ান না। মাস্টার সোজা উত্তর দেয় ভালো লাগে না। তবে কেন তিনি মাষ্টারী নিয়েছেন? সদুত্তর পায় না বড়-দিদি। সকলেরই প্রয়োজন মেটায় বড়দিদি, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের প্রয়োজন মেটানো কিছু কঠিন। একদিন প্রমীলাকে দিয়ে কম্পাস চেয়ে পাঠায়—আর একদিন চশমা। বড়দিদি কৌতুক অনুভব করে, কৌতুক থেকে কৌতূহল। ক্রমে নীচের তলায় এই বয়স্ক শিশুটির প্রতি বাৎসল্য রস অনুভব করে। বড়-দিদির সখী মনোরমা পত্রযোগে ব্যাপারটা জানতে পেরে বড়দিদিকে সচেতন করে দিয়ে বলে যে বাৎসল্য রসের শিকড় অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছে, এতটা ভালো নয়। বড়দিদির যত রাগ গিয়ে পড়ে সুরেন্দ্রনাথের উপর। বাড়ীর সবাই বড়দিদি বলে—সমালোচকের পিতৃদত্ত নামটি বলতে বাধা নেই। সেটি মাধবী। এখানে গল্পটি বিবৃত করা অনাবশ্যক, সকলেই পড়েছেন। অপরিহার্য অংশমাত্র বলছি, নতুবা পাঠকের নয় সমালোচকের অসুবিধা। মাধবী একবার

কিছুদিনের জন্য কাশী চলে গিয়েছিল। সুরেন্দ্র কম্পাস ও চশমা পায় না। প্রমীলার কাছে শুনলো বড়দিদি কাশী চলে গিয়েছেন। যে বড়দিদিকে কখনো চোখে দেখে নাই, তার অভাবে অসহায় অনুভব করলো। হঠাৎ একদিন বড়দিদির প্রত্যাবর্তন। তখন এই কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকটি প্রমীলার সঙ্গে সোজা উপরে বড়দিদির ঘরে গিয়ে স্বস্তি নিবেদন করলো, ফলে অস্বস্তি অনুভব করলো মাধবী, তার মনে পড়লো মনোরমার পত্র। বড়দিদি বিদায় করে দিল সুরেন্দ্রনাথকে। বিনা বাক্যব্যয়ে বড়দিদি প্রদত্ত চশমাটি রেখে দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ কলকাতার জনসমুদ্রে পুনরায় বিলীন হল। পরবর্তী ঘটনা সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত। অন্ধকারে রাস্তা পার হতে গিয়ে সুরেন্দ্র গাড়ী চাপা পড়ে হাসপাতালে। খবর পেয়ে সুরেন্দ্রের পিতা ও ব্রজরাজবাবু এলেন। একটু সুস্থ হয়ে উঠলে সুরেন্দ্রকে নিয়ে তার পিতা চলে গেলেন। তারপরে পর পর তিনটি মৃত্যু। ব্রজরাজবাবু সুরেন্দ্রের পিতা ও সুরেন্দ্রের ধনী জমিদার মাতামহ মারা গেলেন। সুরেন্দ্রনাথ মাতামহের স্থলে জমিদার হয়ে বসলো। বলা বাহুল্য, এমন পাত্রের বিবাহ অনিবার্য্য—পত্নী শান্তি।

ব্রজরাজবাবুর পুত্র শিবচন্দ্র এখন বাড়ীর কর্তা, কর্ত্রী তার বধু। জায়ে ননদে কবে মিল হয়। বড়দিদি দেখে তার কর্তৃত্ব অচল। তখন ভাগিনেয়কে নিয়ে স্বামীর ভিটায় ফিরে যায়। ঘটনাচক্রে সেই ভিটাটুকুর মালিক জমিদার সুরেন্দ্রনাথ।

অতঃপর নিশ্চেষ্ট সরলতার অপর এক মূর্তি দেখা দিল সুরেন্দ্রনাথের চরিত্রে। ইয়ারবক্শি জুটলো, বাগান বাড়ী হল, কলকাতা থেকে এলোকেশী এল। এ-ও নিশ্চেষ্ট সরলতার ফল। সুরেন্দ্রনাথ কঠিন কর্তব্য বা কটুকথা কাউকে বলতে পারে না। শান্তি কেবল কাঁদে আর দেবতার কাছে মানত করে। ও বৈ আর তার হাতে কি আছে। ইতিমধ্যে এতকাল যে লোকটি মাধবীর সম্পত্তি-টুকু ভোগ করছিল মাধবীর প্রত্যাবর্তনে তার আনন্দিত হওয়ার কথা নয়। সুরেন্দ্র ম্যানেজার মথুরবাবুর সঙ্গে যোগসাজসে বাকি খাজনার দায়ে ক্ষুদ্র সম্পত্তিটুকু গ্রাস করলো! নিরুপায় মাধবীরা নৌকাযোগে প্রমীলার বাড়ী রওনা হল। ইতিমধ্যে ঘটনাচক্রে, জমিদারির কাগজপত্র দেখতে গিয়ে সুরেন্দ্র আবিষ্কার করলো মাধবী দেবীর সম্পত্তি তার কবলস্থ হয়েছে। তখন কারো নিষেধ না শুনে তখনি ঘোড়া ছুটিয়ে চলল মাধবীদের গাঁয়ে। এ-ও নিশ্চেষ্ট

সরলতার প্রতিক্রিয়া। শশিভূষণ, অনুপম ও কুন্দনন্দিনী এই উপলক্ষে স্মরণীয়। গাঁয়ে বড়দিদি নেই, নৌকাযোগে তারা দক্ষিণ দিকে কোথায় রওনা হয়ে গিয়েছে। সেই দিকে আবার ঘোড়া ছুটলো সুরেন্দ্রনাথের। এই প্রচণ্ড পরিশ্রমে কলকাতায় গাড়ী চাপা পড়ায় যে ক্ষত হয়েছিল তার মুখ ছুটে গিয়ে সুরেন্দ্রর মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে আরম্ভ করলো। নদীর ধারে ঘোড়া চলবার পথ নেই, পায়ে ছুটে চল্‌ল সুরেন্দ্রনাথ, মুখে রক্ত আর 'বড়দিদি' রব। নৌকায় দেখা হল দু'জনের। শেষ দৃশ্য সুরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে। মাথা কোলে নিয়ে বড়দিদি, পা কোলে নিয়ে শান্তি। সুরেন্দ্রনাথের অন্তিম উক্তি, বড়দিদি একদিন আমাকে তোমার বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছিলে, আমি শোধ নিয়েছি তোমাকে বাড়ী থেকে বের করে দিয়ে। নিশ্চেষ্ট সরলতার সক্রিয় অবসান।

এখন এ হেন গল্পকে রবীন্দ্রনাথের মনে করে পাঠকে বড় ভুল করে নি। অনেক কারণ। তখনো গল্পগুচ্ছ অবিরাম ধারায় প্রকাশিত হয়ে চলেছে। দ্বিতীয় কারণ, গল্পটির কারিগরিতে মুন্সীয়ানা। তৃতীয় কারণ, বিধবার প্রেম সম্বন্ধে সূক্ষ্ম সুকুমার একটি সমবেদনার ভাব। চতুর্থ কারণ, তখন আর একজন মাত্র প্রথম শ্রেণীর ছোটগল্প লিখিয়ে ছিলেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর ছোটগল্পের বিষয়, ভাষা ও স্টাইল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; একদিকে রবীন্দ্রনাথ, অন্যদিকে প্রভাতকুমার, মাঝখানে বড়দিদি গল্প লেখক। কিন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথের দিকে ঝুঁকে। তৃতীয় কারণটির কিছু ব্যাখ্যা আবশ্যক। ১৯০৩ সালে 'চোখের বালি' প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে বিনোদিনী সম্বন্ধে লেখকের যে মনোভাব প্রকাশিত তার সঙ্গে মাধবীর মিল অত্যন্ত স্পষ্ট। রোহিণীকে নিয়ে সকলে বড় গোলমালে পড়েছেন। তবে তাঁরা ভুলে যান যে রোহিণী বিনোদিনী নয়, মাধবী বা রাজলক্ষ্মী বা সাবিত্রী নয়। রোহিণী, রোহিণী। রোহিনীর মতো নারীর যা নিয়তি ঠিক তাই ঘটেছে। সামাজিক স্বাস্থ্য রক্ষার খাতিরে নয়, সাহিত্যিক সত্যরক্ষার খাতিরেই সে নিহত হয়েছে। বিনোদিনী বিবাহ করে নি বিহারীকে। যে ভাষায় বিহারীর বিবাহ প্রস্তাব সে প্রত্যাখ্যান করেছে সেই ভাষাতেই সাবিত্রী প্রত্যাখ্যান করেছে সতীশের বিবাহ প্রস্তাব। রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিধবা বিবাহ দিয়েছেন দামিনীকে, সে ১৯১৬ সালের কথা। তার অনেক আগেই জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ

দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এ বিষয়ে শরৎচন্দ্র অনেক পিছিয়ে আছেন, বোধ করি তাঁর প্রথম বিধবা বিবাহ 'শেষ প্রশ্ন'-এ। রমেশ দত্ত এ বিষয়ে সবচেয়ে অগ্রণী। বিধবা বিবাহের সুখের দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে বিরল। বিবাহের পবিত্রতা সম্বন্ধে ধারণা বাঙালী লেখকের মজ্জাগত। মানুষ অমর নয়, লেখকও। মৃত্যুর পরে স্বকীয় পত্নী পরকীয়া পত্নী হয়ে সুখে জীবনযাপন করছে এ বোধ করি তার অসহ্য। বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা কুন্দনন্দিনীর বিবাহ দিয়েছিলেন, তার ফল বিষময় হয়েছে। তিনি moralist ছিলেন না—ছিলেন realist, সকলে এ কথাটা খতিয়ে দেখে না। লবঙ্গলতা ও পার্বতী তুলনীয়া, তবু কত প্রভেদ। লবঙ্গ হাসির তবকে মনের দুঃখ চেপে রেখেছে, বিবাহের পরে পার্বতী একদিনও হেসেছে কি না সন্দেহ। যাই হোক মাধবী, বড়দিদি। সুরেন্দ্র-নাথের প্রতি তার যে মনোভাব তার মধ্যে বাৎসল্য রস, স্নেহ ও প্রেম মিশ্রিত। রুচিভেদে কেউ প্রশংসা করবে, কেউ নিন্দা। বর্তমান সমালোচক প্রশংসা-কারীদের দলে।

বড়দিদি শরৎচন্দ্রের প্রথম লিখিত গ্রন্থ নয়, শ্রেষ্ঠ গ্রন্থও নয়। তবে তার মধ্যেই শারদীয় বৈশিষ্ট্য প্রকট। শরৎচন্দ্রের প্রত্যেক ছোটগল্পে ও উপন্যাসে প্রথম ২।৩টি অনুচ্ছেদে অলঙ্কারে বা বর্ণনায় মূল সুরটি ধরিয়ে দেওয়া হয়—বড়দিদিতেও হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর ছোট গল্পগুলি আর পল্লীসমাজ, বড়দিদি প্রভৃতির মতো খণ্ডোপন্যাসগুলি। উপন্যাসগুলি অনেক পিছিয়ে আছে, ব্যতিক্রম চারপর্বে অখণ্ড শ্রীকান্ত। অনেকের মতে শেষ পর্ব দুটি তেমন উজ্জ্বল নয়। দিবসের চার প্রহর কি সমান উজ্জ্বল! স্বভাবের নিয়মে যেমনটি ঘটা উচিত ঘটেছে। যাক, উপন্যাস আজকার প্রসঙ্গ নয়, আজকার প্রসঙ্গ বড়দিদি, এমন যথোচিত curtain raising, দুর্গেশনন্দিনী ও শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড ছাড়া তো আর চোখে পড়ে না।

———